রক্তরাগ

শ্রীমলয় কুমার মজুমদার

এস, সি, মজুমদার এণ্ড কোং

প্রকাশক—শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি, এ
প্রো:—এস্, সি, মজুমদার এণ্ড কোং
১৪৪-বি, রসা রোড
কলিকাতা—২৬

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৫৫ সাল

সাড়ে চার টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কো লিঃ
২১৭নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বাইণ্ডার্স
হিন্দুস্থান বুক বাইণ্ডার্স
১২।১ সি, লেক রোড, কলিকাতা

প্রচ্ছদপট
প্রেসবুরো
৫০।১ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

৺মাতৃদেবীর

চরণকমলে—

প্রায় তিন বছর আগে নববর্ষ গল্প-সঞ্চয়নে এ উপন্যাসখানি সর্বপ্রথম বেরিয়েছিল পদধ্বনি নামে। তখন জানতাম না এ-নামে আর একখানি বই বহু আগেই ছাপা হয়েছে। এবারে তাই এর নাম পরিবর্ত্তন করলাম। উপন্যাস লেখায় এই আমার প্রথম চেষ্টা। তবুও যে এতবড় একখানা বই লিখতে সাহস করেছিলাম সে শুধু আমার অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীশান্তিপ্রসাদ নন্দরের অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের জোরে। শুধু মাত্র মুখের কথায় মামুলী কৃতজ্ঞতা জানালে তার সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না, সুতরাং সে চেষ্টা থাক্।

আরও একটি বন্ধুর কথা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মনে আসে, ঋণ আমার তাঁর কাছেও অল্প নয়। তিনি এ-গ্রন্থের মুদ্রাকর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস। বইয়ের স্থানে স্থানে তাঁর রসজ্ঞ আলোচনা আমার লেখায় অনেকখানি সাহায্য করেছে, একথা স্বীকার করতে আমার কুণ্ঠা নেই।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৫ সাল
১৪৬-বি, হরিশ মুখার্জি রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রন্থকার

রক্তরাগ

রক্তরাগ

(১)

নিছক ব্যক্তিগত ভালো-লাগার কষ্টিপাথরেই একদিন তাকে যাচাই করে নিয়েছিলাম। তাই, কতটুকু তার নিখাদ সোনা, সে বিচার আর যারই হোক্, আমার নয়।

সুখ-দুঃখ হাসি-কান্নার মধ্য দিয়ে জীবনের প্রায় সব কটা দিনই ত পার হয়ে এলাম। চলার দুর্গম পথে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কতো লোক ভিড় করে এসেছিল, সহজ সাংসারিক নিয়মে একে একে আবার কোথায় মিলিয়ে গেছে। তাদের ধরে রাখবার না ছিল গরজ, না ছিল জোর। জীবনে বড় হবার স্বপ্ন দেখেছিলাম; কিন্তু সাধনায় ছিল সংশয়, ছিল প্রচুর প্রতিবন্ধক। তাই ত স্বপ্নই আমার জীবনে অচল হয়ে রইল। তাই আজ নিরলম্ব ব্যর্থ জীবনের বিবর্ণ দিনগুলির কথা মনে করতে গিয়ে অন্তর হাহাকার করে ওঠে; সর্ব্বস্ব হারানোর বিপুল রিক্ততার চাপে বুকের স্পন্দন থেমে যায়। কিন্তু সে কথা থাক। বৈচিত্র্যহীন জীবনের উপেক্ষিত ভারাক্রান্ত ইতিহাস···সে একান্ত আমার।

কিন্তু তাকে আমি আজও ভুলতে পারিনি, অগণিত মানবাত্মার মর্মভেদী আর্তনাদ যাকে পথের ধূলায় নামিয়ে এনেছিল,···যার নাতিদীর্ঘ জীবনের পটভূমিকায় জীবন-দেবতা স্বহস্তে অগ্নি-অক্ষরে লিখে দিয়েছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিপ্লবীর আপোষহীন সংগ্রামের সঙ্কেত-লিপি। সার্থক তার নাম, উদয়ভানু।

তার চলে যাওয়ার দিনটি কি-ই যে মনে পড়ে! তাইত আমার এ দুঃসাহস। যার সবটুকুই চোখে দেখা যায় না, যাকে জানতে হয় শুধু অন্তরের অনুভূতি দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে, কালির আঁচড়ে তার কতটুকুই বা ধরা দেবে? তবু তার কথা লিখতে বসেছি। কারণ, সে ত শুধু আমারই নয়, সে যে সারা দেশের সম্পদ্।

তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় আমারই জীবনের অবিস্মরণীয় এক লজ্জার কাহিনী আশ্রয় করে।

সে দিন···শ্রাবণের বর্ষণ-ক্লান্ত অপরাহ্ণ। মুক্ত বাতায়ন-পথে অস্তাচলগামী সূর্য্যের সোনালী রশ্মি এক টুক্‌রা প্রাণ-খোলা মিষ্টি হাসির মত ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে। মন খুশীতে চঞ্চল হয়ে উঠলো। নাঃ, এমন পরিবেশে ঘরে থাকা চলবে না। কি যে দুর্বুদ্ধি হল, বললাম,— ভারি মিষ্টি রোদ উঠেছে রে! ভাবছি, দক্ষিণেশ্বরের বাগানটা ঘুরে আসব একবার।

নামটা যেই উচ্চারণ করা, অমনি সঙ্কল্প স্থির হয়ে গেল; 'কিন্তু' নয়, যাওয়া চাই-ই।

এই যে দক্ষিণেশ্বরে বেড়াতে যাওয়া, এ আমার বহুদিনের অভ্যাস। শুধু অভ্যাস নয়, নেশা। এ নেশায় যিনি আমাকে দীক্ষিত করেছিলেন, তিনি ময়ূরাক্ষবাবু; আমার বোন কৃষ্ণার অগাধ ঐশ্বর্য্যের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক। আঠারো বছরের মেয়ে কৃষ্ণাকে সংসারে একা ফেলে যে দিন অযুতাশ্ব বাবু অকস্মাৎ পরলোকের যাত্রী হলেন, সে দিন পিছনে পড়ে রইল তার কয়েক কোটী টাকার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স, আর সেই বিশাল সম্পদের কলঙ্ক-ইতিহাস। দূর আত্মীয় কিংবা অনাত্মীয়, অনেকেই সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনার মুখোস পরে। ঘরে বাইরে মায়া-কান্নার বান ডেকেছিল সে দিন। সে দুর্য্যোগের ঘনান্ধকারে বৃদ্ধ ময়ূরাক্ষই শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন। অপরের অলক্ষ্যে নিজের চোখ দু'টি মুছে নিয়ে কৃষ্ণার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এমন ক'রে ভেঙ্গে পড়লে ত চলবে না মা। ওঠো, উঠে বস। তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, দেখ ত মা, কে এসেছে?

কৃষ্ণা আঁচলে চোখ ঢেকে শুয়েছিল। বৃদ্ধের কথায় মুখ ফিরিয়ে বললে, এসেছ অরূপদা?

ছোট্ট দু'টি কথা। এর বেশী সে কিছুই বলতে পারে নি। সদ্য পিতৃশোকাতুরা কৃষ্ণার সে চাহনি আমি আজও ভুলিনি। আজ নিঃসংশয়ে জানি, সেদিন সে দৃষ্টিতে কতখানি নির্ভর, কতখানি নিশ্চিন্ত আরাম লুকান ছিল।

ময়ূরাক্ষবাবু আজ বেঁচে নেই। আমার মাথায় নিঃশব্দে কঠিন দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তিনি প্রভুর অনুগামী হয়েছেন। কিন্তু একথাও থাক। যা বলছিলাম……দক্ষিণেশ্বরে সেই বেড়াতে যাওয়া।

কৃষ্ণা আমার কথায় সায় দিয়ে বললে, তাই চল। সারাটা দিন ঝির্‌ঝিরে বৃষ্টি, কি যে বিশ্রী লাগছে—। গ্যারেজ থেকে নিজেই গাড়ীখানা বের করে নিয়ে এলাম। চালচলনে ইতিমধ্যেই খানিকটা অভিজাত হয়ে পড়েছি। এ দুর্ব্বলতার জন্য কৃষ্ণাকে দায়ী করতে পারলেই হয়ত খুশী হতাম, কিন্তু সে ত মিথ্যা কথা। কৃষ্ণা উপলক্ষ্য মাত্র, নইলে আমি ত জানি, ভোগ-বিলাসের এ দুর্ব্বার আকর্ষণ থেকে পরম ঔদাসীন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখবার রক্ষা-কবচ নিয়ে আর যে-ই হোক্, আমি অন্ততঃ জন্মাই নি।

আজ একথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমি সে দিন সত্যই ভয় পেয়েছিলাম। দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীতে এসে পড়েছি। সামনেই গঙ্গা, তর্ তর্ করে বয়ে যাচ্ছে। লোকজন বড় বেশী নেই। ধীরে ধীরে নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালাম। মাঝে মাঝে দু'একখানি বড় নৌকা পাল তুলে চলে যাচ্ছে অনেক দূর দিয়ে, তালে তালে মাঝিদের দাঁড়টানার শব্দ কানে আসে। মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক বুনো হাঁস উড়ে গেল। সূর্য্য দিগন্ত রেখায় নেমে এসেছে। ঠিক এইখানে, এমনি সময়ে অস্তগামী ঐ সূর্য্যের সাথে আমার বহুকালের মিতালি। হয়ত

এ আমার সংস্কার ; তবু স্পষ্ট অনুভব করতে পারি, এখানে এলে মনটা কেমন নিস্পৃহ হয়ে পড়ে। সংসারের একঘেয়ে কোলাহল আর স্বার্থের সংঘাত অর্থহীন মনে হয়। সমস্ত সত্ত্বা কি এক ব্যাকুল আগ্রহে প্রণাম হয়ে কার পায়ে লুটিয়ে পড়ে।

কতক্ষণ এমন ভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, চেয়ে দেখি কৃষ্ণা কখন এসে আমার গা ঘেঁসে বসে আছে। তার মুখের দিকে চাইলাম, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে বিশেষ কিছু দেখা গেল না।

কি মনে হল, হেসে বললাম, জানিস বোন, এখানে এলে আমি একেবারে বদলে যাই। ভাবি, কাজ কি জঞ্জাল বাড়িয়ে! একা মানুষ, যে দিকে খুশী চলে যাই, যেমন খুশী থাকি, কিন্তু—

—'কিন্তু, কি অরূপদা'? কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে অভিমানের স্পষ্ট আভাস পেয়ে কথার শেষটুকু বলতে ইচ্ছা হল না; একেবারে অন্য প্রসঙ্গে এসে পড়লাম। অসহায়ের মত মুখ করে বললাম, কিন্তু···এ যে ভারি মুস্কিল হল! কলেজের মেয়েরা ধরেছেন, তাঁদের কোন্ এক পরম শ্রদ্ধেয় দাদা, পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট্ পাঁচ বছর আন্দামানে কাটিয়ে সম্প্রতি কোলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাঁর অভিনন্দন সভায় আমাকে নাকি কিছু বলতেই হবে।

কৃষ্ণা মৃদুকণ্ঠে বললে, বেশ ত, যাও না।

কথায় কথায় দু'জনে এগিয়ে চলেছি। বেশ একটু রাত হয়েছে। অন্ধকারে যতদূর সম্ভব কৃষ্ণার মুখখানা ভাল করে দেখে নিলাম। নাঃ, পরিহাস নয়। সে তবে সত্যই বিশ্বাস করে আমি ও-ধরণের সভায় বক্তৃতা করতে পারি? আশ্চর্য্য! বললাম, 'যাও না' ত বলবিই, তোর আর ভাবনা কি; কিন্তু রাজনীতির গোলক ধাঁধাঁয় ঢুকে ভয়ে যখন মুখের কথা বন্ধ হয়ে যাবে, তখন তোর দাদা বলে, আমার মৌনতাকে পাণ্ডিত্য বলে কেউ ভুল করবে না। তখন?

এমন ভাবে প্রশ্ন করলাম যে কৃষ্ণা হেসে ফেললে, বললে, তুমি কি ভাব বল ত অরূপদা? সত্য গোপন করতে চাও, কর। তা বলে রাজনীতি তোমার মাথায় আসে না, এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলচ? এক ফোঁটা মেয়েরা যা পারে, তুমি পারে তাতে ভয়!

রীতিমত গম্ভীর হয়ে বললাম, থামলি যে? বল না আরও কিছু! অনেক দিন এমন করে কেউ প্রশংসা করে নি।

কৃষ্ণা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, নিন্দা কি প্রশংসা জানিনে, তবে তুমি যা' বলতে চেয়েছিলে সে একথা নয়।

গাড়ীর প্রায় কাছে এসে পড়েছি। রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে পথঘাট অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। পথচারিদের দ্রুত চলমান মূর্ত্তি কচিৎ দু'একটি চোখে পড়ে।

দরজা খুলে কৃষ্ণাকে ভিতরে বসিয়ে স্বয়ং চালকের আসনে বসতে যাচ্ছি, হঠাৎ পিছন থেকে এক অপরিচিত রুক্ষ কণ্ঠে

আদেশ হল, "দাঁড়ান, দু'একটা কথা বলব আপনাকে"। ভয়ানক চমকে উঠলাম। চেয়ে দেখি, স্যুট পরা দু'জন যুবক অত্যন্ত কঠিন ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

আতঙ্কে দেহের সমস্ত স্নায়ুগুলো সংকুচিত হয়ে গেল। কে এরা? কি চায়? নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ লোক দু'টির মধ্যে একজন এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলে। উঃ! সে কি ভয়ঙ্কর চাপ। তার মুঠোর মধ্যে আমার ডান হাতের আঙ্গুলগুলো যেন ভেঙ্গে দুমড়ে গেল।

লোকটা বললে, বোধ হয় বুঝতে পারছেন, জোর করলে সুবিধে হবে না? আই টেল্ ইয়ু টু ষ্ট্যাণ্ড্ ষ্টীল্ অন্ পেইন্ অব ডেথ্।

লোকটা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল কৃষ্ণার দিকে।

কৃষ্ণা আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল—"উ-উ-উঃ! আমাকে মেরে ফেলো তোমরা…"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তা যেমনি অপ্রত্যাশিত তেমনি বিস্ময়কর।

দেখি, পূরো পাঁচ হাত লম্বা এক মনুষ্যমূর্ত্তি আততায়ী যুবক দু'টিকে দু'হাতে শূন্যে তুলে বিষম ঝাঁকুনি দিচ্ছে,—"হঠাৎ এ সখ হল কেন সাহেব? অ্যাঁ? একেবারে পূরোদস্তুর আড্‌ভেঞ্চার!"

তারপর অর্দ্ধচেতন যুবক দু'টিকে মাটিতে আছড়ে ফেলে মৃদু কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে বললে, যাও!...

বাপ্! কি গম্ভীর আওয়াজ! এমন গভীর কণ্ঠস্বর জীবনে ঐ প্রথম শুনলাম। যুবক দু'টির কথা আর না-ই বললাম। আস্তে আস্তে গায়ের ধুলো ঝেড়ে হঠাৎ তারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল ঘন অন্ধকারের আড়ালে।

ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় কৃষ্ণার দিকে চাইলাম, গাড়ীর এক কোণে দু'হাতে মুখ গুঁজে সে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। এতক্ষণে মুখ ফিরিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের দিকে তাকালাম। কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। মনে মনে বললাম, 'ভগবান, তুমি আছ।' কিন্তু আমাদের এ বন্ধুটিকে এখনও ধন্যবাদ দেওয়া হয় নি। ভাবচি, কি বলে আরম্ভ করা যায়। হঠাৎ আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, ডায়েরী লেখেন তো? না লিখলে আজ থেকে সুরু করবেন।

তারপর এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, ছিঃ! এই সাহস নিয়ে আসেন আভিজাত্যের সখ মেটাতে? যান্, এবার উঠে পড়ুন ত।

একটু বিরক্ত হলাম। বললাম, "স্বীকার না ক'রে উপায় নেই আপনি শক্তিমান। কিন্তু সেই জোরে দুর্ব্বলকে উপহাস করার অধিকার জন্মায় জানতাম না। তা ছাড়া, জানেন আপনি," ইঙ্গিতে, লজ্জায় ও অপমানে আনতমুখী কৃষ্ণাকে দেখিয়ে বললাম, "এঁর সাথে আমার সম্বন্ধ কি?"

না জানলেও আন্দাজ করা শক্ত নয়, পকেটে হাত পুরে সিগারেট বের করে নিয়ে আমার দিকে একটা এগিয়ে দিয়ে বললে, ইফ্ ইয়ু ডোণ্ট্ মাইণ্ড্, অভ্যাস আছে নিশ্চয়ই ?

স্বভাবতঃ আমি অভদ্র নই। কিন্তু মনের মধ্যটা তখনও জ্বালা করছিল, বললাম, ধন্যবাদ, এখন দরকার নেই।

তার মুখের দিকে কিন্তু জোর ক'রে চাইতে পারছিলাম না। পরাজয়ের লজ্জাকর গ্লানি আমার সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

আগন্তুক দেশলাই জ্বালিয়ে নিজের সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললে, কারও ব্যক্তিগত সম্বন্ধ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে। তারপর সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললে, আচ্ছা, নমস্কার।

ক্ষিপ্র পদে সে এগিয়ে গেল। একবারও পেছনে চাইলে না, অপেক্ষা করলে না একটি মুহূর্ত্তও আমার উত্তরের প্রতীক্ষায়। শুধু এক নিমেষের জন্যই তাকে দেখেছিলাম। তবু সেই নিমেষের দেখা মুখ আমার মনে বহুদিন স্পষ্ট হয়ে ছিল। ভয় নেই, সে মুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজের অক্ষমতা প্রমাণ করব না। শুধু তার কথা ভাবলেই মনে হয় যেন, দূর অতীতের কোনও নিপুণ ভাস্কর তার সমস্ত শক্তি, সমস্ত দরদ দিয়ে সে-মুখের প্রতিটি রেখা এঁকে দিয়েছিল ; চোখের দৃষ্টিতে দিয়েছিল বজ্রের অমোঘ শক্তি। সে মুখ সুন্দর

কি কুৎসিত এ প্রশ্ন কোন দিন মনে ওঠে নি; সে মুখ অপূর্ব্ব !

বাড়ী ফিরবার পথে কৃষ্ণা শুধু একটিবার মুখ তুলে বললে, ওকে অমন শক্ত কথাটা না বললেও পারতে অরূপদা। ঠিক এই কথাটাই আমিও ভাবছিলাম। যার পায়ের ধূলো মাথায় নেওয়া উচিত ছিল, আহত পৌরুষের মিথ্যা অহঙ্কারে তাকে বৃথাই অপমান করলাম। উত্তরে একটা কথাও বলতে পারিনি, বলবার কি-ই বা ছিল। তারপর……।

বহুদিন তার সন্ধান করেছি, সম্ভব অসম্ভব সমস্ত যায়গায় দু'টি সতর্ক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সজাগ করে রেখেছি। কিন্তু দেখা পেলাম যে দিন, তখন এ ঘটনার স্মৃতি ম্লান হয়ে এসেছে ; অতিক্রান্ত হয়েছে দীর্ঘ তিনটি বছর।

সে যে দিনের পর দিন আমাদেরই এত কাছে ঘুরে বেড়াত একথা সে দিনই প্রথম জানতে পেলাম। শুধুই জানতে পেয়েছিলাম তা নয়, তার সত্য পরিচয়ের আভাস পেয়েছিলাম। ঘটনা এমন কিছু নয়, তবু এত সহজে সে কথা বলা যায় না। কারণ, সে ত সহজ মানুষ নয়। সে বহুর মধ্যে একক··সে অদ্বিতীয়। অলঙ্কারে সাজিয়ে, উপমা দিয়ে তাকে বোঝাব এমন বস্তু আজও ত চোখে পড়ল না।

তাই ত আজ তার কাহিনী বলতে গিয়ে দীর্ঘ পথ পিছিয়ে যেতে হবে। একের পর এক দীর্ঘ দশ বছরের প্রতিদিন, প্রতিটি মুহূর্ত্তের স্মৃতির পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে পৌঁছুতে

হবে এই মহানগরীর উপকণ্ঠে, এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার বহিপ্রাঙ্গণে, রূপসী তরুণীদের হাস্য-মুখরিত মোহময় এক সন্ধ্যার উন্মুক্ত বাতায়নতলে! সে দিন...

(২)

জুট মিলের মালিক শ্যামসুন্দরবাবুর গৃহে উচ্ছল যৌবনের জোয়ার এসেছে। তার সযত্ন-সঞ্চিত সম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী কন্যা ইভার আজ বিংশতিতম জন্মদিন। অনভ্যস্ত চোখের সম্মুখে সহসা এই উৎসব রজনীর যবনিকা উত্তোলিত হলে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাই স্বাভাবিক। মনে হয়, পুরাকালের কোনো দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এইমাত্র ফিরে এসে সপারিষদ দরবার-কক্ষে প্রবেশ করেছেন।

প্রকাণ্ড হলঘরের স্থানে স্থানে সাজান চারখানা ক'রে চেয়ার, আর একখানা ডিম্বাকৃতি মেহগনি কাঠের টেবল্। টেবিলের উপর ছোট ছোট ফুলদানীতে নানা জাতের ফুটন্ত ফুল,...যুঁই, মল্লিকা, গোলাপ, রজনীগন্ধা। সুবেশা পরিচারিকা ক্ষণে ক্ষণে পিচ্‌কিরির সাহায্যে ছিটিয়ে দিচ্ছে আতর আর সুগন্ধি জল।

হলের ঠিক মাঝখানটিতে বসে আছে ইভা। আর, তাকে ঘিরে নানা বয়সের নর-নারীর অশ্রান্ত কোলাহল...মধুলোভী অন্ধ স্তাবকের অবিরাম কলগুঞ্জনের মত। ঘরের এক প্রান্তে

আজিকার এই বিশেষ দিনটির জন্য নির্ম্মিত একটি নাতিবৃহৎ রূপমঞ্চ।

অতিথিদের সাদর আহ্বান জানাতে একটানা বেজে চলেছে পূরবীর নরম মিঠে সুর। ঘরের স্থানে স্থানে লাল, নীল, সবুজ, আলোর ঢেউ। সমস্ত মিলে এক বিস্ময়কর অদ্ভুত ইন্দ্রজালের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক এইখানে, উৎসবের প্রথম অধ্যায় সুরু। ধীরে ধীরে যবনিকা সরে গেল। মঞ্চের উপরে স্বচ্ছ তরল অন্ধকার· দূরে দেখা যায় নীল উজ্জ্বল আকাশ। নীলাভদ্যুতি সন্ধ্যা তারাটি স্পষ্ট ভেসে উঠেছে, আশে পাশে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য নক্ষত্র। তারুণ্যের কলকাকলী সংযত আগ্রহে স্তব্ধ হয়ে আছে।

সহসা অন্তরাল হ'তে অতি মধুর মঞ্জীর ধ্বনি এগিয়ে এসে মঞ্চের ঠিক মাঝখানটিতে থেমে গেল। অভিভূত দর্শকের চোখের সুমুখে ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল আলিঙ্গনরত একটি সুখী দম্পতি। মাত্র কয়েক মুহূর্ত্ত তারা নিশ্চল হ'য়ে রইল, তারপর অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তাদের সুগঠিত সবল পেশীগুলো। পায়ে পায়ে বেজে উঠল নূপুর। আয়ত চক্ষুর বিলোল কটাক্ষ ছড়িয়ে দিল সৃষ্টির আহ্বান। শুভ্র দেহের লীলায়িত সঞ্চালনে উদ্বেল হল প্রেয়সীর প্রথম চুম্বনের মদিরতা।

বিলিতি ইঞ্জিনিয়ার অরুণ ইভার কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে, তোষামোদ নয়, সত্যই আপনার এ পরিকল্পনার বলিষ্ঠতা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

প্রত্যুত্তরে ইভা মৃদু হাসলে শুধু, লক্ষ্য তার স্থির হয়ে আছে নিপুণ শিল্পী দুটির আবেগচঞ্চল দেহে। নাচের ছন্দ তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যাতারা উঠে এসেছে আকাশের মাঝখানে; পশ্চিম দিগন্তে দেখা দিয়েছে এক ফালি চাঁদ।

শুধু ইভা নয়, তার বিশিষ্ট বান্ধবী রেবা, বীথি, চিত্রা সকলেই সুন্দরী। এঁদের, এই রূপসী মেয়েদের অতি-সান্নিধ্যের প্রশ্রয়ে অরুণকুমারের অতৃপ্ত কামনা আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ মঞ্চের রূপালী আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হল। নৃত্য-চঞ্চল প্রণয়ীযুগল মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল; নিষ্ঠুর সেই কালো মেঘের দিকে হানলে বাঁকা ভুরু। তাদের মনেও বুঝি মেঘের ছায়া ঘনিয়ে এলো! সহসা কড় কড় করে বজ্রপতনের শব্দ হল। শাণিত তরবারির মত বিদ্যুৎ চমকে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। দম্পতির বাহুবন্ধন শিথিল হল। পুরুষ ছুটে গেল উন্মাদের মত মঞ্চের বাইরে বজ্রের আহ্বানে সাড়া দিতে। একবার ফিরে চাইলে না; দেখলে না, তার ফেলে-যাওয়া অভিমানিনী প্রিয়ার তনু দেহ কী অপরিসীম ব্যথায় বারংবার শিউরে উঠছে।

নৃত্যাভিনয় শেষ হল, কিন্তু সকলেই নির্ব্বাক। ক্ষণ-পূর্ব্বের মুহূর্ত্তগুলি এখনো তাদের মনে সজীব হয়ে আছে।

ঘটনার এই মর্ম্মন্তুদ পরিসমাপ্তি তাঁদের ভাব-বিলাসী মনে নিষ্করুণ আঘাত দিয়েছে।

ইভার একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে অরুণ অর্দ্ধোস্ফুট কণ্ঠে বললে,— কি নিষ্ঠুর আপনার কল্পনা! এমন করে হত্যা করলেন এদের পরম মুহূর্ত্তটিকে?

এবারেও ইভার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে উঠল। ধীরে ধীরে বললে, সত্যই, অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু কল্পনাটা আমার নয়; এ অজ্ঞাত নাট্যকার আমারই মাষ্টার মশাই, নাম—

—ক্ষমা করবেন, মিস্ চাটার্জি। আপনার শিক্ষকের অমর্য্যাদা করতে চাইনে। তাঁর রস-বোধের পরিচয় পেয়েছি, নাম জানবার কৌতূহল নেই।

ইভা এই খোঁচাটুকু ফিরিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলে না, বললে, নেই নাকি? আশ্চর্য্য! আমি ভেবেছিলাম—

—আপনি উপহাস করছেন? অরুণ কণ্ঠস্বরে কিছুটা গাম্ভীর্য্য মিশিয়ে বললে।

—কে? আমি? উপহাস করব আপনাকে? বাপ্‌রে! যে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিলেন এক্ষুণি,—সহসা যেন প্রতিপক্ষের দু'গালে চড় দিয়ে ইভা সমস্ত আলোচনার মুখ বন্ধ করে দিল। মঞ্চের তরল অন্ধকার এতক্ষণে অপসারিত হয়েছে। এবারে সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যায়।

ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম্মের মাঝখানে এসে দাঁড়াল একটি ক্ষীণজীবী তরুণ। রোগা, ফ্যাকাশে রং, একমাথা রুক্ষ চুল

সাবধানে ব্যাক্‌ব্র্যাশ্‌ করা। বেশভূষা ও চেহারায় প্রায় মেয়েদের কাছ ঘেঁসে গেছে।

ইভা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আপনারা সবাই বোধ করি এঁকে চেনেন না; তাই দু'এক কথায় সামান্য একটু পরিচয় দেব।

তরুণ ঈষৎ হেসে নির্বীর্য্য ভঙ্গীতে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

"ইনি অতি-আধুনিক গদ্য-কবি বিরহী মহলানবীশ। একেবারে আনকোরা একটি নতুন লেখা এনেছেন আপনাদের শোনাতে" ইভা বসে পড়তেই দর্শকদের মধ্য থেকে একটা চাপা হাসির মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল, শুরু হল তরুণ কবির কাব্যালাপ:

"—হে রতি-বিলাস!
শাঁওনের খলুক শম্বরী ছায়ে
উদোষ্ঠ হোলো কি তব
ঘন স্মরাসব?
শ্রান্ত বুঝি হে লমক,
প্রকৃতি-জস্তনে?
কেন চেয়েছিলে তবে লঘ্বী লগ্নিকার
শষ্প ললনের?
সে কি শুধু আস্ফালন, শুধু অভিনয়?"...

এখানে এসেই মনে হল, অদমা কান্নার উচ্ছ্বাসে কবির কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এসেছে।

অনেকেই কবিতার অর্থ বুঝতে পারলে না; সুতরাং ঘন ঘন হাততালির বাহবা দিয়ে রচনা-কৌশলের মান-রক্ষা করলে। কিন্তু গোল বাধাল প্রবল দার্শনিক সমাধি পাল। বলল, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। একথা ভুললে চলবে না ইভা দেবী! কথার মালা গেঁথে অমন ছিঁচকাঁদুনি আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। অনুমতি করেন তো এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দিই।

—"না, না, আপনি দয়া কোরে চুপ করুন!" সম্মিলিত প্রতিবাদ জানাল মেয়েরা। এমন অপরূপ সন্ধ্যাটি কলহের কালো ছায়ায় তারা নষ্ট হত দেবে না।

অরুণ এতক্ষণ কথা বলতে না পেরে হাঁপিয়ে পড়েছিল, এবার সুযোগ বুঝে ইভাকে লক্ষ্য করে বললে, এক্স্কিউজ্ মি, এটিকে কোত্থেকে ধরে আনলেন?

ইভা তার ভাবভঙ্গী দেখে বিরক্ত হয়েছিল, মৃদু হেসে বললে, প্রায় সবই ত এক জায়গার আমদানি! অরুণের মুখের উপর কে যেন চাবুক দিয়ে সবলে আঘাত করল। ক্রোধে ও অপমানে তার সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। জবাব সেও দিতে জানে। শুধু এদেশের কেন, দেশ বিদেশের অগুন্তি মেয়ের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করেছে। কিন্তু এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা তার জীবনে এই প্রথম। কেন? কিসের এত অহঙ্কার? অরুণ নতমুখে স্তব্ধ হয়ে ভাবে।

ইভা রূপবতী, প্রচুর তার ঐশ্বর্য্য, উদ্ভিন্ন তার যৌবন। কিন্তু নিজেও সে তুচ্ছ নয়। বিদ্যা, রূপ, সম্পদ তারও কিছু কম নেই। তবে কিসের জোরে ইভার এত দর্প, এ নির্ম্মম বিদ্রূপ? অরুণকুমার এ প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পায় না। মন তার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। হঠাৎ তার চিন্তার সূত্র হারিয়ে যায়।

"কাকে ধরে এনেছি, দেখ্ ইভা"—রেবা কলকণ্ঠে সম্বর্ধনা জানাল।

তারপর নবাগতা মেয়েটির হাত ধরে আদর করে বললে, এমন দেরী করে কেন এলে কৃষ্ণাদি? না—না—আর এখানে নয়, একেবারে ঐখানে গিয়ে বসো। বলেই ইঙ্গিতে মঞ্চের একপ্রান্তে রক্ষিত অর্গ্যানটা দেখিয়ে দিলে। আমাকে লক্ষ্য করে বললে, দাঁড়িয়ে কেন অরূপবাবু, বসুন না? তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে মৃদু হেসে বললে, ভরসা করে যেমন ছোট বোনটিকে একা ছাড়তে পারেন নি, তার শাস্তিও আজ পেতে হবে।

হেসে ফেললাম, বললাম—"অর্থাৎ"—?

"অর্থাৎ কৃষ্ণাদি ছাড়া পাবেন রাত বারোটায়।" রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। রাত জাগা আমার একেবারেই সহ্য হয় না।

রেবা কিন্তু নিজের উৎসাহে বলে চলছে—"দেখুন না,—এখন গাইবেন কৃষ্ণাদি, তারপর হবে মিষ্টিমুখ···তারপর···"

—তারও পরে কিছু আছে নাকি ?

—বাঃ! নিশ্চয়ই আছে। তারপর আপনার কাছে আমরা গল্প শুনব সবাই।

সর্ব্বনাশ! এতলোকের মধ্যে আমাকেই শেষে গল্প বলতে হবে? বললাম, রক্ষা কর রেবা। বার্কের ফরাসী বিপ্লবের ওপরে কাল নোট্ দিতে হবে, অথচ কিছুই তার এখনও তৈরী হয় নি।

রেবা মৃদু মৃদু হাসছে। ভাবলাম, নাঃ, এ কৈফিয়ৎ তেমন জোরালো হল না। কিন্তু আর কিই বা বলা যায়!

আপনি কেবলই এড়িয়ে যেতে চান,—রেবা আব্দার করে বলল,—কিন্তু এই বলে রাখছি আপনাকে, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে এখানেও আজ বিপ্লব শুরু হবে; তখন কিন্তু—হঠাৎ থেমে গিয়ে হেসে ফেলল, বলল, এসো কৃষ্ণাদি।

—"কি করি বল তো অরূপদা? আমার সব গানই তো পুরোনো", কৃষ্ণা কাছে এসে দাঁড়াল,—"তা ছাড়া" রেবাকে লক্ষ্য করে বলল, "জানই তো, এত লোকের মধ্যে আমি গাইতে পারি নে।"

উত্তর দিতে গিয়ে রেবা হঠাৎ থেমে গেল। চেয়ে দেখি প্রবেশ-তোরণের বাইরে দাঁড়িয়ে অতি দীর্ঘকায় এক বলিষ্ঠ যুবকের সঙ্গে ইভা কথা কইছে; কিন্তু এত আস্তে যে অন্য কারও কানে তার একটি কথাও পৌছয় না।

মিনিট দুয়েক তাদের দুজনে কি কথা হল। তারপর সমাগত অতিথিদের লক্ষ্য করে ইভা বললে, ইনি বিখ্যাত চিত্রশিল্পী উদয়ভানু। আমার জন্মদিনে আশীর্বাদ করতে এসেছেন।

উদয়ভানু!!! উপস্থিত জনতার সশ্রদ্ধ দৃষ্টি একযোগে যুবকের উপর নিবদ্ধ হল। শক্তিশালী এই তরুণ শিল্পীর সাথে কাহারও চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, তাই বলে এ নামটিও কেউ ভুলতে পারে নি। মাত্র দু'বছর আগে এঁর 'কল্ অব্ থাণ্ডার্' চিত্র প্রতিযোগিতায় সারা বিশ্বে শীর্ষ গৌরব লাভ করেছে।

তরুণ শিল্পী ততক্ষণে উঠে এসেছে মঞ্চের মাঝখানে। তার মুখের দিকে চাইতেই কিন্তু ভয়ানক চমকে উঠলাম, নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস হল না। কি এক অনাস্বাদিত অনুভূতি আমার সমস্ত স্নায়ুগুলিকে প্রবল বেগে নাড়া দিয়ে গেল। মন ছুটে চলল তড়িদ্‌গতিতে পিছনের দিকে, দ্রুত পার হয়ে গেল বিস্মৃতির গাঢ় কৃষ্ণচ্ছায়া, তিন বছর পূর্ব্বের ভীতিবিহ্বল এক শ্রাবণ-সন্ধ্যার মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়াল। সন্তর্পণে কৃষ্ণার গা ছুঁয়ে বললাম, কৃষ্ণা, মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে সেই বেড়াতে যাওয়া?

—হ্যাঁ, কিন্তু কেন বল ত?—বুঝলাম, হঠাৎ সেই বেড়াতে যাওয়ার সঙ্গে উপস্থিত কোন বস্তুর যোগসূত্র

খুঁজে না পেয়ে কৃষ্ণা বিস্মিত হয়েছে। অনুচ্চ কণ্ঠে বললাম, কেন, তুই এখনও চিনতে পারিস নি?

কৃষ্ণার বিস্ময় আরও খানিকটা বেড়ে গেল। দ্রুত দৃষ্টিসঞ্চালন করে এমন একজনকে খুঁজে বের করতে চাইল যাকে তার ইতিমধ্যেই চেনা উচিত ছিল, কিন্তু সন্ধানী চোখ তার বিফল হয়ে ফিরে এল।

একটু কৌতুক অনুভব করলাম, বললাম, খুঁজে পেলি না তো। শোন্, আমার মনে হয়, তার মনে হওয়াই বা কেন, আমার বিশ্বাস ঐ প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীই সেদিন আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।

স্পষ্টই দেখতে পেলাম, আমার কথা শুনে কৃষ্ণা চমকে উঠল। কেমন একটা স্বস্তি বোধ করলাম। আকস্মিক উত্তেজনায় বুকের ওপর এতক্ষণ যে অস্বস্তির চাপ অনুভব করছিলাম, তার ভার যেন অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে। সহসা মনে হল, কৃষ্ণা তো কই, সেই থেকে আর একটি কথাও বলেনি। কিছু বলতে যাব, হঠাৎ তরুণ শিল্পীর ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। সত্যই, খেয়ালী বিধাতার সে যেন এক আশ্চর্য সৃষ্টি। মোহাবিষ্টের ন্যায় অবাক-বিস্ময়ে চেয়ে রইলাম। হৃদয়ের অন্তস্থলে সজাগ হয়ে রইল শুধু একখানি ভাব, একখানি স্নেহকোমল অনুভূতি। এ যেন দূর অতীতের কোন নিপুণ ভাস্কর্য্যের প্রতীক, নিপীড়িত ধরিত্রী দুঃসহ

মর্ম্মবেদনায় আপন বক্ষস্পন্দনে নূতন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

জানি, সংসারে নিন্দুকের দল আজও বেঁচে আছে। থাক্। তাদের পরমায়ু অক্ষয় হোক। আমি ভয় করি নে তাদের বাঁকা শাণিত হাসি, কিংবা স্পর্দ্ধিত কুটিল কটাক্ষ। আমি তো তার চোখে দেখেছিলাম প্রতিভার দীপ্ত শিখা। তাকে একান্ত করে কাছে পেয়েছিলাম; পেয়েছিলাম বন্ধু বলে ভাববার, প্রাণ ভরে ভালবাসবার অধিকার। সে তো আর মিথ্যে নয়! কিন্তু কেমন করে কি কথায় এসে পড়লাম···

শিল্পী মৃদু গভীর কণ্ঠে বললে, আমার ছোট্ট বোনেরা,—তোমাদেরই এক বন্ধুর জন্মদিনে তোমাদের কাছেও দু'একটা কথা বলবার লোভ ছাড়তে পারছি না।

উৎসব, যে উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠিত হোক্, শুধু হাসি কৌতুক আর ঐশ্বর্য্যের বিজ্ঞাপনেই যদি তার পরিসমাপ্তি হয় তো নিতান্তই তা অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। ঠিক এমনি আরো দু'একটি প্রীতি অনুষ্ঠান আমি দেখেছি। অথচ তার একটিও সার্থক হয়েছে বলে আমি ভাবতে পারিনি। হয়তো জানতে চাও, কেন? আনন্দ করতে এসে, হাসিমুখে বিদায় নেওয়া, এই তো ঢের। কিন্তু একথা কি একবারও তোমাদের মনে হয় না,—হাসির অন্তরালে কতো অশ্রুজল আত্ম-গোপন করে থাকে? বলতে পার এর ব্যতিক্রমও তো থাকতে পারে। কিন্তু সে যে পারে না এই সত্য কথাটাই তোমাদের

যাচাই করে নিতে হবে। আমার তো মনে হয়, সহস্র ভুলে ভরা সংসারের পিছল পথে অসাবধানে চলতে গিয়ে মানুষ যতটুকু পায়, তার লক্ষগুণ হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলে তার পার্থিব সম্পদ নয়, হারায় নিজেকে। শুধু নিশ্চিন্ত আরাম আর ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির পথ বেয়ে চুপি চুপি এগিয়ে আসে তার প্রতিভার মৃত্যু,...তিল তিল ক'রে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মরে তার সহজাত অনুসন্ধিৎসা, জন্ম-মুহূর্ত্তে রক্তের মধ্যে যা সে বহন করে আনে। স্বেচ্ছায় অপমৃত্যুর এ শয্যা-রচনা আমি সইতে পারি না।

প্রয়োজনের বহু পূর্ব্বেই ভোগের উপকরণ যাদের পূর্ণ হয়ে আছে তারা ভাগ্যবান। কিন্তু সঞ্চয়ের অহঙ্কার মানুষকে অস্বীকার করবে, রক্ত চক্ষুর অপ্রতিহত শাসন চলবে অকারণে, মুমূর্ষুর মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে, এ নিয়ম কতকাল চলবে বলতে পার ?

গম্ভীর জল-কল্লোল যেন সহসা শান্ত হ'য়ে গেল। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী উদয়ভানু ক্ষণকাল মৌন হয়ে রইল। তারপর ইভাকে লক্ষ্য করে বললে, মানুষের জন্য এক ফোঁটা চোখের জল যদি দিতে না চাও, দিও না, কিন্তু তার দুঃখ দেখে উপহাস করবার দুর্ব্বুদ্ধিকেও যেন কোন দিন প্রশ্রয় দিও না,—তোমার জন্মদিনে এইটিই আমার একমাত্র আশীর্ব্বাদ।

উৎসব কক্ষ সম্পূর্ণ নীরব। উদ্দীপ্ত কামনার রথ দুর্ব্বার পরিক্রমার মাঝামাঝি এসে যেন অকস্মাৎ অতলস্পর্শী গহ্বরের

মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। কি কথা বলতে চায় ঐ তরুণ শিল্পী? উৎসব-রজনীর ভরা আনন্দের মাঝখানে এই কি তার যোগ্য আশীর্ব্বাদ? এই একই প্রশ্ন সকলের মনে বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

ছোট্ট একটি নমস্কার করে উদয়ভানু সংযত পদক্ষেপে মঞ্চের বাইরে এসে দাঁড়াল। তারপর কোন দিকে লক্ষ্য না করে সোজা এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

যদিও অন্য কিছু লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না, তথাপি সাহেবী মেজাজের ত্রুটিমাত্র রুক্ষ কথায় চকিত হ'য়ে মুহূর্ত্তের জন্য ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম।

—"সেন্টিমেণ্টাল, ট্র্যাশ্"! বক্তা ইঞ্জিনিয়ার অরুণ; আকণ্ঠ বিরক্তি সে চেপে রাখতে পারে নি। বুঝলাম এ তারই উদ্গত জ্রন্তন। কিন্তু এই ক্রোধ ও বিতৃষ্ণার যথার্থ হেতু আবিষ্কার করেছিলাম অনেকদিন পরে।

ইভা ওষ্ঠাধরে সংযত মৃদুহাসির রেখা টেনে এনে বললে, শুধু শ্বেতাঙ্গ-সংস্করণ হলেই বাজার দাম হয়তো কিছু বেশীও মিলতে পারে; কিন্তু তার ব্যতিক্রম বলেই কোন কিছু ট্র্যাশ্ হ'য়ে ওঠে না। বিশ্বাস না হয়, জিজ্ঞাসা করুন ঐ অরূপ-বাবুকে। প্রফেসারি করছেন, ওঁর বিদ্যে নেই একথা মানবো না। এমন জায়গায় বসেছিলাম, যেখান থেকে নির্ভয়ে গোয়েন্দাগিরি করা চলে। দেখি, অরুণ কতকটা বিব্রত হয়ে পড়ল, ঠিক যুতসই জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

মৃদু হেসে ইভা ঈষৎ নিম্ন কণ্ঠে বললে, জানেন তো ইনি কে ?

—কেন, এই তো বললেন ছবি আঁকা ওর পেশা--

—পেশা, একথা তো বলিনি ! তা ছাড়া ছবির কারবারে এঁর সাথে আমার পরিচয় হয়নি, হয়েছে অন্য কারণে : ইনিই মাষ্টার মশাই। কথা শেষ করে ইভা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কি দেখলে, তারপর তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রেবাকে বললে, একবার দেখে আয় তো কোথায় গেলেন উদয়বাবু।

রেবা অন্য কক্ষে চলে গেল এবং পরক্ষণেই ফিরে এসে বলল, উনি তোর লাইব্রেরীতে রয়েছেন, কি একখানা বইয়ের দরকার।

ইভা ধীরে ধীরে অরুণের কাছে ফিরে এসে হাসিমুখে বলল, আসুন, কিছু খেয়ে নিন এবার। মিছামিছি আপনাকে রাগিয়ে দিলাম ; বাবা শুনলে আমি সত্যই সহজে নিষ্কৃতি পাব না।

অরুণ কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইল, বলল, হ্যাঁ, চলুন। আপনার অনুষ্ঠান বোধহয় শেষ হ'ল ? ইভা ও অরুণ কুমার কক্ষান্তরে চলে গেল। যাবার আগে ইভা কৃষ্ণার কাছে এসে বলল, তোরা সব ও ঘরে আয় কৃষ্ণা। তারপর আমার দিকে চেয়ে মৃদুহেসে কথার সমাপ্তি টেনে দিলে,—"আপনারা এ-বাড়ীতে অনেক দিনের বন্ধু, সুতরাং"—অরুণের দিকে চকিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে,—"ফরম্যালিটির বাড়াবাড়ি বোধ করি ভাল লাগবে না।"

নিজেকে আমার কোনদিন কোন অবস্থায়ই বেমানান মনে হয় নি। কিন্তু উদয়ভানুর এই আকস্মিক আবির্ভাব, তার হৃদয়ের অন্তর্নিহিত অনলশিখা আমার চিরদিনের ভাব-প্রবণ মনকে যেন একটি নিমেষে বদলে দিয়ে গেল। সঙ্কল্প স্থির করে ফেললাম, ওকে আমার জানতেই হবে; ওর বন্ধুত্ব আমার চাই-ই।

নিঃশব্দে অল্প একটু হেসেই ইভার মত সমর্থন করলাম।

এতক্ষণে কৃষ্ণার দিকে ফিরে চাইলাম। কিন্তু তার কোনরূপ ভাবান্তর দেখতে পেলাম না। আর মুখ দেখে মনের ভাষা পড়া, সে যেমন কঠিন, তেমনই সময় সাপেক্ষ। বিশেষতঃ কৃষ্ণার সম্পর্কে ও কৌশল একেবারেই খাটে না। নিজের বোন বলে নয়; বাস্তবিক কথায় কিংবা কাজে এ বয়সে এতখানি সংযম আজও আমার চোখে পড়েনি। তার সম্পর্ক? সে তো অনেক দূরের। আমার মা ছিলেন ওর মাসীমার বাল্য সখি। ওর মা প্রায়ই যেতেন তার দিদির বাড়ী বেড়াতে আসতেন আমাদের বাড়ী রোজ দুপুর বেলায়, গল্প করতেন সবাইকে নিয়ে; সম্বন্ধের প্রথম সূত্র এই।

ছোট্ট বারো বছরের মেয়ে। আমাকে দাদা বলে ডাকতে ওর মাসীমাই ওকে শিখিয়েছিলেন। মনে আছে, তখন আমি ফিফ্‌থ ইয়ারে পড়ি। বোর্ডিংয়ে থেকে লেখাপড়ার সুবিধা হচ্ছিল না। ওর মাসীমার সুপারিশে একেবারে ওদের বাড়ীতে এসে জেঁকে বসলাম। সেই সেদিন থেকে ও আমার ছোট বোন।

তারপর কতো ভাবেই তো ওকে দেখলাম। পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে সেদিনের সেই কিশোর-মেয়েটি জীবনের অনেকগুলি দিন পার হয়ে এসেছে। সেদিন, অপরিমিত স্নেহের আশ্রয়ে অফুরন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে যার মনে একটি দিনের তরেও বিন্দুমাত্র দুঃখের স্পর্শ লাগে নি, আজ তারই বুকে একাকীত্বের বিষম ভার পাষাণের মত চেপে আছে। স্নেহের শেষ আশ্রয় বাবাকে হারিয়ে, তাই সেদিন তার সংযমের বাঁধ শিথিল হয়ে পড়েছিল। এই একটিমাত্র দিন ছাড়া তার বিস্ময়কর সংযম আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেখিনি।

ধীরে ধীরে বললাম, চল কৃষ্ণা, শেষের কাজটুকু তাড়াতাড়ি সেরে নিই।

রাত্রি গভীর হয়েছে। অতিথিরা অনেকেই বিদায় নিয়েছে। যথারীতি শেষ প্রীতি-সম্ভাষণ সমাপ্ত করে বাড়ীতে ফিরে চলেছি। কৃষ্ণা আমার পাশেই চুপ করে বসেছিল। জন-বিরল রাস্তা দিয়ে গাড়ী পূর্ণবেগে ছুটে চলেছে। বললাম, কৃষ্ণা, আমার ইচ্ছে হচ্ছে কালই একবার ওকে ডেকে আনি। সত্যই আশ্চর্য্য মানুষ!

কৃষ্ণা বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, বলল, যাও না, আমারও একা একা দুপুরটা কাটতে চায় না। বেশ গল্প করব দুজনে।

হেসে ফেললাম; বললাম, কি বলছিস তুই? আমি উদয়ভানুর কথা বলছি।

কৃষ্ণা সচকিত হয়ে উঠল, বলল, কেন ?

—ভাবছি, একবার আমাদের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে আসব, অত বড় লোক !

—আলাপ পরিচয় নেই, হঠাৎ কি বলে ডেকে আনবে ? আর উনিই বা আসবেন কেন ?—

—বাঃ, আলাপ পরিচয় করব বলেই তো ডেকে আনা। আর আসার কথা বলছিস ? সে তোকে ভাবতে হবে না, আমি ঠিক করে নেব।

কৃষ্ণা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, আমার কিছুই ভাবনা নেই অরূপদা, যখন ইচ্ছে, যাকে খুশী তুমি ডেকে আনতে পার। কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি,…

আবার সেই হাসি। বিরক্ত হয়ে বললাম, কি হাসছিস শুধু ? বল না কি ভাবছিস ?

—ভাবছি, তুমি একদিনেই ওর এমন ভক্ত হয়ে পড়লে কেন।

বললাম, ভক্ত আবার কি ? এমন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা কি মন্দ ? তোর ইচ্ছে হয় না ?

—না। কোথাকার কে ঠিক নেই, ঝোঁকের মাথায় অমনি তাকে ডেকে এনে আত্মীয়তা করব, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না অরূপদা, আমার অত সময় নেই, সে ইচ্ছেও হয় না।

উত্তর শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। কৃষ্ণার সম্বন্ধে আমার অন্যরূপ ধারণা ছিল ; অন্ততঃ সে যে সাধারণ মেয়ে নয়,

শিক্ষায়, সংযমে, বুদ্ধিতে সে যে অনেকের ওপরে, এ বিশ্বাস আমার মনে বদ্ধমূল ছিল। যে বিরাট, যে পরম সুন্দর, যে শ্রদ্ধেয়, তার আসার পথে কৃষ্ণা বাধা দেবে এ আমি ভাবতেই পারিনি।

আজ সে কথা মনে করে হাসি পায়। তখনও তো জানতাম না, নারী যাকে অন্তরে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে, কায়মনে প্রতীক্ষা করে যার সান্নিধ্য, তার সম্বন্ধে সহজ হতে চায় না। জানতাম না যে, বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায় তার আকাঙ্ক্ষিতকে লাভ করবার সম্ভাবনা তার মানস কল্পনাকে ক্ষুণ্ণ করে, তাকে ব্যথা দেয়।

বাড়ী ফিরে এসে নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছি। রাত প্রায় দু'টো। কক্ষ প্রাচীরে সংলগ্ন প্রকাণ্ড ঘড়িটা অবিশ্রান্ত শব্দ করে চলেছে টক্…টক্…টক্…টক্…। নিস্তব্ধ রাত্রির রহস্যময় একটানা সাঁ সাঁ শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে দু' একখানা প্রাইভেট কার তীক্ষ্ণ হর্ণ দিয়ে ছুটে যায়। ঘুম আসছে না বলে দুয়ার বন্ধ করা হয়নি। হঠাৎ দেখি, কৃষ্ণা ধীরে ধীরে আমার ঘরে এসে দাঁড়াল। খুব যে বিস্ময় লাগল তা নয়, বরং এমনিই যেন কিছু আশা করছিলাম। বললাম, আয়, বস এখানে। এখনও জেগে আছিস যে? অসুখ করেনি তো?

কৃষ্ণা সংক্ষেপে উত্তর দিল, না।

তারপর একখানি কৌচে বসে পড়ে বললে, তুমি হয়ত আমার কথায় রাগ করেছ, না?

আমাকে নিরুত্তর দেখে কৃষ্ণা বলতে লাগল, আমার কি মনে হয় জান? মনে হয় মানুষের সাথে পরিচয় যত কম হয় ততই মঙ্গল। দেখ না, সংসারে তোমার কোন বন্ধন ছিল না। অথচ সেই যে দাদা বলে কাছে এসে দাঁড়ালাম, আর ত আমাকে ছাড়াতে পারলে না। তোমার নিজের ভাবনা তো ভাবলে না, কিন্তু কোথাকার কোন কুড়িয়ে পাওয়া কৃষ্ণার ভালো মন্দর দায়িত্ব নিয়ে……

ভয়ানক রাগ হল, বললাম, দেখ কৃষ্ণা, এত রাত্রে তোর সাথে ঝগড়া করতে পারব না। আর কিছু বলবার থাকে বল, নয় ত শুয়ে পড়গে যা: আমার ঘুম পেয়েছে।

কৃষ্ণা চলে যেতে যেতে বললে, ঘুমোও না, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার কথাটাও একটু ভেবে দেখো। মিথ্যে মায়া বাড়ান বৈ ত নয়! ওতে শুধু নিজের দুঃখই বাড়ে।

আশ্চর্য্য! কৃষ্ণা যে এমন করে ভাবতে পারে, আর তা এত সুন্দর করে বলতে পারে, একথা আগে কোন দিন জানতে পারি নি।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে ও চলে গেল। আমিও আলোটা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তিকর ক্লান্তি অনুভব করছি। দেড় মাস লম্বা ছুটিটা আজই শেষ হয়ে যাবে। কাল কলেজ কামাই করা চলবে না।

(৩)

সহরের দক্ষিণ প্রান্তে, লোকের বসতি যেখানে বিরল হয়ে এসেছে, গঙ্গার ক্ষীণ জলধারা হয়ে গেছে সঙ্কীর্ণতর দু'পাশের কঠিন মাটীর চাপে, সেইখানে, সেই জলস্রোতের কোল ঘেঁসে কয়েকটি ছোট মাটীর ঘর সারবন্দী দাঁড়িয়ে আছে। এমন ঘরে নিঃশব্দে দিন কাটে যার, সমাজ তাকে সহজে চিনতে চায় না।

যন্ত্র জগতের ক্লান্তিকর কোলাহলের বাইরে প্রকৃতির এই শান্ত পরিবেশের মাঝখানে যেদিন প্রথম এসে দাঁড়ালাম, অন্তরের সমস্ত গ্লানি যেন এক নিমেষে ধুয়ে মুছে গেল।

পশ্চিম আকাশের দিগন্ত রেখায় শেষ কয়েকটি রক্তাভ রশ্মির চিহ্ন রেখে সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে: সারাদিনের অসহ্য গুমট কেটে গিয়ে সুরু হয়েছে ঝির্‌ঝিরে হাওয়া। ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম: দু'একটি অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি শ্লথ পদে ছোট ছোট মাঠ পার হয়ে চলে গেল। বোধহয় কিষাণ কিম্বা শ্রমজীবি।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে এলো। আরো দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। ঘন বনান্তরালে দু'একটি আলোর ফোঁটা চোখে পড়ল: কৃষক বধূরা সন্ধ্যাদীপ জ্বেলেছে।

ধীরে ধীরে অতি লঘু পদক্ষেপে কাঁচা মাটির পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালাম। হ্যাঁ, এই ত সে ঘর। এখানেই থাকে সেই তরুণ চিত্রকর উদয়ভানু।

জানালার ফাঁকে যতদূর সম্ভব ঘরের ভিতরটা একবার দেখে নিলাম। আসবাবের কিছুমাত্র আড়ম্বর নেই। ঘরের এক কোণে রাশীকৃত মোটা মোটা বই। পাশেই একখানি মাতুর বিছান, আর তারই ওপর এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে একগাদা কাগজ। ছোট একটা টিপয়ের ওপর মোমের বাতি জ্বলছে।

সন্তর্পণে দুয়ারে মৃদু আঘাত করলাম,—শুনছেন, একবার দোরটা খুলুন না?

ধীরে ধীরে দ্বার উন্মুক্ত হল; আমি ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু একি? ঘরে ত জনমানবের চিহ্ন মাত্রও নেই! গাটা কেমন ছম ছম করে উঠল। স্বভাবতঃই আমি ভীরু মানুষ, তায় এদিকটা একেবারেই অচেনা। এমন নির্জ্জন স্থানেও আমাকে কোনদিন আসতে হয়নি। ভাবছি ফিরে যাওয়াই উচিত, হয়তো আমারই ভুল। নইলে······

—আপনি? একটী অপরিচিত মেয়েলি কণ্ঠে প্রশ্ন হল। সর্ব্বনাশ! এবার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না, আমিই ভুল করেছি। কার সন্ধানে এ কোথায় এসে পড়লাম? ভীষণ ভয় পেয়ে পিছনে চেয়ে দেখি ঠিক দোরের কাছে দাঁড়িয়ে একটি কুড়ি একুশ বছরের তরুণী। অতি সাধারণ

পরিচ্ছদ, কিন্তু রুচি ও শিক্ষার ছাপ যেন সর্ব্বাঙ্গে লেগে আছে।

কিন্তু এমন অতর্কিত অনধিকার প্রবেশের কি যে কৈফিয়ৎ দেব ভেবে পেলাম না। অদৃষ্টের উপর সমস্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বললাম, দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আমার ভুল হয়েছে কিনা: মানে এখানে কিম্বা এরই খুব কাছাকাছি কোন বাড়ীতে একজন ভদ্রলোক থাকেন: আমারই জানাশোনা একটি মেয়েকে পড়ান। মস্ত বড় আর্টিষ্ট, আমি তাকেই খুঁজছি।

—একটি মেয়েকে পড়ান?—কি নাম বলুন ত? নাম বলতে যাচ্ছি, দেখি ধীরে ধীরে পাশের দুয়ার খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বজ্র-গম্ভীর স্বর—কে রে ইন্দ্রাণী? নাম শুনে মেয়েটীকে একবার ভালো করে দেখে নিলাম। চমৎকার মানিয়েছে নামটা। ক্ষণপূর্ব্বের গুরুভার বুক থেকে নেমে গেল। সংশয় রইল না, যাকে চাই সে ঐ পাশের ঘরেই আছে।

—মেয়েটী আমার মুখের দিকে একমুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে বলল, আপনি একমিনিট বসুন:

ইন্দ্রাণী পাশের ঘরে চলে গেল। মনে মনে বললাম তুমি না বললেও আমাকে বসতে হত, কিন্তু এমন চুপচাপ বেশীক্ষণ বসে থাকা ত আমার পোষায় না বাপু! পাঁচ বছর কলেজে মাষ্টারী করে ভিতরে ভিতরে যে কি

পরিমাণ বক্তা হয়ে উঠেছি, সে শুধু টের পাই যখন বাধ্য হয়ে একা থাকতে হয়। কিন্তু ভাগ্য আজ নিতান্তই প্রসন্ন। পাশের ঘর থেকে মিনিট খানেকের মধ্যেই উদয়ভানু বেরিয়ে এলো। গম্ভীর মুখ, দৃঢ় পদক্ষেপে কঠোর সংযমের অভিব্যক্তি।

আমাকে কোনরূপ সৌজন্য প্রকাশের অবকাশ না দিয়ে বললে নমস্কার, কাকে চান আপনি ?

হাত তুলে প্রতিনমস্কার ক'রে বললাম, আপনার কাছেই এসেছি : আপনি উদয়ভানু ?

প্রশ্ন করে এমনভাবে তাকালাম যেন আর কোনদিন তাকে দেখিনি। অভিনয়টুকু নিজের কাছেও মন্দ লাগল না।

—হ্যাঁ, বলুন, কি দরকার ?—তার চোখের দৃষ্টি এক ঝলক তীক্ষ্ণ সন্ধানী আলোর মত আমার বহিরাবরণ ভেদ ক'রে একেবারে বুকের মাঝখানে গিয়ে পৌঁছল।

বললাম, দরকার এমন কিছু জরুরী নয়, আপনার সময় থাকলে একটা অনুরোধ করতাম, এই মাত্র।

একটু হেসে উদয়ভানু বললে, আপনার অনুরোধ ঠিক কি ধরণের হবে না জানলে ত এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। আচ্ছা দাঁড়ান, আগে আপনার বসবার জায়গা করে দিই। হাত দিয়ে জড় করা কাগজগুলো একপাশে ঠেলে দিয়ে বললে, আসুন, এখানেই একটু কষ্ট করে বসতে হবে।

—না, না, এতে আর কষ্টের কি আছে ? তাড়াতাড়ি তার পাশেই বসে পড়লাম, কেমন যেন সঙ্কোচ অনুভব করছি। বললাম, আমার একখানা ছবির দরকার, কিন্তু ছবিটা খুব ভাল হওয়া চাই, মানে কতকটা রেপ্রিজেণ্টেটিভ্—

—আপনার চাওয়াটা কিছু অন্যায় নয়, কিন্তু···হ্যাঁ, ভালো কথা, আপনার নাম জানা না থাকায় বড় অসুবিধে হচ্ছে। বললাম, আমার নাম অরূপ ব্যানার্জ্জী।

—"বেশ নামটি ত ! কিন্তু ব্যাপার কি জানেন অরূপ বাবু—।" বললাম, 'বাবু'টা থাক্, শুধু অরূপ বলেই আমাকে ডাকবেন।

কথাটা বলেই তার মুখের দিকে তাকালাম। মনে হল সে যেন একমুহূর্ত্ত কি ভেবে নিলে। তারপর ঈষৎ হেসে বললে, বেশ, তাই ডাকব। কিন্তু কি জান ভাই, আমাদের মত লোকের কাছে আপনার হয়ে ওঠার অনেক বিপদ।

জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন ?

উত্তরে সে শুধু হাসল। বুঝলাম, এর বেশী এখন সে বলতে চায় না। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে সে নিজেই প্রশ্ন করলে,—আচ্ছা, এবারে বলতো তুমি রেপ্রিজেণ্টেটিভ্ ছবি কাকে বলছ ?

এ রকম প্রশ্নের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম। ছবি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ নই।

সুতরাং ও ব্যাপারে বেশ পরিপাটি করে গুছিয়ে বলবার ভাষাও আমার অজ্ঞাত। কিন্তু উত্তর কিছু দেওয়া চাই। বললাম, মনে করুন, এমন কোন সাব্জেক্ট নিয়ে আঁকতে হবে যা' একান্তই আমাদের, অন্য কোন দেশের নয়।

আমার কথা শুনে প্রথমে সে হেসে ফেললে, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, দেশের ওপর তোমার সত্যিকার দরদ আছে বুঝলাম। কিন্তু দেশ বলতে তুমি কি কতগুলো নদনদী, গিরিপর্ব্বত, মাটি আর গাছপালার কথা বলছ?

না, তা কেন বলব?—আশ্চর্য হয়ে বললাম।

তা হলে, মৃদু হেসে উদয় বললে, দেশ বলতে আমাদের আজ আর কিছু নেই।

মাফ্ করবেন, আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারিনি। আপনি বলতে চান, দেশ আমাদের নেই?

আমি বলতে চাই, তুচ্ছ সুখ আর ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে দেশের আত্মাকে আমরা বহু আগেই বলি দিয়েছি।

এ আপনার অভিমানের কথা, দোষ ত্রুটী মানুষের থাকবেই। কোন দেশ, কোন জাতিই স্বার্থ বুদ্ধির হীনতা থেকে পুরোপুরি মুক্তি পায় নি।

কিন্তু ব্যক্তির স্বার্থ আর দেশের স্বার্থ ত এক নয় অরূপ! কোথায় সে ঐকতান? সেই সকলের অন্তর থেকে জেগে-ওঠা মমত্বের স্বীকৃতি? দেশের ফলে জলে বেড়ে ওঠে মানুষ। নিঃশ্বাসে তারই মুক্ত বায়ু বুক ভরে নিয়ে সে বাঁচে; কিন্তু এ

কথা কেমন করে ভুলি, এই দেশই আবার বেঁচে থাকে সেই মানুষেরই অন্তরে। মানুষের তাজা বুক, সেই-ই তো তার দর্পণ! দেশ দেখতে চায় সেই তাজা বুকে তার আপন প্রতিচ্ছবি; তার নিজের অস্তিত্বে নিঃশংসয় হতে চায়।

সহসা তার কণ্ঠ নীরব হল। গর্জ্জমান জলস্রোত যেন প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়ে স্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়াল। আমি তার দিকে চোখ তুলে চাইলাম। সে চোখ যেন বহুদূরের, কোন লক্ষ্য বস্তুতে স্থির হয়ে আছে। যেন কোন অসীম শক্তিশালী ঐন্দ্রজালিক মায়াকাঠির স্পর্শে এক নিমিষে তার মুখের চেহারা আমূল বদলে দিয়েছে!

অনেক চেষ্টা করেও আমি কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না। শুধু স্বপ্নাবিষ্টের মত চেয়ে রইলাম। যেন আমাকে নয়, অন্য কাউকে সে বলে যেতে লাগল,—শুধু বড় কথা, শুধুই ফাঁকা আওয়াজ! নইলে কেমন করে হারিয়ে গেল সে,—সেই অশোক আর প্রতাপের দেশ?

চোখের দৃষ্টি তার ব্যথায় ম্লান হয়ে এলো। তারপর আমার দিকে চেয়ে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বললে,—মাথা পিছু যেখানে ভিন্ন পথ, ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ, সেখানে দু'দশ কোটী অধিনায়ক পেতে পার, কিন্তু রেপ্রিজেণ্টেটিভ্ আর্ট সে-মাটিতে জন্মায় না।

কথাগুলো যে আজই প্রথম শুনলাম, এমন নয়। অথচ কেমন করে যেন মনে হতে লাগল, ঠিক এমনি ক'রে না বললে

বুঝি বলাই হয় না। যেন বহুলোকের বহুদিনের ব্যবহারে বিবর্ণ কথাগুলো কোন অদৃশ্য উদ্দাম প্রাণস্রোতে অবগাহন করে, তার কণ্ঠে আজ নূতন হয়ে উঠেছে।

ধীরে ধীরে বললাম, এমন করে তো কোনদিন ভাবিনি উদয় বাবু; তাই আপনার ও প্রশ্নের আমি জবাব দিতে পারব না।

জানি না এরপরে সে কি কথা বলত। দেখি ইন্দ্রাণী দুই হাতে দু'পেয়ালা চা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কোন দিকে না চেয়েই হেসে বললে, দাদা, ঘরে আজ কিছু নেই; শুধু চা খেতে হবে কিন্তু। বুঝলাম, দাদা উপলক্ষ্য মাত্র, নইলে আমার জন্যই তার এ সঙ্কোচ।

উদয়ভানু কথাটায় কাণ দিল না; বলল, যা তো দিদি, আমার এলবাম খানা নিয়ে আয়। তারপর ধীরে ধীরে পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে, ছবি আমি আঁকি; কিন্তু কি দায়ে পড়ে যে ওর দাম নিতে হয় তা' আর কাউকে বোঝান যায় না।

বললাম, কেন? এ তো একটা নোব্‌ল প্রফেশান!

—প্রফেশান যতই নোব্‌ল হোক্, প্রয়োজন এতে সত্যিই মেটে না।

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে ইন্দ্রাণী ফিরে এলো। হাতে প্রকাণ্ড একখানা এলবাম, মরক্কো চামড়ায় বাঁধান। এল্‌বাম্ সাবধানে নামিয়ে রেখে সে চলে যাচ্ছিল; দাদার উদ্বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন শুনে ঘুরে দাঁড়াল।

—প্রবীর এখনও এলো না, ইন্দ্রাণী ?

—সে তো অনেকক্ষণ তোমার জন্য বসে আছে দাদা !

—অনেকক্ষণ বসে আছে ? কৈ, আমাকে বলিস্ নি তো !

ইন্দ্রাণী বললে,—বলতে ত তুমি বল নি !

—কি বোকা মেয়ে ! তুই আর নিজে থেকে এটুকু বলতে পারিস্ নি ? যা, তাকে এই ঘরে পাঠিয়ে দে।

ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে চলে গেল।

কিছুকাল পরেই দ্বারপ্রান্তে মৃদু পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। উদয়ভানু এক এক করে, তার ছবিগুলি আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মুখ না তুলেই বললে, এসো প্রবীর, খবর ভাল তো ?

—"না উদয় দা," প্রবীরের কথায় নৈরাশ্যের বেদনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, "প্রায় সবই ঠিক ক'রে এনেছিলাম, শেষ মুহূর্তে গোল বাধাল বসুধা রায়।"

—"বসুধা গোল বাধাল !" এতক্ষণে উদয়ভানু মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল তার দিকে।

—হ্যাঁ, তুমি ত আগে থেকে সবাইকে বলে রেখেছিলে যে, তোমার অনুমতি না নিয়ে কোন নতুন নাম এন্‌লিষ্ট করা চলবে না ?

—হ্যাঁ।

—তা' বসুধা এক রকম জোর করেই দুটী নতুন মেয়ে ভর্ত্তি করে নিয়েছে। আমাদের কারও নিষেধ শুনলে না।

শেষে তোমার আদেশ স্মরণ করিয়ে দিলাম ; তাতে বললে, ওদের সমস্ত দায়িত্ব তার। তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, সে-ই দেবে। কি করি বল? ও ফিল্ডে তাকেই তো তুমি সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছ। অগত্যা শেষের আইটেম্ দুটো বাদ দিতে হল ; আমি সাহস পেলাম না।

একটা কথারও জবাব দিলে না উদয়ভানু, শুধু কয়েক মূহূর্ত্ত মৌন হয়ে থেকে বললে, রামগড়ের খবর পেয়েছ?

—পেয়েছি। তারা চিঠি লিখে জানিয়েছে, তোমার প্রস্তাবিত পন্থায় কাজ করতে তাদেব অমত নেই।

নেটিভ্ ষ্টেট্গুলো? তারা কিছু লিখেছে?

এক হায়দারাবাদ ছাড়া অন্য কারও আপত্তি নেই ; ববং আগ্রহ দেখিয়েছে তাবা। সবগুলো চিঠিই তোমার ফাইলে রেখেছি।

উদয়ভানু ক্ষণকাল চুপ করে রইল। কি জানি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে। কিন্তু স্পষ্টই দেখলাম তার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। মৃদু অথচ কঠিন কণ্ঠে সে বললে, বসুধাকে ভার করে দাও, সে এখানে চলে আসুক, আর·········

প্রবীর উৎসুক হয়ে উঠল তার দ্বিতীয় আদেশ শুনবার জন্য। উদয়ভানু বললে, এখানে উপস্থিত তোমার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি গিয়ে বসুধাকে রিলিফ্ করবে। মেয়ে দু'টীর চলাফেরার উপর নজর রাখা দরকার। ইন্দ্রাণী তাদেব রিপোর্ট নিয়ে আসবে ; সে তোমার সঙ্গে যাক্।

প্রবীর কিছু সময় নিঃশব্দে অপেক্ষা করে বললে, কিন্তু, ইন্দ্রাণী চলে গেলে……

আমার এখন অন্য কাজ আছে প্রবীর, উদয়ভানু অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললে কথা কটা। এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার সাহস রইল না প্রবীরের ; সে মাথা নিচু করে চলে গেল।

হঠাৎ তাকে এঘরে ডেকে আনা থেকে শুরু করে তার চলে যাওয়া পর্য্যন্ত এদের কথাবার্ত্তা শুনে আমার স্পষ্টই ধারণা হল খুব সোজা পথে হাঁটা এদের স্বভাব নয়। একটু আগেই যে উদয়ভানু আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, 'আমাদের মত লোকের কাছে আপনার হয়ে ওঠার অনেক বিপদ' এখন যেন সে উক্তির মধ্যে কিছু সত্যের আভাস পেলাম। কিন্তু আসলে সে যে কি বস্তু, সে আমার বুদ্ধির অগম্যই রয়ে গেল।

সহসা ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই একেবারে উঠে দাঁড়ালাম। রাত্রি দশটা। অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়তে হয়। বললাম, রাত অনেক হয়েছে। আর একদিন এসে আমার ছবির কথাটা-পাকা করে যাবো। নমস্কার।

"নমস্কার!" প্রত্যভিবাদন করে সে একটু হাসল।

রাস্তাটা একেবারেই ফাঁকা। গ্যাসের আলোয় সবটুকু ভালো দেখা যায় না। বেশ দ্রুতপদেই চলছি। এদিকটায় ট্যাক্সি মেলা ভার। শেষ বাসখানা ছেড়ে গেলে দুর্গতির অবধি থাকবে না, সেই হেঁটে হেঁটে যেতে হবে প্রায় চারমাইল পথ।

কৃষ্ণার কথা মনে হল। সে হয়ত কত কি ভাবছে। এতরাত অবধি কোনো সংবাদ না দিয়ে বাইরে থাকা আমার অভ্যাস নয়। কাজটা ভালো হয় নি। অত বড় বাড়ীতে হয়ত ভয়ে ভয়ে জেগে আছে ঐ এক ফোঁটা মেয়ে! কিন্তু এ চিন্তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কখন যে উদয়ভানু এসে আমার সারা মন জুড়ে বসেছে আমি জানতে পারি নি। যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম, 'আমার এখন অন্য কাজ আছে প্রবীর'। বাপ্! কথা বলবার কি ভঙ্গী। হঠাৎ মনে হল, এই-ই তো ঠিক্! এই জোর! এই দৃপ্ত পৌরুষ! নইলে কিসের আকর্ষণে এমন করে ছুটে এসেছি এই নির্জ্জন বনভূমিতে? ইভার জন্মদিনের উৎসব রাত্রির কথা মনে হল। মনে মনে বললাম, তোমার সৌভাগ্যের তুলনা নেই ইভা। আশীর্ব্বাদ করি, এতবড় এক বিরাট ব্যক্তিত্বের স্পর্শে জীবন তোমার গৌরবে ভরে উঠুক, তুমি সার্থক হও।

ইভার কথা ভাবতে গিয়ে অনেকদিন আগেকার একটী ঘটনা মনে পড়ে গেল। অবশ্য এ ঘটনা আমি কৃষ্ণার কাছেই শুনেছিলাম। কৃষ্ণা ইভার সহপাঠিনী, শুধু তাই নয় বাল্যবন্ধু।

ঘটনা এমন কিছু নয়। শ্যামসুন্দর বাবু বহু ঝড় ঝাপটা কাটিয়ে উঠে যেদিন পয়সার মুখ দেখলেন, সেইদিন থেকে বা তার কিছুদিন পরেই তিনি সমাজ-জীবনে সংযমের ভারসাম্য হারাতে আরম্ভ করেন।

প্রথম দিন কতক কথাটা গোপন ছিল। কিন্তু সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন তিনি সংযমের অসারতা উপলব্ধি করলেন, তখন সাধুতার মুখোস খুলে ফেলতে তার এক মুহূর্তও সময় লাগল না। স্ত্রী জগত্তারিণী অন্তরে হায় হায় করে উঠল; লোকে কানাঘুষা করতে লাগল, শ্যামসুন্দর লম্পট, দুশ্চরিত্র, মাতাল!

দশ বছরের ফুটফুটে ঘুমন্ত মেয়েকে স্বামীর কোলে তুলে দিয়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে জগত্তারিণী বললে, কৈ, যাও তো দেখি একে ফেলে দিয়ে?

শ্যামসুন্দর বিরক্ত হয়ে বললেন, কি হচ্ছে এ সব? সরিয়ে নাও ওকে, আমায় যেতেই হবে।

শিশু কন্যাকে দুই হাতে বুকে চেপে অভাগিনী মা সেদিন উদগত অশ্রুর প্রবাহ রুদ্ধ করেছিল। ঘুমন্ত শিশু হঠাৎ কেঁদে উঠেছিল ভয় পেয়ে। সদ্য ঘুমভাঙ্গা চোখে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিল মায়ের অশ্রুসিক্ত মুখের পানে। কি বুঝেছিল সে-ই জানে! সেই দশ বছরের ফুটফুটে মেয়ে ইভা আজ পূর্ণ যৌবনা নারী।

আজ ইহলোকের ঊর্দ্ধে বসেও তার অভাগিনী মায়ের চোখের জল প্রৌঢ় পিতার উশৃঙ্খল আচরণে উদ্বেল হয়ে ওঠে কি না, তার জানা নেই; কিন্তু তার নিজের অশ্রু যে আপন অজ্ঞাতেই কতোদিন ঝরে পড়েছে সে তো তার অজানা নয়!

লম্পট, চরিত্রহীন, মাতাল⋯তবু এই চরিত্রহীন পিতার স্নেহের আশ্রয়টুকু বাদ দিলে সংসারে আর তার দাঁড়াবার স্থান নেই।

সহসা আর একখানি কচিমুখ চোখের সুমুখে ভেসে ওঠে। সেও অশ্রুজলে ভেজা, সে মুখ কৃষ্ণার। অথচ ইভা আর কৃষ্ণা⋯⋯কতোই না তফাৎ!

একজন সম্পদের প্রখর আলোয় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে; আরেকজন অপরিমেয় ঐশ্বর্যের মাঝে বাস করেও ভোগ বিলাসের নাগালের বাইরেই রয়ে গেল!

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। দেখি কখন এসে বাড়ীর ঠিক সামনেই দাঁড়িয়েছি। আমাকে দেখে দেউড়ীর দ্বারোয়ান লোহার গেট্ খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে দূরে সরে দাঁড়াল।

সোজা শয়ন কক্ষের দিকে চলেছি। এতরাত্রে শুধুমাত্র খাবার জন্য আর কারো শান্তিভঙ্গ করতে ইচ্ছা হল না। ভাবছি, নিঃশব্দে শুয়ে পড়ব। হঠাৎ পিছন থেকে প্রশ্ন হল, —এই এলে বুঝি অরূপদা?

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, হ্যাঁ। তুই এখনও জেগে রয়েছিস যে?

কৃষ্ণা ঈষৎ ক্ষুন্নকণ্ঠে বললে, কি যে আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে রাত দুপুরে ঘরে ফিরলে?

—তুই ভারি ভীতু মেয়ে কৃষ্ণা! কেন? বাড়ীর অতগুলো দাসী চাকর রয়েছে!

কৃষ্ণা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললে, থাক্, দাসী চাকর এসে আমার ঘর পাহারা দেবে নাকি? আর কথা তো তা নয়; তুমি যে এই খবর না দিয়ে এতটা রাত বাইরে কাটালে, আমার কত কি ভাবনা হয় বল তো?'

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বললাম, তোর দাদাকে গুম করবার জন্য সহরের সব বদমায়েস গুলো রাস্তায় ওৎ পেতে আছে, এ সংবাদ তোকে দিলে কে?

এতক্ষণে কৃষ্ণা হেসে ফেললে, বললে, থাম তুমি। ঘুমে আমার চোখ জুড়ে আসছে। তোমার খাবার এখানেই দিতে বলি; খেয়ে শুয়ে পড়।

—না, না, এতরাত্রে আর হাঙ্গামায় কাজ নেই।

—বাঃ! এতরাত বলে না খেয়ে থাকবে নাকি?

অগত্যা খেতে বসতে হল। আর শুধু তাই নয়, কৃষ্ণার সাথে গল্প করতে করতে যে পরিমাণ খাদ্য গলাধঃকরণ করলাম তাতে এই নিতান্ত শাদাসিধে মেয়েটীর কাছেও গোপন রইল না, আমার ক্ষুধার মাত্রা কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছিল।

নানা কথার পরে বললাম, জানিস দিদি, আজ আমি হিমালয় দর্শনে গিয়েছিলাম। কথাটা রহস্যচ্ছলে বলতে গেলেও নিজের কানেই কেমন গম্ভীর শোনাল।

কৃষ্ণা কথা বললে না, এর পরের টুকু শুনবার জন্য আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

বললাম, উদয়ভানুর কথা এর মধ্যেই ভুলে যাস্‌নি বোধ হয়? এতক্ষণ তার কাছেই ছিলাম। আলাপ পরিচয় হল। অনেক কথা শিখেও এলাম। অধ্যাপক মানুষ আমি। আমাকে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় কল্পনা করে কৃষ্ণার বোধ করি হাসি পেল।

বললাম, হাসির কথা নয় রে। তুই ভাবিস্‌, তোর দাদার কাছেই তো দিনরাত কত লোক আসে, কত কি শেখে; তাকে আবার শিখতে হয় নাকি! কিন্তু সত্যি বলছি, আজ যা কানে শুনে এলাম, যে-বিস্ময় চোখে পড়ল আজ, তার সাক্ষাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় কেতাবে খুঁজে পাইনি কোনোদিন।

কৃষ্ণা মাথা নিচু করে ছিল। তার মনের ভাব বোঝা গেল না।

আমিও কেমন আনমনা হ'য়ে পড়লাম। ঠিক মনে হল সেই রহস্যময় মানুষটির মুখোমুখী বসে আছি।

ধীরে ধীরে বললাম, কৃষ্ণা, সত্যি বলছি, আমি ওর চলার পথের সন্ধান পাইনি। কিন্তু যদি কোনদিন পাই, তুই দেখে নিস্‌, ও ছাইচাপা আগুন।

কৃষ্ণা এবারেও কোন কথা বললে না। পূর্ব্বের মতই মুখ নিচু ক'রে রইল। বললাম, তুই কি কথা বলতে ভুলে গেলি কৃষ্ণা?

তেমনি নতমুখে অতি মৃদু কণ্ঠে কৃষ্ণা বললে, না, ভুলে যাব কেন, অরূপদা। কিন্তু আমি ভাবছি, তোমার এ কেমন

খেয়াল। তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তব বলি, শক্তিমান পুরুষ কি আর কখনও দেখ নি? না, বড় কথা সাজিয়ে গুছিয়ে ইনিই আজ প্রথম শোনালেন? আমি বলছি অরূপদা, লোক তিনি যত বড়ই হন, তুমি কিন্তু ওঁর সাথে বেশী মেলামেশা কোরো না। কথাটা কোনমতে এক নিঃশ্বাসে শেষ করে কৃষ্ণা ধীরে ধীরে উঠে গেল।

সে দিনও এতটা না হলেও ঠিক এই রকম একটা আভাস পেয়েছিলাম তার কথায়। কৃষ্ণা কি শুনেছে কিছু, কিম্বা ভয়ঙ্কর কিছু দেখতে পেয়েছে এই শিল্পীর চোখে মুখে? হয়ত তাই। হয়ত সে সমস্ত কিছুই নয়, এ আমার কল্পনা মাত্র। কিন্তু এওতো বড় কম আশ্চর্য্য নয় যে, কৃষ্ণার এই অকারণ সতর্কতা যতই তীক্ষ্ণ হয় আমি যেন ততই বেশী করে এই অজ্ঞাতপরিচয় মানুষটীর ওপরে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করি। মনে মনে বললাম, কারণ তোর যাই থাক বোন, কোনো দিন যদি তার সুমুখে দাঁড়াতে হয় তো সে দিন বুঝবি, কেন তাকে এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষতি আমি সইতে চাই না।

এতদিন পরে সেই বিগত কাহিনী লিখতে বসে আজ আর বিস্ময় লাগে না। আজ জানি, ঐ অতটুকু মেয়ে কৃষ্ণা নারীর সহজ সংস্কারের কোন্ সূত্র দিয়ে কেমম করে সেই পাষাণ পুরুষকে বিচার করেছিল। কেন তার কোমল ভীরু মন আত্ম-পীড়নের নির্ম্মম দহন সহ্য করেও ব্যাকুল আশঙ্কায়

বার বার ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল, যা তার একান্ত কামনার ধন।

(৪)

উদয়ভানুর সাথে সেই যে দেখা করতে গিয়েছিলাম. তারপর দীর্ঘ চারমাস অতিবাহিত হয়েছে। কতদিন তার কথা মনে পড়ে নিজের কাছে নিজেই লজ্জা বোধ করেছি। আপনাকেই বারবার প্রশ্ন করেছি. যদি বিস্ময়কর বলেই তাকে স্বীকার করেছ, যদি দেখে থাক অভ্রভেদী হিমগিরির মত তার বিরাট মৌন রূপ, তবে এমন করে তার সান্নিধ্য এড়িয়ে চলা কেন? কেন তবে যেচে কথা দিয়েছিলে, আবার আসব? নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই খুঁজে পাই নি। সত্যই, সে তো আমাকে কোন দিন আমন্ত্রণ করে নি; তাই বজ্জনের রূঢ়তার অপবাদ তার মাথায় তুলে দেব কোন্ সাক্ষ্যের জোরে? তবু ভাবতে সত্যই ব্যথা লাগে সে আমার কথা বিস্মৃত হয়েছে।

সহরের বাইরে চলে এসেছি। সঙ্গে কৃষ্ণা। ছোট্ট পাহাড়ের ওপরে শাদা পাথরে তৈরী তিনখানি ছোট ঘর। খুব কাছাকাছি আর কোথাও লোকের বসতি নেই, স্থানটা তাই বড় নির্জ্জন। এমন নিশ্ছিদ্র নির্জ্জনতায় আমি হাঁপিয়ে উঠি। তথাপি প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার আমাকে আসতে হয় এখানে।

সংসারে নিজের কাজ বলে তো কোন বালাই নেই। বাবা চলে গেলেন আমাকে পাঁচ বছরের শিশু রেখে। আর মা? সেও তো আমাকে শেষ দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে গেছে, প্রায় তিন বছর। কিন্তু সংসার-অনভিজ্ঞ এই অভিমানী বোনটিকে নিয়ে আমার ভাবনার অন্ত নেই। ওকে যদি তুলে দিতে পারতাম ঠিক মনের মত একটি মানুষের হাতে, সেখানেই ইতি টেনে দিতাম আমার সর্ব্বশেষ দায়িত্বে।

আজ ভাবি, সঙ্কল্প সাধু হলেই কিছু আর দুঃখের লাঘব হয় না। সংসারের এই সোজা নিয়মটা তখনও তো জানতে পারি নি যে, মানুষের সমস্ত ইচ্ছার বাইরে থেকেও এক অনন্ত ইচ্ছা-শক্তির অমোঘ সঙ্কেত তাকে বিশ্বের অতি দুর্গম ঘোর মহা অরণ্যে ঘুরিয়ে মারে। বাঁধন আলগা করতে গিয়ে সংসারের দুর্ভেদ্য জালে আরো বেশী করে জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু থাক্, আমার কথা বলতে গিয়ে অপরের নিশ্চিন্ত আরামে ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। সেই সে দিনের কথাই বলি।

ছোট বড় অসংখ্য পাহাড়ে ভরা কয়েকটি পল্লীগ্রাম। লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম। এই বিস্তীর্ণ পার্ব্বত্য ভূমি কৃষ্ণার জমিদারীর এলাকাভুক্ত। মাত্র বর্ষার ক'টা মাস বাদ দিয়ে সারা বৎসর এখানে পাহাড় কেটে পাথর চালান হয়ে যায় বড় বড় সহরে, আসে প্রচুর টাকা।

কৃষ্ণার পরলোকগত পিতা অযুতাশ্ম চৌধুরীর পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অর্থরাশি এমনি করেই একদিন বিস্ময়ের সীমা অতিক্রম

করেছিল। এই যে বিপুল অর্থরাশি, যার কথা ভাবতে গেলেও কল্পনার খেই হারিয়ে যায়, দু'হাতে অন্ধের ন্যায় ছড়িয়ে দিলেও যা দু'এক পুরুষে নিঃশেষ হবার নয়, একে রক্ষা ও বৃদ্ধি করবার ক্লান্তিকর দায়িত্ব নিয়ে আমি যৎপরোনাস্তি বিব্রত হয়ে পড়েছি।

সম্প্রতি গোলযোগ বেধেছে এই পাথর কাটা মজুরদের নিয়ে। সহর থেকে এদেরই কেউ নাকি দেখে এসেছে, মিলের শ্রমিকরা সারবন্দী হয়ে কারখানার সুমুখে ভিড় করে দাঁড়ায়: চড়া গলায় একসঙ্গে মালিককে শুনিয়ে দেয়, তাদের আরো চাই, আরো অনেক বেশী, যা তাদের পাওয়ার দাবী ছিল সকলের আগে, অথচ আজও তারা পায়নি।

আরো দেখেচে তারা যে, মালিককে ভয় করে চলতে হয় তারই বেতনভুক নিঃস্ব শ্রমিকের দলকে। রাজধানী থেকে কয়েক শত মাইল দূরে থেকেও তাই তাদের এই আকস্মিক বিক্ষোভ।

শহরের মানুষ আমি। তাই প্রত্যেক কারখানায়, প্রতিটি সওদাগরী আফিসে পাইকারী রেটে যে বিষম ধর্ম্মঘটের ছড়াছড়ি, তার সত্যকার চেহারা আমার অপরিজ্ঞাত নয়। এদের পৌনঃপুনিক ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর বহর মনে করে তাই মুসড়ে পড়লাম।

শহর হলে ভয় ছিল না: কারণ সে বহুরূপী। সেখানে নানা দল, নানা চরিত্রের লোক সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায়

পরিপুষ্ট বুদ্ধিজীবীর দল,...সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, তারা সাধারণের নমস্য। নানা স্বার্থ-সিদ্ধির লোভে তারা চতুর্দ্দিকে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। যুদ্ধমান শত্রুপক্ষের দু'দলকেই তারা নিক্তির ওজনে ভাগ ক'রে তাদের অকৃত্রিম স্নেহ বিতরণ করে, আর নিঃশব্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে কমলার শূন্য ভাণ্ডার। চমৎকার ব্যবস্থা! কিন্তু এখানে তো তাদের দেখা পাব না! আর ভাগ্যগুণে যদিই বা কেউ ছিটকে এসে পড়ে, আমার মত স্থুল-বুদ্ধি অধ্যাপকের হাত দিয়ে তার সৌভাগ্যের সিংহদ্বারে সহস্র মুদ্রার নজরানা পৌঁছবে না। মহাপুরুষের বিস্ময়কর বিজ্ঞতার দাবী এখানে অন্ততঃ আঘাত পাবে। থাক, সে জন্য আমার ভাবনা নেই। কিন্তু পূর্ব্বায়োজনের কিছুমাত্র অপেক্ষা না রেখে পাথর-কাটা এই কয়েক সহস্র নিরীহ মজুর শুধুমাত্র প্রয়োজনের চাপে এই যে অসম্ভব দাবী জানিয়ে বসল, নেতৃত্বের প্রতীক্ষা করলে না, ভবিষ্যতের ভয় ভাবনা ছেড়ে বর্ত্তমানকেই আঁকড়ে ধরল বীর সৈনিকের মত, এদের শাস্ত করব কি দিয়ে?

কৃষ্ণাকে তাই এতদূরে ছুটে আসতে হ'ল। তারা দাবী জানাবে স্বয়ং মালিকের দরবারে।

দিন দু'য়েক পরের কথা। খুব ভোরের দিকে সবে মাত্র ঘুম ভেঙ্গেছে, কিন্তু আলস্য ভাঙ্গে নি। শুনলাম, কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে ডাকচে, অরূপদা, ও অরূপদা, ওঠ না।

আর একবার হাতপাগুলো যথাসম্ভব ছড়িয়ে নিয়ে বিছানা ছেড়ে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। দরজা,

জানালা বন্ধ ছিল। ধীরে সুস্থে সেগুলো উন্মুক্ত করে দিয়ে বললাম, তুই কি সারারাত জেগেছিলি নাকি ?

—কেন ? কৃষ্ণা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। তারপর যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়েছে এমনিভাবে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, কাল যদিও ঠিক জাগতে হয় নি, তবে এখন বোধ হয় তাই করতে হবে। কথার ধরণে একটু আশ্চর্য্য হয়েই বললাম, কেন ? নতুন কোন হাঙ্গামা হল নাকি ?

—হয়নি, হবার উপক্রম হয়েছে। রাস্তার দিকটায় একটা অস্বাভাবিক গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা খুলে মুখ বাড়িয়ে দেখি কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে সেই শাদা পাহাড়গুলোর দিকে। কথাত বুঝতে পারি নে ; কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ওরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে অরূপদা, গণ্ডগোলটা খুব শক্ত করেই পাকিয়ে উঠবে। তুমি এখনি সংবাদ নাও।

তখনো চোখে মুখে জল দিই নি। সকাল বেলা ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই এমন রুচিকর ঘটনার বর্ণনা শুনে মনটা রীতিমত দমে গেল। একভাবে মুখ গুঁজে বসে রইলাম প্রায় পাঁচ মিনিট। কৃষ্ণাও আর কিছু বললে না। শুধু মাঝে মাঝে আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। শেষে আমাকেই বলতে হল, বললাম, তুই অত কি ভাবছিস বল তো ? বড় জোর ওরা কাজ বন্ধ করে দেবে। তা দিক্ না। যখন এসেই পড়েছি, ব্যবস্থা একটা হবেই।

কৃষ্ণা অনুত্তেজিত কণ্ঠে বললে, হবে আর কি বল? যা সব জায়গায় হয়ে থাকে, এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হবে না। তার চেয়ে আমি বলি কি অরূপদা, ওরা যা চায় দিয়ে দাও, এত ঝঞ্ঝাটে কাজ নেই তোমার।

—ওরা যা চায়? জানিস্ তুই কি চায় ওরা?

কৃষ্ণা মাথা নেড়ে জানাল, সে জানে না। বললাম, তবেই দেখ, কিছু না জেনে আগে থেকেই যদি ওদের বলি, তোমরা যেমন কাজ করছিলে কর, সব দাবী তোমাদের মিটিয়ে দেব, ওরা ভাববে আমরা ভয় পেয়েছি। তখন আর কোনদিন কোন কিছু দিয়েই ওদের ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অথচ কতখানি ওদের দেওয়া যায়, তাও ঠিক বুঝতে পারছি না, বিপদ তো এখানেই।

দু'জনেই নীরবে বসে রইলাম ক্ষণকাল। কৃষ্ণার অবস্থা যা'ই হোক্ আমার নিজের অবস্থা সত্যই গুরুতর। ধন নেই, অথচ ধনীর পর্য্যায়ভুক্ত। কর্ম্মচারী নই, তবু কাজ কার যেতে হবে অক্লান্ত। এমন অবস্থায় কৃষ্ণাকে একা ফেলে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না।

হঠাৎ বলে ফেললাম, কলকাতায় থাকলে আজ তার কাছে উপদেশ চেয়ে নিতাম।

—"কে অরূপদা?" কৃষ্ণা শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, যার সাথে আমার মেলামেশায় তুই ভয় পেয়েছিলি।

কৃষ্ণা সহসা বুঝতে না পেরে বললে, ভয় পেয়েছিলাম ?

বললাম, কেন, মনে নেই উদয়ভাস্কর কথা ?

কৃষ্ণা এবার হেসে ফেলল, বলল, উদয়বাবুকে তুমি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছ, না অরূপদা ? তা, বেশ তো দু'একদিনের জন্য গিয়ে তার সাথে পরামর্শ করে এসো না ? যদি তোমার তাতে কাজ করতে সুবিধে হয়, আমি কেন বাধা দেব ?

চুপ করে রইলাম। কারণ, একদিন যার সাথে নেহাৎ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই গায়ে পড়ে আলাপ করে এসেছি, যে শুধু নিজের কথাই বলে গেছে আপন খেয়ালে, জানতে চায়নি আমি কে, কোথায় থাকি, কেমন করে দিন কাটাই, আজ বিপন্ন হয়ে তার কাছে গিয়ে উপদেশের জন্য হাত পেতে দাঁড়াবার মত হাস্যকর ব্যাপার আমি কল্পনাও করতে পারি নে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে কৃষ্ণা বললে, তুমি মুখ হাত ধুয়ে এসো অরূপদা, আমি ততক্ষণ চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।

আধঘণ্টা পরে সবেমাত্র বাইরের ঘরে এসে বসেছি, দু'জন মধ্যবয়সী লোক ধীরে ধীরে দ্বারের বাইরে এসে থেমে গেল,—ভিতরে আসতে পারি হুজুর ?

বেশ গম্ভীর হয়েই বললাম, এসো, কি দরকার ?

দরকার যে কি, তা' ভালো করেই জানতাম। তাই আসন্ন বিপদের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

লোক দু'টি ঘরের মধ্যে এসে আমার কাছ থেকে সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়াল।

--আমাদের কিছু নিবেদন আছে হুজুর।

বারংবার 'হুজুর' সম্বোধনে আমার অত্যন্ত লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই : তাই যথারীতি গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই বললাম, বল, কি তোমাদের নিবেদন ?

মিনিটখানেক ধরে গলা খাঁকর দিয়ে নিজেকে বেশ করে গুছিয়ে নিয়ে একজন বললে, হুজুর, আমার নাম গুণধর। আবার "হুজুর" ! ভয়ানক বিরক্ত হলাম।

বললাম, বেশতো গুণধর, যার জন্য এসেছ সেই কথাই সংক্ষেপে বল না, ভয় কি ?

হঠাৎ গুণধর যেন ভারি মজার কথা শুনেছে, এমনি হেসে বললে, --আজ্ঞে না, গরীব মানুষ আমরা, আমাদের আর ভয় ডর কি ? তবে অল্প বয়সের ছেলে ছোকরারা নানা কথা বলে, তাই আপনাদের কাছে আসে। নইলে 'এষ্টাইক্,' 'ইউনান্' এসব আমরা কোনদিন কানেও শুনি নি,—

উত্তর শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ট্রেড ইউনিয়ানের শিকর তা হলে পাথুরে মাটিকেও বাদ দেয় নি! আপাদমস্তক লোকটিকে একবার ভালো করে দেখে নিলাম।

সে কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলে না। নিজের কথার সূত্র ধরেই বলতে লাগল,—এই আমার কথাই বলি। সুখ শান্তিই বলুন, আর দুঃখ কষ্টই বলুন, আমার মেয়াদ তো প্রায় শেষ

হয়েই এলো। কিন্তু ছেলে তো আমার সে কথা শুনতে চায় না। শহর থেকে কারা নাকি এসেছে, মস্ত মানী লোক। তাদের কথামত কাজ করলে আমাদের অনেক সুবিধে হবে। তা কথাগুলো নেহাৎ মিথ্যে বলে নি।

বললাম, তোমাদের সঙ্গে কি কি কথা হ'ল খুলে বল না গুণধর -।

—আজ্ঞে বলব বৈকি? সেই জন্যই তো ছুটে আসা। প্রথম দর্শনে গুণধরকে যতখানি নির্ব্বোধ মনে হয়েছিল আসলে সে যে ততখানিই ধূর্ত্ত তা' তার দুয়েকটা কথাতেই বুঝে নিয়েছিলাম।

এতক্ষণ পরে দ্বিতীয় লোকটীর কথা সুরু হল:—সে অনেক কথা বাবু, বলে আপনার সময় নষ্ট করব না। আসল কথা, আমরা বেশ করে ভেবে দেখলাম, অন্ততঃ চার টাকা রোজ না পেলে ও পাথর কাটা কাজে আমাদের আর সুবিধে হবে না। তাই বলছিলাম, বাবু যদি একটা হুকুম দিয়ে যান।

এতদিন কতো করে পেতে তোমরা?—কৃষ্ণা ধীরে ধীরে আমার পাশে এসে ব'সল।

লোক দুটি হঠাৎ আভূমি নত হয়ে তাকে প্রণাম করল। তারপর কৃষ্ণার প্রশ্নের জবাব দিল আমার দিকে চেয়ে, বলল,— মা জননীর অজানা কিছুই নেই। এর আগে সকলেই আমরা পাচ্ছিলাম রোজ পাঁচসিকে হিসাবে। কিন্তু—

—"থাম", বেশ গম্ভীর মুখে বললে কৃষ্ণা ;—"আগে বল, চার টাকা রোজ না পেলে তোমরা কাজ করবে না, হঠাৎ এ অসম্ভব ইচ্ছা হল কেন ?"

উত্তর দিল গুণধর। সে একটুও বিচলিত হয় নি দেখলাম। বলল, 'কেনর' জবাব, আমরা মুখ্যু মানুষ, আমরা কি দেব মা ! তবে হুকুম হয়েছে যখন, এ না হলে আমরা অন্যরূপ কিছু করব না।

অপর লোকটি কথাটা আরো একটু পরিষ্কার করে বললে, আপনিই বিচার করুন বাবু, কি দিয়ে কি করি। 'ইউনান' না কি বলে ওরা, ওতে চাঁদা দিতে হয় রীতিমত। কোনমতেই তা বন্ধ করা চলবে না। তারপর আছে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখান ; তাদের খাতাপত্তর, পুঁথি পুস্তক আছে ; একটু ভালো খাওয়া, ভালো পোষাক পরিচ্ছদ, সেও তো আর না করে উপায় নেই ? দিন দিন সমস্ত জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে হু হু করে।

কৃষ্ণা নিরুত্তরে আমার দিকে তাকাল। এর একটিমাত্র সহজ সমাধান ছাড়া, ও আর কোন পথ খুঁজে পায় নি। কিন্তু সে তো আর সম্ভব নয়।

আমি তো জানি, একবার যারা সঙ্ঘ-শক্তির সন্ধান পেয়েছে, দাবী তাদের আজই এখানেই শেষ হবে না ! আর সেই অদূর ভবিষ্যৎই আমাকে আতঙ্কিত করে তুললো।

ইসারায় কৃষ্ণাকে নীরব থাকতে বলে যথাসম্ভব নিরীহ কণ্ঠে বললাম, কথাতো তোমাদের সবই শুনলাম গুণধর। তা, এখন তোমরা কাজ চালিয়ে যাও, তারপর যা হয় দেখব ভেবে চিন্তে দু'চারদিন পরে।

ভাবলাম, মিষ্টি কথায় ওদের শান্ত করে দিতে পারলে গণ্ডগোল বেশীদূর গড়াবে না; পরে যাহোক কিছু রোজ বাড়িয়ে দিলেই ওরা খুশী হবে। কিন্তু এত সহজে ভুলবার লোক গুণধর নয়। মুখে সম্ভ্রমের হাসি টেনে এনে সে শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বললে, ঐ হুকুমটি ফিরিয়ে নিতে হবে হুজুর। আর যা'ই করি মুখ্য বলে নিজেদের ছেলেপুলেদের সঙ্গে কথার খেলাপ করতে পারব না। আমাদের নিবেদন মত ব্যবস্থা না হলে বাধ্য হয়েই কাজ বন্ধ রাখতে হবে।

শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। মাত্র ছ'মাস আগে এখানে এসেছিলাম। তখনও এরা মাটীর মানুষ। আর এই ছ'মাসের মধ্যে এদের কতই না পরিবর্ত্তন হয়েছে!

লোক দু'টী আর কথা বললে না; যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আমাদের দু'জনকেই আর একবার ঘটা করে প্রণাম করে গেল।

হঠাৎ বলে ফেললাম, তোকে না আনলেই ভালো ছিল দিদি। দেখলি তো বেটাদের কাণ্ডখানা? 'হুজুর', 'বাবু', 'মা জননী' কিছুই তো বলতে বাকী রাখলে না। অথচ, ইনিয়ে, বিনিয়ে, কেমন শক্ত শক্ত কথাগুলো শুনিয়ে গেল।

কৃষ্ণা হঠাৎ ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, দাও না ওদের দাবী মিটিয়ে অরূপদা ! ওরাও খুসী হবে, আমরাও নিষ্কৃতি পাব মিথ্যে হৈ চৈ আর গোলমালের হাত থেকে।

তখনো কিছু স্থির করতে পারি নি। কৃষ্ণার অবশ্য বরাবরই ঐ এককথা। কিন্তু ওর মধ্যে সমাধান কই ? তাই চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। আমার মৌনতা দেখে কতকটা আশ্বস্ত হল কৃষ্ণা। বললে, কিই বা এমন টাকা ! হলই না হয় কিছু কম লাভ। তবু তো দুর্ভাবনা নিয়ে দিন কাটাতে হবে না, তুমিই বল না অরূপদা ?

কথাটা শেষ করে এমনভাবে ও আমার দিকে তাকাল যে, প্রতিবাদ করে ওকে আরো উদ্বাস্ত করতে ইচ্ছে হল না।

ঐ তো অতটুকু মেয়ে, ফুলের মত নরম ! কঠোর রাজনীতির এই অনিবার্য্য উত্তপ্ত বাতাস স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করবে ও কিসের জোরে ? তাই সবার চেয়ে সহজ পথে ও সংঘাত এড়িয়ে চলতে চায়।

ওকে নিশ্চিন্ত করবার জন্যই জোর করে মুখে হাসি এনে বললাম, সে কথা সত্যি। তবু ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বসা উচিত হবে না। কিন্তু তোর এত ভাবনা কিসের বলতো ? গোলমাল এক আধটু হয়েই থাকে। তা বলে মাথা নুইয়ে থাকতে হবে নাকি ?

কৃষ্ণা বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, পিয়ন এসে কয়েকখানা পত্র দিয়ে গেল। আলোচনাটা সুতরাং এখানেই বন্ধ

করে দিলাম আজকের মত। কয়েকটা চিঠি অত্যন্ত জরুরী, এক্সপ্রেস্ ডেলিভারী হয়েছে। কৃষ্ণা উঠে যাচ্ছিল ঘর থেকে। একখানা খামের চিঠি তুলে নিয়ে বললাম, এই নে, তোর নামে এসেছে।

চিঠি হাতে নিয়ে ও বললে, আমি অতশত বুঝিনে অরূপদা, অযুতাশ্ব চৌধুরীর মেয়ে আমি, তোমার বোন,— মান খুইয়ে, নিচু হয়ে শান্তি কিম্বা আরাম কোনটাই আমি চাইনে। তবু একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, যদি অন্যায় বলেই না বুঝে থাক ওদের দাবী, দিও তা শেষ পাই অবধি মিটিয়ে ; টাকার ওপরে অন্ধ মমতা আমার নেই।

ধীরে ধীরে চলে গেল কৃষ্ণা, সবটুকু ভালোমন্দর দায়িত্ব, ন্যায় অন্যায়ের বিচার আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে।

খোলা জানালার ফাঁকে দূরে চেয়ে রইলাম, অনেক দূরের শাদা পাহাড়গুলোর দিকে। সকাল বেলার নরম মিঠে রোদ ওদের গা বেয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে অনেক···অনেক নীচে, কঙ্করময় তৃণহীন প্রান্তরের বুকে।

সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। দুধের মত ধব্ ধবে চূড়াগুলো তাদের আকাশ ফুঁড়ে উঠে গেছে আরো অনেক উর্দ্ধে, স্বার্থ-সংঘাত-ক্লিষ্ট মৌন পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে। কিন্তু আর না, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর বুকের অসংখ্য ক্ষত, কিম্বা নির্ম্মেঘ আকাশের সীমাহীন ব্যাপ্তি, এর কিছু নিয়েই হা হুতাশ বা কবিত্ব করবার সময় নেই আমার। দৃষ্টি ফিরে এলো

এইমাত্র হাতে আসা চিঠিগুলির ওপর। আজই জবাব দেওয়া দরকার। তারপর বাকী রইল আসল কাজ —পাথরকাটা দিন মজুরদের বিক্ষোভের শান্তিপর্ব্ব।

ঘণ্টা তিনেক পরে। প্রায় সব চিঠিরই জবাব লিখে ফেলেছি, মাত্র একখানা বাকী। ঝি এসে বললে,—রান্না হয়ে গেছে ছোটবাবু। দিদিমণি বললেন আপনাকে খেয়ে নিতে। কথাটা কেমন লাগল। এখানে বলে নয়, কলকাতার বাড়ীতেও অন্য কাউকে দিয়ে কৃষ্ণা আমার খাবার তাগিদ পাঠায় না কোনদিন। বললাম, দিদিমণি কোথায়? তার খাওয়া হয়েছে? বহুদিনের পুরনো ঝি। এ-বাড়ীর নিয়ম কানুন সে সবই জানে, বললে,—না। সেই থেকে শুয়ে আছেন দিদিমণি। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন, শরীরটা কেমন ভালো লাগছে না।—

"শরীরটা ভালো লাগছে না--", চমকে উঠলাম! এই বিদেশ বিভূঁয়ে তেমন কোন অসুখ হলে আর রক্ষা থাকবে না। শহর তো নয়ই, বরং এমনি যায়গা যে, মাথা খুঁড়ে মরলেও একজন ভালো ডাক্তার মিলবে না। হাতের কাজ ফেলে রেখে উঠে পড়লাম।

এসে দেখি কৃষ্ণা আকণ্ঠ চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কাছে গিয়ে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললাম, কেন দিদি এমন করে

শুয়ে ? —মনে পড়ে গেল সদ্য-পিতৃহারা সেই কৃষ্ণাকে। সেদিনও ঠিক এমনি করেই শুয়েছিল সে।

চোখ বুঁজেছিল কৃষ্ণা। আমার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বললে, গায়ে হাত দিয়ে দেখ তো অন্নপদা, কপালের রগ দুটো কেমন টন্ টন্ করছে।--

হাত দিয়ে কপাল স্পর্শ করেই ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত্তের জন্য অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম,—ও কিছু নয়। গাটা একটু গরম হয়েছে।

আস্তে আস্তে ওর মুখের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিলাম।

—তুমি দেরী করো না অন্নপদা, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও,—কৃষ্ণা ধীরে ধীরে বলল।

বললাম,—কেন রে ? বেলা এমন কিছু বেশী হয় নি।

—না, না, অনেক বেলা হয়েছে, তোমাকে আর বসতে হবে না আমার কাছে। বরং ঝিকে ডেকে দাও, মাথাটা ধুইয়ে দিক্।—

—"দিই"—বলে চিন্তিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

কোনমতে স্নানাহার শেষ করে কৃষ্ণার কাছে ফিরে এলাম। ঝি বললে, ঘুমিয়ে পড়েছেন দিদিমণি। খবর শুনে খুশী হতে পারলাম না। এতবড় প্রবল জ্বরের মুখে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়াটা খুব শুভ লক্ষণ নয়।

বললাম, তুমি যাও ঝি, দিদিমণির কাছে আমিই বসছি—

কৃষ্ণার মাথার কাছে বসে অতি সন্তর্পণে ডাকলাম, "কৃষ্ণা?" —কৃষ্ণা ঘুমোয়নি। শুধু জ্বরের ঘোরে নির্জীব, নিস্তেজ, হয়ে পড়েছিল, ধীরে ধীরে চোখ খুলে তাকাল। উঃ! কি ভয়ঙ্কর লাল চোখ দু'টো! আর শুধু কি চোখ? সারা মুখেই কে যেন সিঁদূর মাখিয়ে দিয়েছে!

যেন অনেক দূর থেকে কে কথা বলছে, এমনি ক্ষীণ স্বরে কৃষ্ণা বললে, কি করা যায় অরূপদা?

আমিও এতক্ষণ ঐ এক কথাই ভাবছিলাম, কি করা যায়! কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারি নি। কৃষ্ণার কথায় আর একবার ভাবতে শুরু করলাম। কিন্তু ঐ শুরু করাই সব, 'শেষ' কোথাও আর দেখতে পেলাম না।

—কৈ, কিছু বললে না তো? —কৃষ্ণা অসহায়ের মত বললে। ওর হাতখানা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে আঙুলগুলো টেনে দিচ্ছি, আর ভাবছি আকাশ পাতাল। জবাব দিলাম ওর প্রশ্নটা এড়িয়ে, কতবার তোকে বলেছি, ঠিক সময় খাওয়া দাওয়া কর, ঠিক মত ঘুমো। তা শুনেছিস আমার কথা কোনদিন? সেই আমার জন্যে বসে থাকবি রাত দুপুর অবধি,—

কৃষ্ণা হাসল একটু, কিন্তু চুপ করে রইল।

বললাম,—ভাবিস নে তুই, এ সামান্য জ্বর, দু'এক দিনে আপনিই ভালো হয়ে যাবে।

কৃষ্ণা প্রতিবাদ করলে না, শুধু অতি ক্লান্তস্বরে বললে, অরূপদা, তুমি বরং একটা তার করে দাও কলকাতায়। কোন নার্সিং হোম থেকে--

ওর কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাল,-- কেন ভয় পাচ্ছিস বোন? সত্যিই বলছি, তুই তু'দিনেই ভালো হয়ে উঠবি---

কৃষ্ণা এ কথায় কতখানি আশ্বস্ত হল, আদৌ কোন আশ্বাস পেল কিনা বোঝা গেল না, কিন্তু আর একটাও কথা কইল না। আমার বুকের মধ্যে ভয়ে ও তুশ্চিন্তায় কি যে হচ্ছিল বলে বোঝান যায় না: আর কাকেই বা বলি? পরিচিত লোক শহরে যে নেই তা নয়, তবু এমন ঘনিষ্ঠতাও কারো সাথে নেই, যাকে অসঙ্কোচে বিপদের দিনে ডাক দিতে পারি।

কোনদিন নিজেকে এমন অসহায় মনে হয়নি আমার। বিপদ আসেনি তা নয়; ঝড় ঝাপটা তুঃখ কষ্টের নির্ম্মম অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখীনও হয়েছি বহুবার; কিন্তু মুক্তির সম্ভাবনাও ছিল তার পাশে পাশে। সে বিপদ কেটেও গেছে। আজ হতবুদ্ধি হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন সম্বলই হাতে নেই। অথচ ওষুধ, পথ্য, শুশ্রূষা—এর কোনটাই বাদ দেওয়া চলবে না।

কৃষ্ণার মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম, গায়ের তাপ আরো বেশী মনে হল। ও কিন্তু এবারে চোখ মেলে

চাইল না। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত দু'টো বাইরে ছিল, আস্তে আস্তে ঢেকে দিলাম। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি ওর দিকে। ভাবছি, এখানেই একবার সন্ধান নিয়ে দেখব। হোক না পাড়া গাঁ? মানুষ তো এরাও? পাশ করা না হোক রোগ হলে ওষুধ দেয় এমন লোক নিশ্চয়ই আছে। হঠাৎ মনে হল, কৃষ্ণার শ্বাস প্রশ্বাসের গতি কিছু যেন অস্বাভাবিক। না, আর দেরী করা চলবে না। যেমন করে পারি ওষুধ আনতেই হবে।

অন্য কাউকে কাছে বসবার জন্য ডাকতে যাচ্ছি, দেখি ঝি ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এদিকেই আসছে। ঘরে ঢুকেই বললে, সকালের সেই লোক এসেছে ছোটবাবু—

—এসেছে নাকি?—হঠাৎ একেবারে উঠে দাঁড়ালাম। উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের তলায় তলিয়ে যাবার ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তটিতে একটুখানি আশ্রয় দেখতে পেলাম যেন। কোথায় গেল ঘণ্টাকয়েক পূর্ব্বের বৈরীভাব, আর কোথায় বা রইল শিক্ষিতের অহংভরা অভিমান! গুণধরের উদ্ধত কঠিন মুখ-খানাই আমার নিতান্ত আপনার বলে মনে হল। মনে মনে বললাম, তোমাদের সকলের চেষ্টায় বোনটি আমার ভালো হয়ে উঠুক গুণধর; সাধ্যের অতীত না হলে, কোন দাবীই তোমাদের অপূর্ণ থাকবে না।

নিজের কাছে ত কিছুই লুকান যায় না? তাই ত আজ আশ্চর্য্য হয়ে ভাবি, মানুষ কত সহজেই না ভেঙ্গে পড়ে!

ভাবি, মানুষের শিক্ষা, অর্থাভিমান, আভিজাত্য কিছুই কিছু কাজে আসে না, যতক্ষণ না সে নিজের জোরে দাঁড়াতে শেখে; দাঁড়ায় মানুষের কল্যাণের আদর্শকে সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে। জানি তোমরা হাসবে, বলবে, এমন নূতন কি শোনালে বাপু? এ তো সকলেই জানে। সত্যই তাই। সকলে না হোক্, কেউ কেউ নিশ্চয়ই জানে। আর নূতন তথ্য শোনাবার গর্ব্বও করিনে। তবু একথা তো অস্বীকার করবার যো নেই যে, শুধু জানার জোরেই ও সত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা পায় না! তার জন্য দরকার একাগ্র সাধনার অফুরন্ত শক্তি। সে জোর, সে শক্তি আমার নেই; যার আছে তাকে প্রণাম জানাই। কিন্তু এখন এ কথা থাক, সেদিনের কথাটাই আগে বলি।

দূর থেকেই দেখতে পেলাম গুণধর বাইরের ঘরখানায় বসে আছে। কিন্তু এবার তার সঙ্গী বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবক। পরিষ্কার চক্‌চকে জামা জুতো পরা, বেশ ফিট্‌ফাট্।

ঘরে ঢুকেই বললাম, এই যে গুণধর, তোমার কথাই ভাবছিলাম—

গুণধর তাড়াতাড়ি উঠে হাত জোড় করে প্রণাম করল আমাকে। যুবকটি বললে, নমস্কার।

হাত তুলে প্রতিনমস্কার করে বললাম, বস, বস ভাই। তুমিও বস না গুণধর, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

গুণধর বসল বটে, কিন্তু এমনভাবে আমার দিকে চাইল যাতে স্পষ্টই বুঝলাম, মাত্র ঘণ্টাকয়েকের ব্যবধানে আমার অভ্যর্থনার ব্যতিক্রমটুকু ওর চোখ এড়ায় নি। লোকটা সত্যই বুদ্ধিমান।

সেই সকালের মতই ব্যঙ্গ-মিশান স্বরে সে বললে, হুজুর কি সিদ্ধান্ত করলেন, জানতে এলাম।

—ও! সেই কথা? কিন্তু ভেবে দেখবার যে এখনো অবসর পাইনি গুণধর। তা হোক্, তোমাদেরও যাতে কষ্ট না হয়, অথচ মনিবও বাঁচেন, এমন একটা বন্দোবস্ত করতেই হবে। কিন্তু এদিকে যে-বিপদে পড়েছি তার যে কি উপায় করব--

গুণধর উৎসুক হয়ে উঠল, বলল, আমাকে বলতে যদি বাধা না থাকে হুজুর, তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বললাম,—আমার বোনটিকে তো দেখলে আজ সকালে? তাকে নিয়েই বড় ভাবনায় পড়ে গেছি। দুপুর থেকেই জ্বর সুরু হ'ল; এখন একেবারেই হুঁস্ নেই।—

গুণধর যেন গ্রাহ্যই করলে না কথাটা; বললে,—এই? তা এতে আর ভাবনার কি আছে?—হাত দিয়ে পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবকটিকে দেখিয়ে বললে, এই যে দেখছেন হুজুর, বয়সে ছেলেমানুষ হলেও ওষুধ দেবেন একেবারে ধন্বন্তরী! কতো শক্ত শক্ত রোগ উনি সারিয়ে দেন—

হাতের মুঠোয় স্বর্গ পাই নি কোনদিন ; পেলেও তাতে এর চেয়ে বেশী আনন্দ হত না, একথা হলফ্ করেই বলতে পারি।

কৃতজ্ঞতায় অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। মনে মনে বললাম,—আমাকে বাঁচালে গুণধর! তারপর তরুণ যুবকটিকে লক্ষ্য করে বললাম, তা হলে আর দেরী নয় ভাই ; একেবারে রোগী দেখে ওষুধের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে তোমার সঙ্গে কথা হবে।

বেশ তো, চলুন—তরুণটি উঠে দাঁড়াল।

মিনিট পাঁচেক পরে তাকে সঙ্গে করে রোগীর ঘর থেকে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন সূর্য্য নেমে এসেছে পশ্চিম চক্রবালে।

পরীক্ষারত তার মুখের দিকে চেয়ে, তার ক্ষিপ্র অথচ সতর্ক যন্ত্রব্যবহার দেখে এক নিমেষেই নিঃসংশয় হলাম, সে হাত অশিক্ষিত অপটুর হাত নয় ; নির্ভয়ে বিশ্বাস করবার মত অভিজ্ঞতার সীলমোহর বহু পূর্ব্বেই সেখানে অঙ্কিত হয়ে আছে। যুবকটি বসবার ঘর অবধি নিঃশব্দেই চলে এলো, বুঝলাম রোগ সম্বন্ধেই কিছু চিন্তা করছে সে।

প্রশ্ন করলাম, কেমন দেখলে ভাই ?

যুবক উত্তর দিল একটু থেমে থেমে,—ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে টেম্পারেচার এত 'হাই' যে কোন 'ম্যালিগ্ন্যান্ট্ ইনফেক্শান্' বলেই সন্দেহ হয়।

ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্‌ ইন্‌ফেকশান্‌! কানের মধ্যে দিয়ে এক ঝলক্‌ তরল আগুন আমার বুকের ঠিক মাঝখানটায় ছিট্‌কে পড়ল যেন। মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, এখন উপায়! যুবক কিন্তু ততক্ষণে চিকিৎসকের ভূমিকায় নেমে এসেছে। মুখে ঠিক সেই পরিমাণ গাম্ভীর্য্য নিয়ে বললে, এত অল্পেই নার্ভাস হলে তো চলবে না। লোক পাঠিয়ে দিন আমার সঙ্গে, ওষুধ নিয়ে আসুক। যুবক উঠে দাঁড়াল, হ্যাঁ, উঠুন এবার। আমাদের আবার অনেক যায়গায় যেতে হবে।

বললাম, চল, আমাকেই যেতে হবে তোমার সঙ্গে।

—না, না, সে কি কথা হুজুর! আপনি এখানেই থাকুন মার কাছে। আমি ওষুধ এনে দিচ্ছি।

—ওর বাড়ীটা যে চিনে রাখতে হবে গুণধর। তোমরা তো আছই। কিন্তু রাত বিকেলে দরকার হলে তখন তো আমাকেই যেতে হবে।

যুবক বলল, তা হলে তাই চলুন, ওষুধটা একটু তাড়াতাড়ি পড়লেই ভালো হয়।

ঝিকে কৃষ্ণার কাছে রেখে বেরিয়ে পড়লাম।

বোধহয় দশ পনের মিনিটের পথ চলে এসেছি। গুণধর সঙ্গে নেই, একটু আগেই চলে গেছে। এতক্ষণ পরে এই কথা বললাম, তোমার নামটি কিন্তু এখনও জানা হয় নি ভাই,—

যুবকের কানে বোধ হয় আমার কথার প্রথম অংশ প্রবেশ করে নি। কি যেন ভাবছিল সে একেবারে তন্ময় হয়ে। মনে হল শেষের ঐ 'ভাই'টুকুই সে শুনতে পেয়েছে।

একটু অপ্রতিভ হয়ে বললে, কিছু বলছেন আমাকে?

—হ্যাঁ, বলছিলাম, তোমার নামটা এখনও জানা হ'ল না।

পরঞ্জয় সেন,—হেসে জবাব দিল যুবক।

—বেশ নামটিতো ভাই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

হঠাৎ নামটার ভালো হওয়ার সঙ্গে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ কামনার সম্বন্ধ ধরতে না পেরে, সে বিস্মিত হয়ে চাইল আমার দিকে, কথা বললো না।

এগিয়ে চলেছি ছু'জনেই, অত্যন্ত দ্রুতপদে অজস্র কাটল ধরা মাঠের মধ্য দিয়ে; অবশ্য বিষম কঙ্করময় বন্ধুর পথে যতখানি দ্রুত সম্ভব। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত প্রকাণ্ড রক্তপিণ্ডটা ঐ ডুবে গেল পাহাড়ের আড়ালে। মাঝে মাঝে ছু'একটি লোক যাচ্ছে; অনেক দূর দিয়ে, পরস্পরের মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান রেখে। কারো সাথে কারো এতটুকু সম্বন্ধ নেই যেন; এমনি নিস্তব্ধ, নিথর চারিদিক।

জিজ্ঞাসা করলাম, আর কতদূরে পরঞ্জয়?

—এই যে, এসে পড়েছি। উত্তরে ঐ যে পাহাড় ঢালু হয়ে নেমে এসেছে খানিকটা, ওরই গায়ে একটি ছোট বাড়ী; ওখানেই থাকি আমরা,—

'আমি'র পরিবর্তে বহু বচন প্রয়োগ এক্ষেত্রে যে গৌরবাত্মক নয়, বুঝলাম। ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করি, আর কে কে আছেন। কিন্তু বিষয়টা কিছু ব্যক্তিগত হয়ে পড়ে, তাই চুপ করে রইলাম।

আরো মিনিট দশেক নিঃশব্দে হেঁটে পাহাড়ের গা-ঘেঁসা ছোট বাড়ীটার সুমুখে এসে দাঁড়ালাম। পাঁচীল-ঘেরা বাড়ী নয়, একেবারে অভ্যন্তরে চলে যায় চোখের দৃষ্টি অবাধে।

পরঞ্জয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। হঠাৎ আমার পায়ের আওয়াজ না পেয়ে পিছন ফিরে বলল, ওকি! থেমে গেলেন যে? আসুন না সোজা চলে,—

—আমি বরং এখানেই অপেক্ষা করছি পরঞ্জয়, তুমি ওষুধ তৈরী করে আন।

—কেন? বাইরে দাঁড়াবেন কেন?

একটু হেসে বললাম,—এমনিই! মেয়েরা সব কাজ করছেন ওখানে—

করলেনই বা! কিন্তু আপনার আসার বাধা কোথায়, তাতো বুঝতে পারছি না—হ্যাঁ, আপনাকে কি বলে ডাকব বলুন তো?—

প্রশ্নটা সে এমনভাবে করলে যে না হেসে পারলাম না। বললাম,— আমার নাম অরূপ ব্যানার্জ্জি। তোমার সুবিধে মত যেমন খুশী ডাকতে পার।

ঘরে ঢুকতে এসেই দেখেছিলাম, একটী তরুণী নিবিষ্ট মনে একখানি বই পড়ছে। এতক্ষণের মধ্যে একবারও সে মুখ তুলে তাকায় নি, হঠাৎ নামটা কানে যেতেই আমার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইল। আমি অন্যত্র মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

পরঞ্জয় একখানি মাতুর টেনে নিয়ে বিছিয়ে দিয়ে বললে,—বসুন এখানে; আমি ওষুধ তৈরী করে আনছি।

মেয়েটি সেই যে একবার মাত্র আমার দিকে তাকিয়েছিল, সেই থেকে একভাবেই বসে আছে বই নিয়ে। আর কোনদিকে যে কিছুমাত্র লক্ষ্য আছে তার, বুঝবার উপায় নেই, এমনি নির্ব্বিকার।

এবার কিন্তু মেয়েটি উঠে গেল ধীরে ধীরে। মিনিট চার পাঁচ,— দেখি পরঞ্জয় আমার দিকেই আসছে।

কৃষ্ণাকে ঐ অবস্থায় একা ফেলে এসে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। বললাম, দাও ভাই ওষুধটা, বড় দেরী হয়ে গেল। ওদিকে যে কি হচ্ছে কে জানে!

পরঞ্জয় ঈষৎ হেসে বললে, আর দু'চার মিনিট বসতে হবে অরূপবাবু। ওষুধ তৈরী করতে দিয়েছি, প্রায় হয়ে এলো। ততক্ষণ আপনার আপত্তি না থাকে তো আমরা চা খেয়ে নিই।

সত্যিই চা খাওয়ার মত মনের অবস্থা ছিল না। কিন্তু কথাটা বলবার আগেই মেয়েটি চা নিয়ে এলো। তারপর চায়ের কাপদুটো আমাদের সামনে রেখে বললে, আজো কিন্তু শুধু চা-ই খেতে হবে। এবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকালাম। নিখুঁত সুন্দর ঢলঢলে কচি মুখ। কথাটা বলতে গিয়ে একটু হেসেছিল বোধহয়; এখনও সেই হাসিই লেগে আছে চোখে মুখে।

আর একটি সন্ধ্যার কথা স্মরণ হল। সেখানেও ঠিক এমনি কি একটা শুনেছিলাম। অথচ দু'টি সন্ধ্যায় কতোই না তফাৎ। সে দিন উৎসাহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম পরম সুন্দর এক পুরুষকে; যে পুরুষ ব্যক্তিত্বে বিরাট, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল! যে মানুষ দুঃখের আগুনে পুড়ে হয়েছে খাঁটি সোনা। সে দিন বাড়ী ফিরবার কথা মনে হয়নি একবারও। আর আজ এসেছি দারুণ উৎকণ্ঠা নিয়ে; ভয়ে ভয়ে কাটছে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত। কি জানি, কোন্ বিপদ এগিয়ে আসছে চুপি চুপি নিঃশব্দ পায়ে।

চা খেতে খেতে পরঞ্জয় বললে, আপনাদের ও বাড়ীতে আর কাউকে ত দেখলাম না অপরূপবাবু? মানে আর কোন মেয়ে? আপনার মা কিম্বা আর কেউ? —

বললাম, আর কেউ তো নেই ভাই, ঐ বোনটি ছাড়া। ও বাড়ীতেও নয়; অন্য কোনো বাড়ীতেও নয়। কিন্তু এমন জায়গায় তোমরা বাস করতে এলে কেন পরঞ্জয়?

পরঞ্জয় ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করলে, তারপর ঈষৎ হেসে বললে, এখানে বারোমাস থাকি নে; বিশেষ কাজে আসতে হয়েছে। হয়তো খুব শীগ্‌গিরই চলে যাব। এই যে, আপনার ওষুধ এসে গেছে। একটি সতেরো আঠারো বছরের ছেলের হাত থেকে তিনটি ওষুধ ভরা শিশি নিজের হাতে নিয়ে বললে, দেখে নিন, বোতলের গায়ে নম্বর লাগান আছে, আর এই কাগজে লেখা আছে সব ;—কখন কোনটা কি ভাবে খাওয়াতে হবে ইত্যাদি। কিন্তু শুশ্রূষার ব্যবস্থাটা ভাল ভাবে করা চাই। জানেন তো, ওটা ওষুধের চেয়ে বেশী দরকার !

এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হাসি পেল। মনে মনে বললাম, জানি তো সবই। কিন্তু ঐ জানার বেশী যে আর কিছু করবার নেই তাও খুব ভালো করেই জানি। মুখে বললাম,—সে তো ঠিকই। দেখি, কতোটা কি করতে পারি—

ঘরের বাইরে এসে পড়েছি, সহসা একটা কথা মনে হতেই ডাকলাম, একবার এদিকে এসো তো পরঞ্জয়—দেখলাম মেয়েটি হাতে একটি ছোট লণ্ঠন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরা। উদ্দেশ্য, আমার বেরুবার পথে কিছুটা আলোক-সম্পাত করা।

পরঞ্জয় কাছে আসতেই তার হাতে কয়েকখানি নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, তোমার ওষুধের দামটা।

—ওষুধের দাম ? কিন্তু ও তো বিক্রি করবার ওষুধ নয় অরূপবাবু ! আপনার অমর্যাদা করছি নে। সত্যি বলছি, দাম নেবার হুকুম নেই। এ টাকা আপনাকে ফিরিয়ে নিতে হবে।

এমন অদ্ভুত কথাও তো কোনোদিন শুনি নি বাপু ! ওষুধ নেব, অথচ দাম দেওয়া চলবে না ! কিন্তু এ অবস্থায় এই নিয়ে তর্ক করাটা সমীচীন মনে হ'ল না। বললাম, বেশ তো ভাই, টাকা না হয় ফিরিয়ে নিচ্ছি ; কিন্তু কারণটাও কি শুনতে পাই নে ?

পরঞ্জয় শিক্ষিত ছেলে, বুঝতে পারল, কোথায় আমার বাধছে। বললে, কেন পাবেন না ? কিন্তু সে অনেক কথা, সংক্ষেপে বলতে গেলে আপনি হয়তো ভুল বুঝবেন। তা ছাড়া, আপনার আর দেরী করাও ঠিক উচিত হবে না।

কথাটা ঠিক। আর কিছু না বলে একেবারে বাড়ীর বাইরে পা বাড়িয়েছি, শুনলাম, "অন্ধকারে যেতে ওঁর নিশ্চয় খুব কষ্ট হবে পরঞ্জয় বাবু। একটা টর্চ্চ বরং দিয়ে দিন" -মৃদু মেয়েলী স্বর !

—একটু দাঁড়ান অপরূপবাবু, পরঞ্জয় ডাকল পিছন থেকে, কাছে এসে বললে, নিন, এইটে নিয়ে যান, যে অন্ধকার ; আর কাল খুব সকালেই একটা খবর দিতে ভুলবেন না যেন। টাকা নিই নি বলে আপনার সঙ্কোচের কারণ নেই কিছু। প্রয়োজন হলেই ডাকবেন। এ আমার কর্ত্তব্য।

বললাম, আচ্ছা।

(৫)

পরদিন সকাল বেলা।

মাথাটা ভারি হয়ে আছে। সারা রাত কেটেছে কৃষ্ণার শিয়রে। ভোরের দিকে গায়ের তাপ অনেকটা কমে এসেছে। বিপদ বোধ হয় কেটে গেল।

ঘরের সম্মুখেই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। ধীরে ধীরে পায়চারি করছি; ভাবছি, কৃষ্ণা ভালো হয়ে গেলেই কলকাতায় চলে যাব, এখানে আর এক মুহূর্ত্তও নয়।

কিন্তু পাথর কাটার ব্যাপারটা এখনও কিছু স্থির করতে পারি নি। তা হোক, ত্'চার দিন কাজ না হলেই এমন কিছু ক্ষতি হবে না। কলকাতায় গিয়ে উদয়ভানুর সঙ্গে একবার হয়তো আলোচনাও করা যাবে, অবশ্য পরোক্ষ ভাবে।

উদয়ভানুর কথা মনে হতেই অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠলাম।

হাতে কাজ ছিল না, ভাবলাম, একখানা চিঠি লিখলে মন্দ হয় না তার কাছে। হঠাৎ গিয়ে একেবারে উপস্থিত হব? হয়তো চিনতেই পারবে না আমাকে। তার চেয়ে আগে থেকেই মনে করিয়ে দিই—"আমি সেই চার মাস আগেকার অরূপ। আপনার হাতে আঁকা একটা ছবি চাইতে গিয়াছিলাম একদিন সন্ধ্যা বেলা; অনেক কথাই

সেদিন শুনেছিলাম আপনার মুখে : সে সব কিছুই ভুলি নি। আমি সেই অরূপ ?" এমনি লিখে দেব আরো দু'চার কথা, যাতে ভুল না হয় আমাকে চিনতে : যাতে·········

---"দিদিমণি একবার আসতে বললেন, ছোটবাবু"---ঝি দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে।

চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেললাম, বললাম - যাচ্ছি।

গিয়ে দেখি কৃষ্ণা বালিশ ঠেস দিয়ে বসে আছে, হাতে কালকের সেই চিঠি। একটু রাগ হল, বললাম,—একি ছেলেমানুষী হচ্ছে শুনি ? কাল অত বড় জ্বর, এখনো রীতিমত গরম রয়েছে গা ! আর তুই উঠে বসেছিস ? এমন নস যে নিজের ভালোমন্দ বুঝতে পারিস নে—

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে বললে, --বেশীক্ষণ বসি নি তো, তুমি আসার মিনিট খানেক আগে -

- তাই বা বসবি কেন ? বার বার নিষেধ করেছি না ?

কৃষ্ণা একটু সময় চুপ করে থেকে বললে, --জান অরূপদা, কেন তোমাকে ডেকেছি ?

—থাক। এখন চুপ করে শুয়ে থাকতো তুই ! যার জন্যই হোক, সে কথা পরে শুনলেও চলবে।

না অরূপদা, তুমি রাগ কর না। এই চিঠিটা তোমাকে শুনতেই হবে।

ওকে কোনদিন কোন ব্যাপার নিয়েই জেদ করতে দেখি নি। একটু কৌতূহল হ'ল। তথাপি ওর অসুস্থতার

কথা চিন্তা করে বললাম, অবাধ্য হ'স নে কৃষ্ণা। আজ একটা দিন একটু সাবধানে থাক, কাল তোর সব কথা শুনব।

কৃষ্ণা বোধ হয় মনঃক্ষুণ্ণ হল। চিঠিটুকু মাথার নীচে রেখে ধীরে ধীরে পাশ ফিরে শুলো। কেমন মায়া হল ওর ম্লান মুখের দিকে চেয়ে, বললাম, কৈ, দে দেখি, কি চিঠি,

কৃষ্ণা মুখ না ঘুরিয়েই বললে, থাক অরূপদা, সারারাত জেগেছ; তুমি বরং খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে নাও।

বুঝলাম, মেয়ের অভিমান হয়েছে। বললাম, অমনি রাগ হল বুঝি? কি বোকা মেয়ে! তোর ভালোর জন্যই ও কথা বলেছিলাম।

কৃষ্ণা জবাব দিল না, ঠিক একভাবে মুখ ফিরিয়ে রইল।

একটা কাজ করা হয়নি এখনো; পরঞ্জয়কে খবর পাঠান হয়নি। হয়তো কতো কি ভাবছে সে। হ'লই বা এক দিনের পরিচয়, চিকিৎসকের দায়িত্ব তো আছে? স্থির করলাম, ও বেলা গিয়ে সংবাদটা দিয়ে আসব; এই রোদে, এখন কিছুতেই বেরোন হবে না।

* * * *

কখন, কি অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। জেগে দেখি, কৃষ্ণার মাথার কাছেই একটুখানি জায়গা করে নিয়ে দিব্যি শুয়ে আছি। ঝি একপাশে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে হাওয়া দিচ্ছে, আর কৃষ্ণা অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে কৃষ্ণার গায়ে হাত দিয়েই চমকে উঠলাম। উঃ! এ কি ভয়ঙ্কর উত্তাপ!

কৃষ্ণা আমার হাতখানা জোরে চেপে ধরে বললে,—অরূপদা, আর আমি সহ্য করতে পারছি না! মাথার শিরাগুলো আমার ছিঁড়ে গেল! ও-ও-ওঃ! বাবা গো·········!

ত্রস্ত কণ্ঠে ডাকলাম, কৃষ্ণা, কৃষ্ণা!—একটু সহ্য কর বোন, আমি এক্ষুনি ডাক্তার নিয়ে আসছি। কিন্তু আমার কথার কোন জবাব পেলাম না। শুধু দুঃসহ ব্যথায় থেকে থেকে কঁকিয়ে উঠছে সে।

সর্ব্বনাশ! সুস্থ মানুষ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়েছিলাম, আর এরই মধ্যে এমন অবস্থা? ঝি-য়ের দিকে চেয়ে মেজাজটা কঠিন হয়ে উঠল। বাহাদুরী করে আবার মাথায় হাওয়া দেওয়া হচ্ছে! বললাম, আমায় কেন ডাকলে না, যখন দেখলে মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে?

সারারাত ঘুমোন নি, তাই—কথাটা শেষ করতে দিলাম না, বললাম, বুঝেছি, এবার যাও তো, দু'বালতি জল নিয়ে এস, মাথা ধোয়াতে হবে।

দশ পনের মিনিটের মধ্যে ঝি-য়ের সাহায্যে মাথা ধোয়ান শেষ করে ফেললাম। তারপর কৃষ্ণার মাথায় আস্তে আস্তে হাওয়া করতে করতে বললাম, বাইরের ঘরটায় একটা আলো জ্বালিয়ে রাখ ঝি।

ঝি তৎক্ষণাৎ উঠে গেল, এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসে বলল, আলো জ্বালিয়ে রেখে এলাম ছোটবাবু।

বললাম, তুমি দু'পাঁচ মিনিট বস তো ঝি। আমি দেখছি, কাউকে দিয়ে যদি ডাক্তারকে ডাকিয়ে আনা যায়,—

ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে এসে বসে পড়লাম; হঠাৎ—"নমস্কার। কেমন আছেন উনি, অরূপবাবু? আপনার দিক থেকে কোন সংবাদ না পেয়ে, নিজেই একবার দেখতে এলাম।" দেখলাম, পরঞ্জয় আর সঙ্গে সেই তরুণী মেয়েটি।

বললাম, কাল থেকে আজ অনেক বেশী খারাপ মনে হয় ভাই! দেখবে এসো। মেয়েটিকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি এলেন যে? এতটা পথ হেঁটে যেতে কত কষ্ট হবে জানেন?

মেয়েটি স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠে বলল, জানি, একটুও কষ্ট হবে না! তাছাড়া, এ পথে আসা যাওয়া আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু চলুন, আগে আপনার বোনটির কাছে যাই। আসুন, পরঞ্জয় বাবু।

ভয়ানক আশ্চর্য্য হলাম। কাল সন্ধ্যাবেলা আতিথ্যের ওজুহাতেও যে একটা কথাও বলে নি, আজ স্বেচ্ছায় সে আমারই বাড়ীতে এসেছে। শুধু তাই নয়, অত্যন্ত সহজে এতগুলো কথাও বলে গেল।

তাড়াতাড়ি দু'জনকে নিয়ে রোগীর কক্ষে এসে দাঁড়ালাম। পরীক্ষা শেষ করে পরঞ্জয় যখন উঠে দাঁড়াল, তখন মুখ তার অস্বাভাবিক গম্ভীর। কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে চুপ করে রইলাম।

পরঞ্জয় বললে, কখন থেকে এ রকম অবস্থা হয়েছে? দেখলাম, ওষুধের শিশিগুলো সে বিশেষ লক্ষ্য করে দেখছে।

বললাম, ওদিকে কোন ত্রুটি হয়নি, ভাই। সমস্ত রাত আমি নিজে বসে থেকে ওষুধ খাইয়েছি। নিজের শরীরটাও বড় ভালো ছিল না। আর ভোরের দিকেই কৃষ্ণার জ্বর কমের দিকে আসে। ভেবেছিলাম, বিকালে তোমাকে সংবাদটা দিয়ে আসব। যেতামও ঠিক, কিন্তু হঠাৎ কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম, উঠেই দেখি এই অবস্থা!

পরঞ্জয় অতি নিম্নস্বরে মেয়েটিকে কি জিজ্ঞাসা করলে, সেই জানে। দেখলাম, একটা ব্যাগ খুলে রোগীর পরিচর্য্যার কতগুলি অত্যাবশ্যক সাজ-সরঞ্জাম গুছিয়ে নিল সে। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললে, ঝিকে বলুন, একটা বাটি আর খানিকটা পরিষ্কার জল দিয়ে যাক।

পরঞ্জয় বলল, আমি আর দেরী করব না অরূপবাবু। ইঙ্গিতে নবাগতা তরুণীকে দেখিয়ে বললে, ইনি এখানেই থাকবেন, যতদিন না উনি ভালো হোয়ে ওঠেন। আমি এক্ষুনি ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি, নমস্কার।

এতই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম যে, প্রতিনমস্কার করে সহজ ভদ্রতাটুকুও যে রক্ষা করা হয় নি, একথা মনে হল পরঞ্জয় চলে যাওয়ার অনেকক্ষণ পরে। তখনও কিন্তু আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটে নি। বস্তুতঃ পক্ষে এতে আশ্চর্য্য হয় না কে? যাদের কখনো চোখে দেখি নি, কোথাও কোনদিন কোন সূত্রে যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় নি, তারা যদি বিপদের দিনে সুযোগ বুঝে কিছু অর্থাগমের সুবিধা করে নেয়, তার অর্থ বুঝি। নেহাৎ দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ তাও যদি না করে, যদি চোখ বুঁজে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়, সেও বোঝা কঠিন নয়। কিন্তু হঠাৎ যদি তারা নিঃস্বার্থ মঙ্গল কামনার তাড়নায় বাড়ী বয়ে স্বেচ্ছায় বিপদের মধ্যে নেমে দাঁড়ায়, তার অর্থ বোধগম্য হতে সত্যই সময় লাগে।

একজন ওষুধ দিয়ে দাম নিলেন না, বললেন, হুকুম নেই: আর একজন বিনা ভূমিকায় এসে নিঃসঙ্কোচে আমার রোগ শয্যায় শায়িতা ভগ্নীর সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন; আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখলেন না। অথচ কোন কথা জিজ্ঞাসা করব সে সাহসও নেই। হয়ত গম্ভীর হয়ে বলে বসবেন, আপনার এ প্রশ্নের উত্তর দেবার হুকুম নেই। চমৎকার! কোন কিছুরই হুকুম নেই, হুকুম আছে শুধু আমার মত অসহায় নিরীহ প্রাণীর মুখ বন্ধ করে দেবার?

দেখুন—

তটস্থ হয়ে তরুণীর দিকে তাকালাম।

একবার এদিকে আসুন।

এই রে! এ যে রীতিমত হুকুমই সুরু হল!

অত্যন্ত অসহায়ের মত মুখ করে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। —এই বাটিতে ঠাণ্ডা জল আছে। মাঝে মাঝে চোখ আর কপাল মুছে দেবেন। দেখবেন, যেন থেকে না যায় একটুও; আমি খানিকটা জল গরম করে নিচ্ছি।

—না, না, আপনাকে ওসব করতে হবে না। আমি ঝিকে ডেকে দিচ্ছি।

মেয়েটি একমুহূর্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, কিছু দরকার নেই তার। মিথ্যে চেঁচামেচি করে জাগাবেন না ওকে।

যাক্। এদিকটাও পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম, উপস্থিত ক্ষেত্রে ওর হুকুম তামিল করা ছাড়া আমার আর কোন কাজ রইল না।

চুপ করে বসে আছি কৃষ্ণার বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে। মাঝে মাঝে ব্যথায় কুঞ্চিত হয়ে উঠছে ওর মুখখানা। উদ্বেগের গুরুভার আমার ঠিক হৃদপিণ্ডের ওপর চেপে রয়েছে যেন। সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছি কোথায়। মনে মনে বললাম ভগবান, এমন কি পাপ করেছি, যার অপরাধে এই বিদেশ বিভূঁয়ে এতবড় শাস্তিও তুমি আমায় দিলে? আর যদি করেই থাকি এমন পাপ, তুমি অন্য কোন দণ্ড দাও প্রভু; আমি হাসি মুখে তা মাথায় তুলে নেব। শুধু এইটুকু ক'র যেন বিশ্ব সংসারে আমার একমাত্র স্নেহের বস্তু এই ছোট বোনটিকে, তুমি

আমারই চোখের সম্মুখে সরিয়ে নিও না।—এমনি কতো কি ভেবে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কখন যে তরুণী মেয়েটি নিজের কাজ শেষ করে ফিরে এসেছে, কখন যে নিজেরই অজ্ঞাতসারে আমার চোখ দুটো অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে, আমি জানতেও পারি নি ; হঠাৎ মেয়েটির কথায় চমক ভাঙ্গল।

—বিকালে নিশ্চয়ই চা খাওয়া হয় নি ?

একটু বিব্রত হয়ে বললাম, না, কেন বলুন তো ?

কতকটা সঙ্কুচিত ভাবে তাকলাম তার দিকে। কি জানি, হয়ত বলে বসবে হুকুম নেই ঐ কেনর উত্তর দেবার। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না। মেয়েটি সহজ গলায় বললে, আপনার ঠিক পেছনেই তৈরী করে রেখেছি। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।—

উঠে এসে এক কাপ গরম চা আমার কাছে এগিয়ে দিল সে।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বললাম, কৈ, আপনি নিলেন না ?

—এত রাত্রে আমি চা খাই নে, আপনি খেয়ে নিন : এতক্ষণে বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।—

পাছে সে আবার নতুন করে এত রাত্রে চায়ের হাঙ্গামা করে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাতের পেয়ালায় ঘন ঘন চুমুক দিয়ে বললাম, না, না, বেশ গরম রয়েছে এখনও ; আপনাকে ভাবতে হবে না।

মেয়েটি চোখ নিচু করে বসে রইল একমুহূর্ত্ত। তারপর ধীরে ধীরে বলল,—আপনি আমার দাদার বন্ধুস্থানীয়, 'তুমি' বলেই বলবেন আমাকে, আমি ইন্দ্রাণী।

ইন্দ্রাণী! একটি মাত্র কথা, কিন্তু ঐ একটি কথাই যথেষ্ট। কাল সন্ধ্যা থেকে সুরু করে এই একটু আগেও যে রহস্যের সমাধান খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ঐ একটি কথাতেই মুহূর্ত্ত মধ্যে তা জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল।

এই সেই ইন্দ্রাণী! সেই আমার পরম শ্রদ্ধেয়, পরম আপনার, অদ্ভুত ক্ষমতাশালী চিত্রশিল্পী উদয়ভানুর কনিষ্ঠা ভগ্নী!

এক নিমেষে আমার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় কি এক অনাস্বাদিত সুখ-স্পর্শে পরিতৃপ্ত হয়ে গেল।

কেমন করে জানি না, নিঃশংসয়ে বিশ্বাস হল, এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্ত্তে এমন একজনকেও কাছে পেয়েছি যার কাছে প্রয়োজন হলেই অসঙ্কোচে হাত পাতা চলে। যার স্নেহের দরবারে আপন অক্ষমতাকে নানা রংয়ে, নানান ছাঁদে রেখে ঢেকে পেশ করবার আবশ্যক হয় না; যে তার সমস্ত দরদ, সমস্ত শক্তি দিয়ে দুর্দ্দিনের ভয়াল ভ্রূকুটির সম্মুখে আমাকে আড়াল করে দাঁড়াবে। অথচ কতটুকুই বা পরিচয়।

ভয় নেই, এ আমার কবিত্বের উচ্ছ্বাস বা অন্য কিছু নয়; সস্তা ভাবাবেগকেও আমি শ্রদ্ধা করিনে। তবু যে ইন্দ্রাণীকে কেন্দ্র করে এত কথা বললাম, সে শুধু সত্যোপলব্ধির জোরে।

ইন্দ্রাণী চোখ নত করেই বললে, দাদার মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি।

বললাম, তাঁর সঙ্গে আমার তো শুধু একদিনের পরিচয়, ইন্দ্রাণী।

—কি জানি, তেমনি চোখ না তুলেই ইন্দ্রাণী বলে গেল, কৃষ্ণাদির কথাও বলছিল একদিন। আপনাকে তো তবু একদিন চোখে দেখেছে,—

কৃষ্ণা এই সময়ে একবার চোখ খুলে তাকাল। আমি ব্যগ্র কণ্ঠে ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম, কৃষ্ণা, কি কষ্ট হচ্ছে দিদি, বল।

—কোন কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে সে বুঝিয়ে দিল তার কোন কষ্ট হচ্ছে না। মনে হল, দুঃসহ যন্ত্রণা তার অনুভূতির সীমা অতিক্রম করেছে; মনটা হু হু করে কেঁদে উঠল।

মুখখানি সাবধানে তুলে ধরে বললাম, একটু জল দেব দিদি? —কোন সাড়া এলো না ওর কাছ থেকে। বুঝি তীব্র ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে ওর সমগ্র চেতনা।

ইন্দ্রাণী বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। মুখ তুলতেই তার চোখে চোখ পড়ল।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরই দৃষ্টি নামিয়ে আনল সে একেবারে কৃষ্ণার মুখের ওপর, মৌন হয়ে রইল কিছুকাল। মনে হল কিছু বলতে চায় আমাকে।

বললাম, কিছু বলবে ইন্দ্রাণী ?

—হ্যাঁ, কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে কাটল,—এ অসুখে টেম্পারেচার একট বেশীই হয় ; আপনি ভয় পাবেন না। ভয় পাবার মত সত্যি কিছু হয়নি এখনও।

—অসুখটা কি ? পরঞ্জয় বলেছে তোমাকে ?

—বোধ হয় ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া,—তেমনি চক্ষু নত করেই উত্তর দিল ইন্দ্রাণী। কণ্ঠস্বরে অনিচ্ছাকৃত অপ্রিয়ভাষণের ঈষৎ সঙ্কোচ।—তবে নাও হতে পারে ওরকম কিছু, ঠিক বলা যায় না এখনো।—

মনে মনে বললাম, তোমার কথাই যেন সত্য হয় ইন্দ্রাণী। কিন্তু স্নেহের পাশে পাশেই জেগে থাকে যে ভয়, যে শঙ্কা, তাকে তো যুক্তির বাধা দিয়ে আটকান যায় না।

সেই থেকে বসে আছি দু'জনে, চুপচাপ, অনেকক্ষণ। ঝি বসে আছে ঘরের সুমুখেই-খোলা বারান্দায়, বসে বসে ঢুলছে। কৃষ্ণার শ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। দূরের পথ দিয়ে কে গান গেয়ে যায়। সুর তার কেঁপে কেঁপে এসে থেমে যায় গৃহের অনতিদূরে : ঠিক বুঝতে পারিনে কথাগুলো। আরো অনেক দূর থেকে ভেসে আসে বেহাগ রাগিণীর করুণ মূর্চ্ছনা ; বুঝি কোন্ দুরন্ত পাহাড়ী ছেলে বাঁশীর সুরে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রির

ঐশ্বর্য্য চুরি করে নিতে চায়। একেবারে খাড়া পাহাড়গুলোর মাথার ওপর দিয়ে উত্তরে ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসে স্বন্ স্বন্ করে; এসে ধাক্কা খায় বিষম জোরে পাষাণ প্রাচীরের গায়ে; সমস্ত বাড়ীটা নিঃশব্দ, নিঝুম। রাত্রি গভীর হয়েছে।

ইন্দ্রাণী এক হাতে নিজের চোখ দুটি আড়াল করে রেখেছিল, প্রদীপের আলো এসে পড়ছিল চোখে। আর এক হাতে কৃষ্ণার চোখ মুখ মুছে নিচ্ছিল মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা জল দিয়ে।

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে ধীরে ধীরে ডাকলাম,—ইন্দ্রাণী—

আজ্ঞে, মুহূর্ত্তের জন্য একবার মুখ তুলল সে।

—তোমাকে যদি দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবে? কি জানি সে কি ভাবল ক্ষণকাল। একটু বিস্মিত হল বোধহয়। তারপর আমার দিকে চেয়ে হাসিমুখে সংযত কণ্ঠে বলল, কি করে বলি? আগে তো শুনি আপনার কথা।

বললাম, আমি জানি, উদয়বাবু শুধু তোমার দাদাই নন; সে দিন সন্ধ্যায়, তোমাদের বাড়ীতে, তাঁর মুখে অনেক কথা শুনেছিলাম। কিন্তু···বলতে গিয়ে চুপ করে গেলাম।

ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসু চোখে চাইল, বোধ হয় ভাবল, দ্বিধাই যদি থাকে তো নাই বা জিজ্ঞাসা করলেন।

বললাম, প্রবীর কি চলে গেছে?

—না।

—তুমি···তোমার এখানকার কাজ শেষ হল বোধহয় ?

—আর একটু খুলে বলতে হবে, ইন্দ্রাণী মৃদু হাসল।

—তুটি মেয়েব সম্বন্ধে রিপোর্ট নেবার কথা ছিল তোমার,—বলেই কিন্তু মনে হল এতটা অগ্রসর হওয়া উচিত হয় নি। ইন্দ্রাণী চুপ করে রইল কয়েক মুহূর্ত্ত: তারপর আমার দিকে না চেয়েই বললে, এ সব জেনে আপনার কি লাভ হবে জানি নে: তবু বলি, আমার কাজ অনেকদিন শেষ হয়েছে। আর এখানে আসা, সে অন্য কারণে। তাও আজ চলে যেতাম, যদি কৃষ্ণাদি অসুস্থ হয়ে না পড়তেন।

—কিন্তু আজ এখানে এলে কেন ইন্দ্রাণী ? একি সুধুই আকস্মিক ? কিম্বা—

—আপনি আর কিছু জিজ্ঞাসা করুন।

হঠাৎ একটা ধাক্কা খেলাম যেন। কেমন লজ্জা করতে লাগল। ছিঃ, ছিঃ! এ অনধিকার চর্চ্চার তো কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না! ইন্দ্রাণী বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেছিল। তাই ঠিক পরমুহূর্ত্তেই একটু হেসে বললে, আপনি রাগ করলেন ত ? কিন্তু সত্যি বলছি, উপায় থাকলে সব কথারই উত্তর দিতাম। শত ইচ্ছে হলেও যা নিয়মের বাইরে তা আমাদের এড়িয়ে চলতে হয়।

শুধু তার সম্মান রক্ষার জন্যই বলতে হল, না, না, আমি একটুও রাগ করি নি, বরং এখন মনে হচ্ছে আমিই অন্যায় করেছি।

ইন্দ্রাণী জোরে হেসে উঠল,—মনের কথা যাই হোক্‌, চোখ কিন্তু অন্য কথা বলছে।

এবারে আমিও হেসে ফেললাম, নইলে অপবাদটা স্বীকার করে নেওয়া হয়; বললাম, ওটা তোমার ভুল দেখা।

পরে গম্ভীর হয়ে বললাম, দুটো কথা আমার ভারী জানতে ইচ্ছে হয়, অবশ্য তোমাদের নিয়মের বাইরে না হলে।

ইন্দ্রাণীকে যতটুকু দেখেছি, তাতে সে যে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী একথা জানতে বাকী নেই। সুতরাং ঐ নিয়মের খোঁচাটুকু সে যে ইচ্ছে হলেই ফিরিয়ে দিতে পারত, তাও বুঝলাম।

বেশ তো, বলুন,—ধীরে ধীরে বললে ইন্দ্রাণী; কথায় তার অসাধারণ সংযম।

বললাম, আমার সম্বন্ধে কি কথা শুনেছ উদয়বাবুর মুখে,—এই 'এক', আর 'দুই' হল,—আমার কথা উদয়বাবু জানলেন কি করে।

ইন্দ্রাণী হঠাৎ উঠে গিয়ে একটা ওষুধ নিয়ে এলো, তারপর আমার দিকে না চেয়েই বললে, আলোটা উঁচু করে ধরুন, ওষুধটা খাইয়ে দিই।

ওষুধ খাওয়ানো শেষ করে নিজের যায়গায় ফিরে এসে ইন্দ্রাণী বললে, আপনার কথার উত্তর দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু তার আগে আপনি খেয়ে আসুন, রাত একটা বেজেছে।

বললাম, তোমারও তো খাওয়া হয়নি। ছিঃ, ছিঃ! আমি একেবারে ভুলে গেছি!—ইন্দ্রাণীর চক্ষু দুটি মুহূর্তের জন্য স্বচ্ছ

হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একবার মনে হল এখানে খাওয়াটা আবার নিয়মের বাইরে না হলেই বাঁচি। ওদের অজ্ঞাত নিয়ম আর দুর্ব্বোধ্য হুকুমকে আমি সত্যই ভয় করতে আরম্ভ করেছি। তথাপি উঠে পড়লাম। সত্যই এটা লজ্জার কথা। আমার খাবার ইচ্ছে নেই বলে অতিথির কথাও ভুলে থাকা ঠিক হয়নি।

রাত্রি শেষ হতে বড় বেশী বাকি নেই। কৃষ্ণার জ্বর নামতে শুরু করেছে। এখন বোধ হয় একশ' এক কি তারও কম। এতক্ষণে বোধহয় ও একটু ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঘরের সবগুলি জানালাই উন্মুক্ত ছিল। শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস শির্ শির্ করে গায়ে এসে লাগছে। একটু তন্দ্রা এসেছিল আমার।

শুনলাম ইন্দ্রাণী বলছে, গায়ে দেবার আর কিছু নেই বুঝি? কোন গরম কাপড়?

—সচকিত হয়ে উঠলাম; বললাম, না, গরম কাপড় ত কিছু সঙ্গে আসেনি! কি করে বুঝব বল, ও আমাকে এমন বিপদে ফেলবে? দিব্যি সুস্থ সবল মেয়ে, কেবল আমার অবাধ্য হয়েইত এই কাণ্ড!

ইন্দ্রাণী আর কোন কথা না বলে নিজের শালখানা গা থেকে খুলে নিয়ে সাবধানে কৃষ্ণার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে

বললে, ভোরের দিকের ঠাণ্ডা বাতাস ওর গায়ে লাগলে ক্ষতি হতে পারে—

নিরাবরণ ইন্দ্রাণীর দিকে একমুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে বললাম,—কিন্তু তোমারও ত···?

—আমার জন্য ভাববেন না।

—তার চেয়ে বরং···দাঁড়াও···বলেই আমি উঠে গিয়ে উত্তরের জানালা দু'টো বন্ধ করে দিলাম।

ইন্দ্রাণী হেসে বলল, কিন্তু ঠাণ্ডার সঙ্গে যে আরো একটা বস্তুর আসার পথ বন্ধ করলেন।

হঠাৎ তার কথার অর্থ বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করলাম, কি বল ত?

—অক্সিজেন; ও দুটো খুলে দিন আপনি, আর ঠাণ্ডা লাগবার ভয় নেই। দেখলাম, প্রচ্ছন্ন হাসিতে চোখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়বার তার নিজের নিরাবরণতার কথা উচ্চারণ করতে কেমন সঙ্কোচ হল।

জানালা দু'টো আবার খুলে দিয়ে এসে বললাম, ইন্দ্রাণী, এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

ইন্দ্রাণী কিছুকাল চুপ করে রইল; পরে মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলল, শুনেছি, আপনি কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক, কৃষ্ণাদি আপনার নিজের বোন নন,—আপনি—

—ভুল শুনেছ ইন্দ্রাণী, কৃষ্ণা আমার নিজের বোন নয় একথা মিথ্যে।

ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে বোধকরি বুঝতে চেষ্টা করল আমি সত্যই রহস্য করছি কিনা। পরে ধীরে ধীরে বলল, ভুল শুনেছি ?

—হ্যাঁ। তোমার শোনা উচিত ছিল, ও আমার সহোদরা নয়। ইন্দ্রাণী, এক মায়ের পেটে জন্মান একটা আকস্মিক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্ততঃ আমি তা' মনে করিনে—

—আমি কিন্তু ওসব কিছু মনে করে বলিনি।

—তা জানি, বলেই চেয়ে দেখলাম ইন্দ্রাণী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আছে। হয়ত ভাবছে, আমি ক্ষুণ্ণ হয়েছি ওর কথায়।

বললাম, তুমি হয়ত আমার কথা বিশ্বাস করবে। অথচ আশ্চর্য্য দেখ ইন্দ্রাণী, সামাজিক কোন পাশ পোর্ট্ হাতে না থাকলেই লোকে হাসে, কিছুমাত্র বিচার না করেই সন্দেহ করে বসে, গায়ে পড়া আত্মীয়তার মূলে নিশ্চয় কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে। এই যে তুমি আজ বিপদের দিনে না ডাকতেই সাহায্য করতে এগিয়ে এলে, কৈ, পারিবারিক সম্বন্ধের কোন রক্ষা-কবচ ত দরকার হয়নি তোমার ?

—আমারও ত দুরভিসন্ধি থাকতে পারে, অল্প একটু হেসে ইন্দ্রাণী বললে।

—বললাম, অসম্ভব !

—অসম্ভব কেন ? আমাদের কিছুই তো জানেন না আপনি।

—না জানলেও আমি বিশ্বাস করিনে। কেন, তা শুনতে চেয়ো না। কিছু সময় চুপ করে থেকে বললাম, উদয়বাবুর কাছে আর কি শুনেছ বললে না ?

—ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে বললে, কাল সারারাত ঘুমোন নি, আজও সকাল হতে বড় বেশী বাকী নেই। তা ছাড়া দু'জনেই একসঙ্গে রাত জাগলে,—

বুঝলাম, ইন্দ্রাণী এ আলোচনা বন্ধ করে দিতে চায়।

বললাম, বেশ তো, তুমি এখানেই একটু ঘুমিয়ে নাও না, দরকার হলে আমি ডেকে দেব তোমাকে।

—আপনি কিছুই বোঝেন না দেখছি ! হঠাৎ ইন্দ্রাণী হেসে ফেলল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, যান তো, আপনি শুয়ে পড়ুন গিয়ে। দরকার হয় আমিই আপনাকে জাগিয়ে দেব।

ঘুমে সত্যই চোখের পাতা জুড়ে আসছিল। ধীরে ধীরে উঠে পড়লাম, বললাম, তাই দিও।

একটা কথার কিন্তু কিছুতেই সমাধান হল না। আমার কিছুই-না-বোঝার মত নির্ব্বুদ্ধিতা কোন ফাঁকে কখন প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

* * * *

ঘুম ভাঙ্গতে প্রথমেই চোখে পড়ল ইন্দ্রাণী কৃষ্ণার কাছে নেই, তার যায়গায় ঝি বসে আছে অত্যন্ত জড়সড় হয়ে, ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে কৃষ্ণার পায়ে। বেলা দশটার কাছাকাছি।

পিপাসায় সমস্ত শরীরটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভাবছি, ঝিকে ডেকে জল চেয়ে নেব। কিন্তু তার দরকার হল না। দেখি, ইন্দ্রাণী একখানি ছোট প্লেটে গোটা দুই সন্দেশ আর অন্য হাতে একগ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকছে। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম, এ তোমার অত্যন্ত অন্যায় ইন্দ্রাণী! কেন, ঝি তো রয়েছে!

ইন্দ্রাণী যেন ভারী অপ্রস্তুত হয়েছে, এমনি করে বললে, ভাবলাম, দু'দিন ঘুমোন নি, তাই জাগাতে ইচ্ছে হল না। তা ছাড়া কৃষ্ণাদিও কতকটা ভালোই আছেন।

বললাম, না, না,—সে কথা নয়,বলছিলাম, তুমি কেন এ সব নিয়ে এলে ?

ইন্দ্রাণী একটুও না হেসে একেবারে লক্ষ্মী মেয়েটির মত বললে, কি আর করি বলুন, যখন এসেই পড়েছি। ঝিয়ের মুখে শুনলাম, কৃষ্ণাদি নিজের হাতেই নাকি এসব কাজ করেন।

উত্তরে কোন কথা খুঁজে পেলাম না। নিঃশব্দে এক নিঃশ্বাসে জলটুকু পান করে বললাম, আর একটু অপেক্ষা কর ইন্দ্রাণী, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওঘরে যাচ্ছি।—

মিনিট পাঁচেক পরে স্নান সেরে যখন কৃষ্ণার কাছে এসে দাঁড়ালাম তখন ইন্দ্রাণী একখানা কাগজে একমনে কি লিখে যাচ্ছিল; আমার আসার কথা জানতেই পারেনি। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর; খস্ খস্ করে ইংরেজিতে লিখে যাচ্ছে।

ইচ্ছা না থাকলেও অবাধ্য চোখের দৃষ্টি লেখাগুলোর ওপর দিয়ে একবার ঘুরে এল। দেখলাম বিশদ-ভাবে রোগের বিভিন্ন সময়ের অবস্থা সে একমনে লিখে চলেছে।

কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় সে স্নান করেছিল: সারা পিঠের ওপরে কোঁকড়ান ভিজা চুলের রাশি ভেঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। ওকে যেন আজ আবার নূতন করে দেখছি, এমনি চেয়ে রইলাম ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত। ওর চিক্কণ শ্যাম দেহবর্ণ, প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত ওর প্রতিটি কথা, ওর প্রতি নিমেষের সহজ অথচ সংযত চলার ছন্দের মতই বড় স্নিগ্ধ মনে হল। চোখের মধ্য দিয়ে কোনদিন কাউকেই আমার এত ভালো লাগেনি। অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে ডাকলাম, ইন্দ্রাণী,—

কোন উত্তর পেলাম না। বোধ হয় আমার ডাক তার কানে পৌঁছায় নি। এবার তার সম্মুখে এসে বললাম, তুমি জিরোওগে, ইন্দ্রাণী; আমি বসছি এখানে।

ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি হাতের কাগজখানি ভাঁজ করে রেখে দিয়ে বললে, হ্যাঁ, আধ ঘণ্টার জন্য অন্ততঃ বসতে হবে আপনাকে। ঐ ওষুধটা আর মিনিট দশেক পরে খাইয়ে দেবেন, আর তার সাত আট মিনিট পর এই গ্লুকোস ওয়াটার। দেখবেন, ভুলবেন না যেন। অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথা কটি বলে, সে অন্য কক্ষে চলে গেল।

সবে মাত্র কৃষ্ণার মাথার কাছে বসেছি, হঠাৎ ইন্দ্রাণী ফিরে এল। বললে, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। মুখখানা খুব হাসি হাসি।

—বল ?

—আপনার একখানা চিঠি এসেছে, ঐ যে ওখানটায় রেখেছি,—হাত দিয়ে ওষুধের শিশিগুলোর পেছনটা দেখিয়ে দিল সে।

ইন্দ্রাণী চলে যেতেই চিঠি পড়া শুরু হল। বস্তুতঃ এই একটা ব্যাপারে আমি কিছুতেই দেরী করতে পারিনে। কেন যেন মনে হয়, বহু দূরের পথ থেকে বন্ধু এসেছে, বিলম্বে দুঃখ পেয়ে ফিরে যাবে। চিঠি খুলে কিন্তু ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। নিচে নাম স্বাক্ষর করা রয়েছে 'উদয়ভানু'। নিজের চোখ দুটোকে যেন বিশ্বাস হল না।

ছোট চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়লাম,—

"অরূপ, আমাকে নিশ্চয়ই এরি মধ্যে ভুলে যাও নি। সে দিন তোমার কথার জবাব দিতে গিয়ে নিজের কথাই শুধু বলেছি। বেশ মনে পড়ে তোমার মুখের চেহারা বড় নিরাশ হয়ে পড়েছিল। আমার কয়েকটি বন্ধুর মুখে শুনে বুঝেছি তুমি সে দিন তোমার মনের ইচ্ছাই ব্যক্ত করেছিলে। আরো দু'একটা কথা শুনেছি যাতে তোমাকে বোঝা যায়। তাই তোমার অনুসন্ধান করেছিলাম। এতদিনে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছ। রেপ্রিজেন্টেটিভ ছবি আঁকবার মাল মসল্লা

কি হলে পাওয়া যায় সেই নিয়েই হবে তোমার সঙ্গে পরামর্শ। আর একটা কথা। ইন্দ্রাণীকে মনে পড়ে, সেই যে আমার দুর্ম্মুখ বোনটা, যে তোমার সুমুখেই বলে ফেলেছিল ঘরে কিছু নেই,—বা এমনি একটা কিছু? নিশ্চয়ই ভোলনি তার কথা? তাকে কেউ ভুলতে পারে না। এবার এলে তার সাথে আলাপ ক'র, দেখবে কি অদ্ভুত মেয়ে। ও আমার একটা নূতনতর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। এখন আমার সব কথা বুঝবে না। দু'এক দিন এখানে এলেই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে"। দেখলাম কলকাতার বাড়ীর ঠিকানা কেটে চিঠি পাঠান হয়েছে।

চিঠি পড়ে চুপ করে বসে রইলাম। এত লোক থাকতে হঠাৎ আমাকেই যে সে কেন বেছে নিলে এইটেই আশ্চর্য্য। আরো আশ্চর্য্য হলাম, ইন্দ্রাণীর কথা এমন করে আমাকে বলবার তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে। কিন্তু ইন্দ্রাণী কি পড়েছে এ চিঠি? নিশ্চয়ই তাই! নইলে অমন মুখ টিপে হাসল কেন?—একটু জল, কৃষ্ণা চোখ বুঁজেই অস্ফুট কণ্ঠে বলল। তাড়াতাড়ি তার মুখে জল ঢেলে দিয়ে বললাম, কেমন আছিস, দিদি?

কৃষ্ণা মাথা নেড়ে কি বলল বোঝা গেল না।

—ওকে জোর করে কথা বলাবেন না,—একেবারে প্রবীন চিকিৎসকের নিষ্কম্প গাম্ভীর্য্য ইন্দ্রাণীর কথার সুরে। ও কখন এসে দাঁড়িয়েছিল আমি দেখতে পাইনি।

বললাম, নাঃ, জোর করে কেন? ও নিজেই জল চাইছিল যে।

ইন্দ্রাণী এসে কৃষ্ণার কাছে বসে বললে, পরঞ্জয় বাবু বাইরের ঘরে বসে আছেন।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।

কৃষ্ণাকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ইন্দ্রাণীকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে বাইরের ঘরে এসে পরঞ্জয় বললে, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই, ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। কয়েকটা দিন একটু সাবধানে ওয়াচ্ করবেন। ভয় নেই, সেরে উঠবেন শীগগিরই।

—সত্যি বলছ, কিছু ভয় নেই?

—সত্যিই। কিন্তু আপনি নার্ভাস হলে চলবে না। নমস্কার করে সে উঠে দাঁড়াল,—আচ্ছা, চললাম।

পরঞ্জয় চলে যায় দেখে আমি ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকলাম, পরঞ্জয়,—

কিছু দূর এগিয়ে গিয়েছিল সে; ফিরে এসে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। বললাম, তোমার কি না গেলেই নয়?

পরঞ্জয় এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললে, তার দরকার নেই অরূপবাবু। ইন্দ্রাণী রইলেন; ওঁকে একটু সাহায্য করবেন। আমি ঠিক সময়ে আসব।

আর কোন কথা খুঁজে পেলাম না। রোগীর ঘরে এসে দেখলাম, ইন্দ্রাণী যন্ত্রের ন্যায় ঘুরে ঘুরে একা হাতে নিখুঁত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমার দিকে একবারও চাইল না। পরঞ্জয়ের কথাটা মনে পড়ল, ওঁকে একটু সাহায্য করবেন। ঠিক! এমন নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা অন্যায়! ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর ছোট আলমারীটাব কাছে এগিয়ে গিয়ে রীতিমত কাজ সুরু করলাম।

মাঝে মাঝে আড়চোখে ইন্দ্রাণীর দিকে চাইছিলাম, পাছে সে কোন বাধা দিয়ে বসে। হঠাৎ টুক্ করে মেজার গ্লাশ হাত থেকে নিচে পড়ে গেল। সর্ব্বনাশ! এবার আর রক্ষা নাই!

দেখি, ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি কৈফিয়ৎ দেবার আগেই সে বললে, ভেঙ্গে ফেললেন তো?

ভয়ে ভয়ে বললাম, ঐ গ্লুকোসটা . . .

—কি হবে গ্লুকোস্ দিয়ে?

বললাম, ওকে খাওয়াবে না?

হুঁ! কিন্তু আপনাকে এ সব কে করতে বললে?

পরঞ্জয়ের কথাটা যদিও মনে ছিল, তবু সে কথা বললাম না। বললাম, সবই ত একা হাতে করছ! ভাবলাম তবু যদি তোমার এতে একটু সাহায্য হয়,—

ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে বললে, কিন্তু দেখলেন ত, এ আপনার কাজ নয় ?

কি করে যে হঠাৎ,—আচ্ছা ওর মাথাটা ধুইয়ে দেব ?

পায়ে পড়ি, আপনি দয়া করে চুপ করে বসে থাকুন ; বলেই ইন্দ্রাণী গম্ভীর মুখে নিজের কাজে চলে গেল।

একটু রাগ হল ওর হুকুম চালাবার ঘটা দেখে। কিন্তু উপায় কি ? পরঞ্জয়ের বিশ্বাস, এক্ষেত্রে ইন্দ্রাণীই যোগ্যতর।

ইন্দ্রাণী কিন্তু কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ করলে না। যেন আপন কর্ত্তব্যের বাইরে আর কিছু দেখবার মুহূর্ত্তও অবসর নেই ওর।

এর পরে সুরু হল যমে মানুষে লড়াই! কোথায় রইল ওর আহার আর বিশ্রাম! দুর্ব্বার সৈনিকের মত অমিত বিক্রমে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখবার সে কি অক্লান্ত কঠোর সংগ্রাম!

কর্ত্তব্যের নির্ভীক রূপ ইতিপূর্ব্বে কোনদিন চোখে দেখিনি, দেখলাম পরঞ্জয় আর ইন্দ্রাণীকে। কত সহজে, কত বড় বিপদের মুখে এরা রুখে দাঁড়াতে পারে ভাবতে গিয়ে সত্যই বিস্ময় লাগল।

কেন জানি না মনে হল উদয়ভানুর সঙ্গে কোথায় যেন এদের একটা আশ্চর্য্য মিল রয়েছে ; অথচ কোন কিছুই স্থির হয়ে ভাবতে পারলাম না। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় আমার সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

এরপর সাত আট দিন কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গিয়েছিল আজ তার সকল ইতিহাস স্মরণ হয় না। শুধু এইটুকু মনে আছে, যাদের নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত সেবায় কৃষ্ণাকে ফিরে পেয়েছিলাম, সে ঐ দু'টি মাত্র লোক,—নির্ব্বিকার নির্ভীক যুবক পরঞ্জয়, আর পরম স্নেহময়ী এই ইন্দ্রাণী।

(৬)

কৃষ্ণাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছি প্রায় একমাস। ইন্দ্রাণীরা চলে এসেছিল তারও কিছুদিন আগে। দীর্ঘ এগার দিন রোগ ভোগের পর ভাল হয়ে উঠে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রাণী হেসে জবাব দিয়েছিল, পথের মধ্য থেকে জোর করে ধরে এনেছিলেন তোমার দাদা। মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণাদি--

কৃষ্ণাও পিছুবার মেয়ে নয়। হেসে বলেছিল,—ভালই হল; আমার বোন ছিল না, তোমাকে পেলাম আমার ছোট বোন।

পরে অবশ্য আমার কাছে কৃষ্ণা সব কথাই শুনেছে। যদিও দুটো জিনিষ ইচ্ছে করেই তার কাছে গোপন রেখেছি। উদয়ভানুর সঙ্গে আমি দুশ্ছেদ্য কর্ম্মসূত্রে জড়িয়ে পড়েছি, তার

দুর্ব্বার আকর্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারি নি; আর একটা কথা সবটুকু বলা হয় নি,—সে ইন্দ্রাণীর কথা।

রবিবার সকাল বেলা। একটু আগেই চা-য়ের অধ্যায় শেষ করে মহাকবি শেক্স্পীয়ারকে নিয়ে বসেছি; কৃষ্ণা এসে হাসিমুখে ঘরে ঢুকল; বলল, এমন কেন হয় বলতে পার অরূপদা?

কৃষ্ণার স্বভাবই এই, কোন কথা ও পুরোপুরি বলতে চায় না সহজে।

বললাম,—কথাটাই আগে বল?

কৃষ্ণা হেসে বললে, বলতেই তো এলাম, কিন্তু তুমি অবসর দিচ্ছ কৈ? শোন, মানুষ যা এড়িয়ে যেতে চায়, অদৃষ্ট তাকে সেখানেই ঠেলে দেয় কেন? এরও কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে নাকি?

বললাম,আছেই তো। কিন্তু তোর সাথে এর সম্বন্ধ কি আগে শুনি?

—না, তুমি বল—কৃষ্ণা আব্দার করে বললে।

—রক্ষে কর কৃষ্ণা, আমি নিরুপায়ের মত বললাম, এখন তোকে ও প্রশ্নের বিশদ ব্যাখ্যা শোনাতে গেলে আমার সব কাজ পণ্ড হবে। তার চেয়ে, তোর ব্যাপারটা খোলাখুলি বলে ফেল, দেখি যদি কোন উপায় করতে পারি।

—তুমি এমন করে বল যে কারও আর বলবার উৎসাহ থাকে না, কৃষ্ণা একটু সময় চুপ করে রইল। তারপর

নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল,—ইন্দ্রাণীকে একবার আসতে ব'ল অরূপদা ; সারা দুপুর বেলাটা একা একা যেন কাটতে চায় না।

তা না হয় বললাম, কিন্তু যা বলতে এসেছিলি তার কি হ'ল ?

—থাক, তার আর দরকার নেই। ধীরে ধীরে কৃষ্ণা চলে যাচ্ছিল। ডেকে বললাম, শোন, আমি জানি তুই কি বলতে চেয়েছিলি।

–কি বল তো ? কৃষ্ণা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, ঐ ইন্দ্রাণীদের কথা। ভাবছিস, অরূপদাকে নিষেধ করেছিলাম, এখন নিজেই তাদের ডেকে আনতে বলছি। বেশ লোক ওরা দু'টি ভাই বোন। ভাবছিস, বোনটির সঙ্গে যদিও বা ভাগ্যক্রমে পরিচয় হ'ল ভাইটিকে তো আর চোখেই দেখলাম না।

কৃষ্ণা রাগ করেও হেসে ফেললে, বললে, কখন না। এ তোমার বানানো কথা। ইন্দ্রাণীকে সত্যি আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু তাই বলে আর কারও কথা ভাবতে যাব কেন ?

মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করলাম, বললাম, ভাবলেও কিছু দোষ নেই দিদি, আমি এই কথাই বলছিলাম। তুই জানিস না বোন, সে কত বড়। তাই তো আমি ছুটে ছুটে যাই : ওর বন্ধুত্ব অনাদরে অবহেলায় ফিরিয়ে দিতে পারি নে।

কৃষ্ণা মুখ ভার করে বললে, তাই আজকাল ফিরতে এত রাত হয় তোমার? কিন্তু এই আমি তোমাকে বলে রাখলাম অরূপদা, নিজের দুঃখ নিজেই তুমি টেনে আনছ। সেদিন মনে ক'র তোমার নির্ব্বোধ বোন কৃষ্ণা সত্য কথাই বলেছিল।

হঠাৎ যেন মনটা দমে গেল। উদয়ভানু আজ আর আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। জানি, তার নির্দ্দিষ্ট পথে যাদের চলতে হয় তাদের জন্য সংসারের সুখ শান্তি নয়। তারা মরুপথের যাত্রী। শ্যামল ধরণীর স্নিগ্ধচ্ছায়ায় হয়তো তারা পৌঁছবে একদিন; কিন্তু সে বহু দুঃখ, বহু লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে। কৃষ্ণা কি সেই কথাই বলতে চায়, ইঙ্গিতে বার বার ক'রে?

বললাম, হয়তো তোর কথাই ঠিক, কিন্তু দুঃখের চেহারা তো সকলের কাছে এক নয় দিদি! তুই উদয়ভানুর সম্বন্ধে কার কাছে কতটুকু শুনেছিস জানিনে; কিন্তু জীবনের মহত্তর লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে যে ফুলের ওপর পা ফেলে এগোন যায় না, এওত মিথ্যে নয়। তাই যদি তেমন দিন আসেই, আমি দুঃখ করব না, তুই দেখে নিস।

—তোমার কথা ভাল বুঝতে পারি নে অরূপদা। কিন্তু আজ দুএকটা কথা তাঁর সম্বন্ধে তোমাকে জানাতে চাই; রাগ করবে না বল?

হেসে বললাম, তোর ওপর কোনদিন কি রাগ করেছি বোন?

—তা হ'লে পড়ে দেখ এই চিঠি, বলেই আমার হাতে একখানা দীর্ঘ পাঁচ পৃষ্ঠার চিঠি দিয়ে কৃষ্ণা অধোমুখে চলে গেল। একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ নিয়ে পত্রখানি পড়লাম।

শ্যামসুন্দর বাবুর জুট মিলে ভিতরে ভিতরে যে কিছুকাল থেকেই গণ্ডগোল সুরু হয়েছিল জানতাম; আর এও জানতাম যে উদয়ভানু সরাসরি এ ব্যাপারে জড়িত না থাকলেও তার হাত ছিল এতে অনেকখানি।

প্রথম যখন এ ঘটনা জানতে পাই আমি সোজা গিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে,—আপনি তা হ'লে কমিউনিষ্ট উদয়বাবু?

সেদিন এর উত্তরে পেয়েছিলাম হাসি মুখের অল্প কয়েকটি কথা, যা আমার চিরদিন মনে থাকবে। বলেছিল, নান্ অব্ দেম্। আমার বিশেষ কোন একটা প্লাট্ফরম নেই। শুধুমাত্র মানুষের অধিকার বোধকে সচেতন করে তুলতে পারে যে বস্তু, সবার আগে দরকার তারই সন্ধানে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করা। সে বড় সোজা কাজ নয় অরূপ। আর একা আমার পক্ষেও তা সম্ভব নয়। তাই তো ভাই ডাক দিয়েছি তোমাকে। নিশ্চয় জানতাম মানুষের জন্য যে কল্যাণ-কামনা, যে নিঃস্বার্থ দরদ অহঃরহঃ তোমার বুকে অনুরনন তুলছে, সে তোমাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেবে না।

বিস্ময় সেদিন একটু লেগেছিল বৈ কি! কেমন করে যেন মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, সব কথা আমাকে খুলে বল ভাই।

সেই দিনই প্রথম আমি তাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলাম। তাকে কোনদিন বেশী কথা বলতে শুনি নি। সে দিনও সে কয়েকটি কথাতেই জবাব শেষ করেছিল; বলেছিল, উচ্চতর জীবন যাত্রার ধারণাই ওদের নেই। এত নীচে, এমনই অসম্মানের চাপে তলিয়ে গেছে ওরা যে বড় কিছু আশা করতেও ভুলে গেছে। সেই গভীর পঙ্ক শয্যা ছেড়ে ওরা শুধু সেই দিনই উঠে আসবে; যেদিন ভালবেসে আমরা ওদের দুঃখ সমান ভাবে ভাগ করে নিয়ে বলতে পারব, এস তোমরা, তোমরা না খেলে রাজ-ঐশ্বর্যেও আমাদের ক্ষুধা মিটবে না।

তোমার কথা বুঝতে হলে ওদের রীতিমত শিক্ষিত হয়ে ওঠা চাই।

উদয়ভানু অত্যন্ত সহজ স্বরে বললে, এবার তুমি বুঝেছ। হ্যাঁ, শিক্ষা ওদের কতকটা চাই। তবে যে শিক্ষার মহিমায় আজ ওরা অশিক্ষিত, অপাংক্তেয় হয়ে আছে তেমন শিক্ষা নয়। শিক্ষা চলবে ওদের এমন পথে যাতে ওদের সত্যকার মানুষটির ঘুম ভেঙ্গে যায়, যাতে ওরা ন্যায়ের দাবী মৃত্যুপণ ক'রেও আদায় করে নিতে পারে।

সে শিক্ষা কেমনতর তা চোখে দেখছি। তাতে বৈদগ্ধ্যের ঘনঘটা নেই, বড় বড় কথার আঁতসবাজি সেখানে জ্বলে উঠতে দেখি নি কোনদিন; পাঁচ মিশালো পণ্ডিতিয়ানার চাপে মেরুদণ্ড সেখানে নুয়ে পড়ার অবকাশ পায় না।

দেশবিদেশের সমশ্রেণীর মানুষের প্রতিদিনের জীবন যাত্রার ছবি তাঁদের সম্মুখে তুলে ধরা হয় কাজের ফাঁকে ফাঁকে, হাসি গল্পের মধ্য দিয়ে। তাদের এতে বিস্ময় লাগে। তারা জানতে চায় কেমন করে এ সম্ভব হল। তারাও তো ছিল নিঃস্ব, ছিল পথের ধূলায় ?

যুগযুগান্তের ঘুমন্ত অনুসন্ধিৎসা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আর, উদয়ভানুর হাতে গড়া মুষ্টিমেয় মানুষ এক একটি করে বুঝিয়ে দেয়, কেমন করে শুধুমাত্র সঙ্ঘ-শক্তির হাতিয়ার নিয়ে সমাজের সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে তারা এগিয়ে এসেছে চিরকালের ধূলিশয়ন ছেড়ে।

আমি জানতে চেয়েছিলাম, আচ্ছা ভাই, এ পর্যান্ত না হয় বুঝলাম। কিন্তু এরপর ? এখানেই তো শেষ নয় তোমার ?

উত্তর হল, পরের ভাবনা ওরাই ভাবুক। নিজেদের প্রয়োজনে যে পথ ওরা বেছে নেবে, সেই-ই হবে ওদের পরম কল্যাণের পথ। তবে আমার প্রয়োজন ? না,তারও এখানেই শেষ নয়। দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত মানুষ বিপুল বলে এগিয়ে যাবে সম্মুখপানে, প্রকৃতির অফুরন্ত অজ্ঞাত সম্পদের লোভে করবে নির্ভীক অভিযান। সে-দিনের সেই অভিযাত্রিদের কোন একটিদেশের বলে চিনে নিতে পারবে না কেউ। সেখানে জাতি ধর্ম্মের বৈষম্য বিলুপ্ত, স্থূল ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাত নিঃশেষিত, ভৌগোলিক বিভেদ মানুষের সহজ আত্মীয়তায় বাধা দেবে না সেখানে। সারা দেশের, সারা বিশ্বের লোক

হাতে হাত মিলিয়ে দাঁড়াবে সেই অভিযানকে সার্থক করে তুলতে। সে-দিনের সেই লক্ষ কোটী আত্মধ্বংসী সংস্কারের মোহমুক্ত মানবের সম্মিলিত শক্তি আর বিশ্ব-প্রকৃতির নির্ম্মম মূক অস্বীকারের প্রচণ্ডতম সংঘাতের পটভূমিতে মানুষের ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হবে।

শুনে সেদিন স্তব্ধ হয়েছিলাম। কী বিশাল পরিকল্পনা; আত্ম-শক্তিতে কী অসংশয়িত বিশ্বাস।

সেই উদয়ভানুর সম্বন্ধে কি কথা লিখেছে ইভা?

পড়ে চলেছি······ -এর একটি কথাও মিথ্যে নয় কৃষ্ণা। আমি ওঁকে অনেক দিন থেকে দেখছি। জানি ওঁর প্রচণ্ড শক্তির বেগ; সমস্ত দেহে মনে অনুভব করেছি ওঁর দুর্নিবার আকর্ষণ! ওঁর প্রলয়ঙ্কর চিন্তার সাথে সমান তালে ছুটে চলবার শক্তি কিম্বা ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। দরিদ্রের দুঃখে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলে এক শ্রেণীর লোক বাহবা দেবে জানি, হয়ত বা ফুলের মালাও ভাগ্যে জুটে যেতে পারে, কিন্তু আমি তাদের দলের নই। অদৃষ্ট যাদের ঐশ্বর্য্য থেকে বঞ্চিত করে পৃথিবীতে পাঠাল, তাদের জন্য আফ্‌শোষ করতে হয় কর, তা' বলে তাদের জন্য অথৈ জলে নিমজ্জিত হওয়ার মধ্যেও আমি সার্থকতা খুঁজে পাই নে। স্পষ্ট করে নয়, কারণ তাঁর সামনে মাথা তুলে জোর করে কোন কথা বলবার সাহস হয় নি আমার; -তবু আভাসে একথা তাঁকে জানিয়েছি আমি। ফলে, এমন করে তাকিয়ে ছিলেন আমার

দিকে যে আমি ভয় পেয়েছিলাম। মুখে তিনি বেশী কথা বলেন নি, শুধু শুনতে পেলাম, তুমি এতো ছোট আমি ভাবতে পারিনি ইভা! এমন অপমান—তিনি ছাড়া আর কেউ আমাকে কোনদিন করেনি। তবু তাঁর কথা ভুলতে পারি নে। কিন্তু সেই যে তিনি অসীম ঔদাসীন্যে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন, আজো তাঁর ক্ষমা পাই নি। পাবার আশাও রাখিনে, আকাঙ্খাও বুঝি নেই। যাকে ভালোবেসে সুখী করতে চাও সব কিছু দিয়ে, সে যদি রাগ করে চলে যায় হয়তো সমাধান তার খুঁজে পাবে একদিন, কিন্তু তারই হাত দিয়ে আসে যদি নীরব উপেক্ষা, সইতে পার তা?

উদয়ভানুর প্রতিভাদীপ্ত চোখ দুটো যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তার সাথে পরিচয়ের সান্নিধ্যের মধ্যে একদিন ইভার সৌভাগ্যের বিপুল সম্ভাবনা দেখেছিলাম, আজ আবার মনে হল, ইভার ন্যায় অমন করে তাকে হারাবার দুর্ভাগ্যও যেন কোনদিন কোন মেয়ের জীবনে না আসে। মনে মনে বললাম, -ইভা, তোমার সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সম্পদের অহংকার বিসর্জ্জন দিয়েও যদি তার কাছে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতে, জীবন তোমার ধন্য হয়ে যেত। অর্থের উগ্র নেশায় তুমি অন্ধ হয়েছ, নইলে তাকে তুমি এমন করে বিদ্রূপ করতে পারতে না যে সর্ব্বস্ব ত্যাগের হোমশিখায় আত্মশুদ্ধি করে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে।

কৃষ্ণার অন্ধকার মুখের ওপর যেন এক ঝলক আলোক-সম্পাত হল, কিন্তু ভালো করে কিছুই দেখতে পেলাম না। কেন এত ভয়? বার বার কেন আমাকে সাবধান করে দেওয়া?

ইভা লিখেছে,—তোর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেদিন, আমার জন্মদিনের উৎসব রাত্রিতে। তোর বিদ্যুৎশিখার মত রূপ তাঁর অন্যমনস্ক চোখের দৃষ্টিও এড়ায় নি। যা জানি সবই বলেছি। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বললাম, কৃষ্ণা সত্যি খুব ভালো মেয়ে। উত্তরে বললেন, বিশ্বাস করবার জোর পাই নে। রত্ন-সম্ভারে সাজানো প্রতিমায় প্রাণের প্রতিষ্ঠা নেই। পাথরের দুঃসহ চাপে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণ-প্রবাহ ব্যাহত হয়ে পড়ে, তার জ্বলন্ত প্রমাণ তুমি।

আজ মনে হয় তাঁর সঙ্গে পরিচয় না হলেই ছিল ভালো। তিনি শিল্পী, তিনি বিপ্লবী, তিনি সাধারণের অনেক উর্দ্ধে; কিন্তু বড় নিষ্ঠুর! তাই তাঁর চিন্তায় আমার স্বীকৃতি নেই, নেই এতটুকু ছায়াপাত। তিনি ভোগ-বুদ্ধিহীন বিষম খেয়ালী, সংসারে তাঁর বন্ধন নেই; ঐশ্বর্য্যের স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বাঁধা যায় না তাঁকে। আমার জন্ম-জন্মান্তরের অভিশাপ মহাসূর্য্যের মত জ্বলে উঠে আমাকে দগ্ধ করেছে কৃষ্ণা—

ইভার অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পাচ্ছি যেন! এতক্ষণে বুঝলাম, কোথা হতে কেমন করে কৃষ্ণার মুখে কালো মেঘের সঞ্চার হয়েছে; কিসের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তার

স্নেহ-প্রবণ নিষ্কলুষ মন। আর কেনই বা সে এড়িয়ে যেতে চায় এই বিশালায়তন চুম্বকের অব্যর্থ আকর্ষণ!

চিঠি শেষ হয়ে এসেছে, আর সামান্য ক'টি কথা,...এর শেষ নির্ম্মম পরিণতির জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। এদিকে কারখানার গোলমাল সমানে চলেছে। আমি জানি এ তাঁরই সৃষ্টি। বাবা টের পান নি আজো; যেদিন পাবেন, আগুন জ্বলে উঠবে সেই দিনই! সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁকে চূর্ণ করতে এগিয়ে যাবেন তিনি। শত্রুকে ক্ষমা করা তার স্বভাব নয়। সেই দিনের অপেক্ষায় আছি। সকল চেষ্টা আমার ব্যর্থ হয়েছে; কিন্তু আর আমার বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই কৃষ্ণা। জানি, নির্ব্বোধের আত্মাহুতি চিরদিন ব্যর্থতার ইতিহাসেই ভরা।

চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। ইভার শেষের কথা-গুলো আমার শিরায় শিরায় যেন হিমপ্রবাহ বইয়ে দিয়েছে। হায়! দুর্ভাগিনী অহঙ্কারী মেয়ে!

ডুবে যাওয়ার ভয়ে নদীর উপকূলে এসে আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে! জানলে না, ও শুধু বারি নয়, দুষ্কৃতির কালো বিষে নিস্তেজ নিঃশেষিতপ্রায় মনুষ্যত্বকে নূতন করে উজ্জীবিত করবার জন্য, ও মর্ত্ত্যে দেবলোকের সুধা। কিন্তু কী দুঃসাহস তোমার ইভা? নির্ব্বোধ ব'লে উপহাস করবার আগে বুক কেঁপে উঠল না তোমার? লেখনী চূর্ণ হয়ে গেল না ঐ কথাগুলো লিখতে গিয়ে?

চিঠি দেখলে অরূপদা ?—নিঃশব্দে কৃষ্ণা এসে দাঁড়াল।

হ্যাঁ। কিন্তু তোর ভয় পাবার তো কিছু দেখলাম না ? বরং আমন্ত্রণ করে আনা উচিত তোমাদের ঐ দস্যুকে, কেমন এই কথাইতো বলবে ?—

কৃষ্ণার মুখে এমন কথা শুধু অতীব বিস্ময়কর নয়, একেবারে অবিশ্বাস্য। আমি নির্ব্বাক হয়ে গেলাম। এই আমার বোন, যাকে নিয়ে অহঙ্কারের শেষ নেই আমার ?

যেন কিসের আবেগ কৃষ্ণাকে উদ্দাম বেগে সম্মুখের দিকে ক্রমাগত ঠেলে দিচ্ছে। বললে, তুমি ভাবছ চিরদিনের শান্ত মেয়ে কৃষ্ণা, আজ এমন মুখর হ'ল কেন ? ভাবছ, তোমার পরম বন্ধুর বিষম অপমান করেছি আমি। না অরূপদা, বিশ্বাস কর তুমি, তাঁকে আমি তোমারই মত শ্রদ্ধা করি। তাই বলে ভয় আমার কোনদিন ঘুচবে না।

বললাম, কেন দিদি ?

সে তুমি বুঝবে না অরূপদা। অবিচলিত ধৈর্য্য তার স্বরে। বলতে যাচ্ছিলাম, বোঝালেও বুঝব না এমন তোর কি কথা কৃষ্ণা ? কিন্তু তা আর বলা হল না।

ছোটবাবু,—চেয়ে দেখি বাড়ীর দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা সশরীরে ঘরে এসে উপস্থিত।

বললাম, কি সংবাদ গজানন ?

গজানন বাড়ীর পুরনো ভৃত্য, কৃষ্ণাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, বললে, একখানা চিঠি,—

হাতে নিয়ে দেখি, চিঠি নয়, উদয়ভানু এসেছে, আমার সঙ্গে কি বিশেষ দরকার। বললাম, কোথায় রেখে এলে তাকে ?

গজানন নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করবার সুযোগ হাত-ছাড়া করে না কখনো। বললে, তাকে দেখেই বুঝলাম ছোটবাবু, সে আমাদের কেউ নয়। তাই গাড়ীবারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে আপনার কাছে চিঠি লিখিয়ে আনলাম।

বেশ করেছ; ভয়ানক বুদ্ধিমান তুমি। এবার ছুটে গিয়ে তাকে এই ঘরে নিয়ে এসো ত। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে বললাম, উদয়ভানু।

হঠাৎ যেন কৃষ্ণা চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আমি যাই,—

শুনে যা কৃষ্ণা, কিছু খাবার পাঠিয়ে দিস্ এখানে।

কৃষ্ণা ম্লানমুখে হেসে বললে, তুমি ভারী দুষ্টু অরূপদা। জান, ঝি বাজারে গেছে। আসতে ত সেই বেলা ন'টা,—

বললাম, তাতে কি ? তুই নিজে আর এটুকু পারিস নে ? সে কি বাঘ না—

আঃ! থাম তুমি, উনি এসে পড়েছেন। কৃষ্ণা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

এই যে অরূপ! কদিন যাওনি যে ? অতি দীর্ঘকায় উদয়ভানু উদিত সূর্য্যের মত তার বিস্ময়কর দীপ্তি নিয়ে একেবারে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

তাড়াতাড়ি তাকে বসিয়ে কৃষ্ণাকে দেখিয়ে বললাম, এই আমার বোন কৃষ্ণা, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম সেদিন।

ওঃ, নমস্কার!

কৃষ্ণা একেবারে থতমত খেয়ে গেল। কোনমতে প্রতি-নমস্কার করে বললে, আমি তোমাদের খাবার নিয়ে আসি অরূপদা, বলেই ও ঘর থেকে একরকম ছুটেই বেরিয়ে গেল।

কৃষ্ণা চলে যেতেই উদয় বললে, শুনেছ বোধ হয়, শ্যাম-সুন্দর বাবুর মিলের শ্রমিকদের নিয়ে গণ্ডগোলটা আরো শক্ত করে পাকিয়ে উঠেছে?

বললাম, না! শুনি নি তো!

কেন? ইন্দ্রাণী আসে নি এখানে? খুব ভোরেই ত তোমাকে সংবাদ দেবার কথা ছিল তার?

বললাম, মাত্র সাতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। এর মধ্যে এমন কি ব্যাপার ঘটেছে যাতে ইন্দ্রাণীকেই আমার কাছে পাঠিয়েছিলে?

উদয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, কি যে ঘটেছে বা ঘটবে তা' আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। তবে চার পাঁচদিন থেকে দেখছি ইন্‌টেলিজেন্‌স্ বিভাগের চেলা চামুণ্ডার দল আমাদের বাড়ীর আশে পাশে সকাল সন্ধ্যায় ঘোরাফেরা করছে।

পুলিশের হাঙ্গামাকে কোনদিনই সুনজরে দেখিনি। মনে আছে ছাত্রাবস্থায় সখের স্বদেশী করতে গিয়ে একবার এই টিকটিকিদের কবলে পড়েছিলাম। রাজনীতির 'রা'ও শেখা হয়নি তখনও। তবুও পূরো চব্বিশটি ঘণ্টা হাজতবাস করতে হয়েছিল। আজও রাজনীতিবিশারদ হওয়া তো দূরের কথা, তার গোড়ার ফরমুলাও শেখা হয়নি। তথাপি ওর গুরুত্ব সম্বন্ধেও অচেতন নই। শান্তির রাজ্যে বাস করে শাসন বা শোষণ নীতির কায়েমী বনেদকে বানচাল্ল করতে চাইলে ওপরওয়ালার প্রেম মেলে না, এ তো সহজ কথা। গোয়েন্দা মহাপ্রভুদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাই খুশি হতে পারলাম না। বললাম,—এ যে বিপদ হ'ল দেখছি!

উদয় কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল, বিপদ আর কি? তবে আক্রমণটা ওদের কোন্ দিক থেকে আসবে আগে থেকে বোঝা দরকার।

আমি চিন্তিত মুখে চুপ করে রইলাম। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কেটে গেল।

কি করবে বল তো? আমি প্রশ্ন করলাম।

যেন চিন্তার কোন্ গভীরতম প্রদেশ থেকে বাস্তবের দিবালোকে উঠে এল সে, এমনি ভাবে বললে, অরূপ, বসুধাকে তোমার মনে পড়ে? সেই যার স্বেচ্ছাচারিতা আর অসংযমের ফলে বিলাসপুরের কাজ গত চার মাস থেকে আমি বন্ধ করে রেখেছি?

হ্যাঁ, কেন বলত ?

জামালপুরে তার বাড়ী, সেখানেই সে লুকিয়েছিল এতদিন। কিন্তু ইন্দ্রাণী মাত্র সপ্তাহখানেক আগে কলেজ থেকে আসবার পথে ওকে শ্যামসুন্দর বাবুর অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। এখন মনে হচ্ছে ওকে নিঃশব্দে ক্ষমা করে ভাল করিনি। ও শুধু দুর্ব্বল নয়, ম্যালিশাস্।

নানা সন্দেহ আমার মনে ভীড় করে দাঁড়াল। কে বলতে পারে দল থেকে বিতাড়িত বসুধা আমাদের চলার পথকে পুলিশের কাছে সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত প্রতিষ্ঠান বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে নি ?

বললাম, বসুধার গতিবিধি জানতে পেরেছ কিছু ?

উদয় মৃদু হেসে বললে, পর্ব্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ ; সন্দেহের কারণ ত আছেই। শোন অরূপ, যখন শুরু হয়েছে, এখানেই এর শেষ হবে না। ঠিক রাজদ্রোহিতার অপরাধ আমাদের বিরুদ্ধে টিকবে না সত্য, কিন্তু ঝঞ্ঝাট তাতে এতটুকুও কমবে না ; তাই ইন্দ্রাণীর ব্যাপারটা ভেবে স্থির করতে পারিনি।

আমার কাছেও সঙ্কোচ করবে এ আমি ভাবতে পারিনি উদয়,—

উদয় হেসে ফেললে, সঙ্কোচ নয় ভাই ; আমি অন্য কথা ভাবছি। লক্ষণ দেখে মনে হয়, আমাদের সংগঠনের

প্রারম্ভেই এবার একটা কঠিন আঘাত পেতে হবে। অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করে দেখলে অপরাধ আমাদের প্রমাণ করা সহজ নয়। কিন্তু রেড্ ট্যাপিজম আমাদের এক কথায় রেহাই দেবে না। আমাদের বাড়ী খানাতল্লাসীর পরোয়ানা হয়ত দু'এক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবে। দু'চারজন গ্রেপ্তার হওয়াও কিছু আশ্চর্য্য নয়।

এমন অবস্থায় ইতিপূর্ব্বে কোনোদিন পড়িনি। এ আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। সুতরাং চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

হঠাৎ একটা কথা কানে যেতেই চমকে উঠলাম, ইন্দ্রাণীকে কিছুদিনের জন্য তোমাদের কাছে রাখতে চাই অরূপ। অনর্থক কয়েদ বাস করা,—

সে থেমে গেল। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে চেয়ে দেখলাম, কৃষ্ণা দু'প্লেট খাবার নিয়ে এই দিকেই আসছে। ঘরে ঢুকে একটা ছোট টিপয়ের ওপরে প্লেট দুটি রেখে কৃষ্ণা বললে, চা নিয়ে আসছি। উদয় তার কথাটা সম্পূর্ণ করল, শুধু শুধু কয়েদখানায় পচে মরবার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। যদিও নেতা হবার ঐটেই সবচেয়ে সহজ পথ, কাজ কিন্তু তাতে খুব বেশী এগোয় না। কাজেই,—এই পর্য্যন্ত বলেই সে হেসে ফেললে। আমিও তার ইঙ্গিতটুকু লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু তার মত হাসতে পারলাম না।

ক্ষণকাল পরেই কৃষ্ণা চা নিয়ে এল। কিন্তু খাবার এখনো তেমনি পড়ে রয়েছে দেখে বলল, কৈ তোমরা খেলে না অন্নদা ?

এই যে খাচ্ছি দিদি,—উদয়কে লক্ষ্য করে বললাম, নাও ভাই, খেতে খেতে গল্প কর।

কৃষ্ণা হঠাৎ আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল। তার অর্থ, এতখানি আপনার হয়ে উঠেছ, অথচ আমাকে তো একদিনও একথা বলনি !

অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে সে, তাতে আবার দুর্জ্জয় অভিমান। নীরবে বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তেই ডাকলাম, কৃষ্ণা, কাছে আয়, শোন।

কৃষ্ণা দূর থেকেই বললে, কি ? বল।

—ইন্দ্রাণীর কিছুদিনের জন্য আর কোথাও থাকা দরকার। তোর আপত্তি না থাকলে সে এখানেই তোর কাছে থাকতে পারে।

কৃষ্ণা চুপ করে মাথা নিচু করে রইল। তার উত্তরের প্রতীক্ষায় আমিও কোন কথা বললাম না। কিন্তু মনে মনে সত্যই বিরক্ত হয়ে উঠলাম। বেশী দিনের কথা নয়। ইন্দ্রাণীর প্রাণান্তকর সেবাই তাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে, আর তারই নিতান্ত প্রয়োজনে সামান্য একটু আশ্রয় দিতে তার এত দ্বিধা, এতই দুর্ভাবনা ?

উদয়ভানু চেয়ে আছে কৃষ্ণার দিকে। লজ্জায়, সঙ্কোচে, ক্ষোভে বারংবার নিজেকেই ধিক্কার দিলাম, কেন তুমি বড় মুখ করে ওরই সম্মুখে একথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলে?

কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, তোর তা হলে ইচ্ছে নেই বল?

কৃষ্ণা সহসা অসহায় আর্ত্তকণ্ঠে বললে, এমন করে আমাকে অপদস্থ করে তোমার কি লাভ অরূপদা? আমার নিজের ইচ্ছারও অনেক ওপরে এ সংসারে তোমার ইচ্ছা, এতো তোমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না? আমি তোমার ছোটবোন, ধরতে গেলে আশৈশব তোমার হাতেই মানুষ হয়েছি। আজ নতুন করে আমাকে জানতে চাও কেন? উদয়বাবু তোমার বন্ধু, কিন্তু ইন্দ্রাণী কি আমার বোন নয়? যদি কখনো অন্যায় করে থাকি তুমি যত খুশী শাস্তি দিও, কিন্তু লোকের সম্মুখে এমন অযথা অপমান কর না। কথা শেষ করে আর এক মুহূর্ত্তও সে অপেক্ষা করল না।

কি ব্যাপার অরূপ? হঠাৎ এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়লেন?

—চুপ্! চুপ্! শুনতে পেলে আমার অদৃষ্টে আরো কিছু জুটবে। তারপর ঈষৎ হেসে বললাম, কিছু মনে কর না উদয়। অবুঝ, আদুরে বোনটিকে নিয়ে

এমন মাঝে মাঝে আমাকে ভুগতে হয়। যাক্, তুমি তা হলে ইন্দ্রাণীকে এখানেই পাঠিয়ে দাও।

—ইন্দ্রাণী কৃষ্ণাদি নয়। দরকার হলে সে একাই আসতে পারে।—চেয়ে দেখি, ইন্দ্রাণীকে এ ঘরে পৌঁছে দিয়ে কৃষ্ণা আড়ালে সরে যাচ্ছে। কথায় কিছু মাত্র জড়তা নেই; ধীর পদক্ষেপ সংযমে সুন্দর, কিন্তু মুখে অপরিসীম ক্লান্তির ছায়া। ঈষৎ অবিন্যস্ত চুলের ছু'একটি গুচ্ছ কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের নিচে নেমে এসেছে।

—দাদা! তুমি এখানে? অথচ তোমাকেই আমি এতক্ষণ খুঁজে বেড়িয়েছি,—উদয়ভানুর কোল ঘেঁসে বসে পড়ল ইন্দ্রাণী।

—কি খবর রে ইন্দ্রাণী? উদয়ের সামান্য ক'টি কথা নিদারুণ উৎকণ্ঠায় ভরা। ইশারায় আমাকে দেখিয়ে বললে, খবর তেমন ভাল নয় দাদা, বলব?

বল না, অরূপকে আর ভয় করবার দরকার নেই।

ঠিক এই কথার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রাণী আমার দিকে চেয়ে এমন করে হাসল যে আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা বৈছ্যুতিক শিহরণ অনুভব করলাম। শুনলাম সে যথাসম্ভব মৃদুকণ্ঠে বলছে, তুমিতো খুব ভোরেই বেরিয়ে এলে? আমিও প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছিলাম তারই ঘণ্টাখানেক পরে। কিন্তু সব কাজ পণ্ড হ'ল। চেয়ে দেখি, প্রায় শ'খানেক সশস্ত্র পুলিশ আমাদের বাড়ী ঘিরে

ফেলেছে। আমাকে দেখে বললে, ক্ষমা করবেন, আপনাদের বাড়ী?

বললাম, হ্যাঁ, কি চাই বলুন?

—বাড়ীটা সার্চ্চ্ করতে হবে।

ওয়ারেণ্ট্ রয়েছে দেখে বাধা দিতে পারলাম না। রীতিমত—

হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে উদয়ভানু বললে, সর্ব্বনাশ! আমার বিছানার নিচেই একটা—

—ভয় নেই। ওদের অলক্ষ্যেই আমি তা সরিয়ে নিয়েছিলাম। এই নাও, বলেই ইন্দ্রাণী ক্ষুদ্র দু'খানি রোল্ করা কাগজ উদয়ভানুর হাতে গুঁজে দিল,—ভাগ্যে কাল এগুলো রাখতে দেখেছিলাম! তারপর যা' বলছিলাম শোন। রীতিমত সার্চ্চ্ করা হ'ল সারা বাড়ী। যখন কিছুই পেলে না তখন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দেখিয়ে পাঁচজনকে ধরে নিয়ে গেল। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল তারা।

ধরে নিয়ে গেল? আমি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম। উদয়ভানু সহজ শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কে কে ধরা পড়েছে?

লস্কর, গোসাঞি, দস্তিদার, গুপ্ত আর প্রবীরদা এই পাঁচজন। মনে করেছিলাম আমিও বাদ পড়ব না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য দাদা! তুমি বা আমি,—আমাদের কারও

বিরুদ্ধেই আজকের অন্ততঃ তাদের মুখে এতটুকুও অভিযোগ শুনতে পাইনি।

শোন্, তুই আজ থেকে এখানেই থাকবি, যতদিন না অবস্থা আমাদের আয়ত্বে আসে। আমার জন্য চিন্তা নেই। আমি তোর কাছাকাছিই কোথাও থাকবার যায়গা করে নেব। কিম্বা তেমন সুবিধে না হলে বাড়ীতেও থাকতে পারি। অরূপ রইল; যা' প্রয়োজন ওকে জানাতে দ্বিধা করিস নে। আর, বাইরে বেরনো তুই কটা দিন বন্ধ রাখ্। কিন্তু একটা বড় মুস্কিল হল, এই যা,—

কি, বল না দাদা? ইন্দ্রাণী যেন এতক্ষণে সামলে নিয়েছে নিজেকে, কথা ওর এমনই শান্ত। আমিও বলে ফেললাম, বল না উদয়, দেখি যদি আমি কোন উপায় করতে পারি।

উদয় ঈষৎ ম্লান স্বরে বললে, উপায় একটা যেমন করে হোক্ খুঁজে নিতেই হবে। তবে কথা হল লস্কর ছিল একটা বিষয়ে একেবারে সিদ্ধহস্ত। পরিচিত অপরিচিত যা'ই হোক না কেন, যার টাকা আছে তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে ওর সঙ্গে আর কারও তুলনাই হয় না। তুমিও এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝেছ অরূপ যে, আমাদের এ ব্যাপক পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হলে প্রচুর অর্থের দরকার। তারপর ওদের ফিরিয়ে আনা,—সেও তো সহজ ব্যাপার নয়? উকিল-ব্যারিষ্টারের জাত; তারা তো সোমনাথের মত

শূন্যোদর হয়েই বসে আছে। সারা ভারতবর্ষের মণি মুক্তো দিলেও ও-গহ্বর পূর্ণ হয় না।

তারপর হেসে বললে, বক্তৃতা আমার ভালো আসে না ভাই। তুমি প্রফেসার মানুষ, একটা যুঁতসই উপমা লাগিয়ে দাও তো! বলেই সকৌতুকে আমার পিঠে মৃদু করাঘাত করলে।

আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। বললাম, কি করে তোমার হাসি পায় বলতো?

ইন্দ্রাণী যেন কতকটা আপন মনেই চুপি চুপি বললে, যে সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ নেই, দাদার খেয়া তরী সেখানে ভাসতেই চায় না। ঝড়-ঝঞ্ঝা আর বজ্রের ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ সারা আকাশখানা ফাটিয়ে না দিলে প্রকৃতির দুর্যোগ যেন চোখেই পড়ে না ওর। এমনই দেখে এলাম চিরকাল!

উদয় তার কাঁধে হাত দিয়ে একটুখানি নাড়া দিয়ে বললে, কি সব বলছিস্ ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী সচকিত হ'ল, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা হয় দাদা। একা তুমি কোথায় যে কেমন করে থাকবে,— চক্ষু দু'টি সজল হয়ে উঠল ওর।

বললাম, উদয়, তুমি তা হলে সম্প্রতি বাড়ীতেই থাকবে?

হ্যাঁ। হঠাৎ বাসা পরিবর্ত্তন করে গা ঢাকা দিলে নিজেকেই দোষী প্রমাণ করা হয়। তাছাড়া তার প্রয়োজনও নেই।

ইন্দ্রাণীকে বললে, তুই এখন যা ইন্দ্রাণী, যা' দরকার ওবেলা এসে তোকে দিয়ে যাব।

ইন্দ্রাণী অন্য কক্ষে চলে যাবার পর উদয় বললে, শ্যামসুন্দর বাবুর মিলের গোলমালটা বড় অসময়ে সুরু হ'ল। শ্রমিকদের কল্যাণের জন্যই এটা বন্ধ থাকা উচিত ছিল আরো কিছুকাল। এই ধর্ম্মঘটের উদ্যোক্তা যারা তাদের চিনি। আমার কাছে তারা এসেছিল যখন, আমি মিলের কাজ বন্ধ করতে নিষেধ করেছিলাম।

প্রবীর, গোসাঞি এরা কিছুদিন থেকেই কাজ করছিল ওদের মধ্যে। ওদের মুখে খবর পেয়েই সন্দেহ হয়েছিল এমনই একটা কিছু ঘটবে।: কিন্তু আমি ভাবছি এ-দাবী ওদের কেমন করে আদায় হবে।

কেন? এমনি আরো কত ধর্ম্মঘট কত মিলেই তো হয়েছে?

কিন্তু কোথাও সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হয়েছে ওদের চেষ্টা? হয়নি। কেন জান? কারণ এ সংগ্রামের পিছনে রয়েছে একটা সাময়িক উত্তেজনা। অনিবার্য্য প্রয়োজনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত আপোষহীন দাবী এ নয়। পরিপূর্ণ আদর্শের জোর নেই এর পিছনে। আজ যারা ওদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে তারা সরে দাঁড়ালেই এ সংগ্রামের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়বে। তাই তো আমি চাই, সকলের আগে ওরা বুঝুক কতখানি ওদের অভাব; জানুক, কি ওদের নেই আর সেই না থাকার মূলে আছে কি নির্ব্বিকার স্বার্থপুষ্ট শ্রেণীগত শোষণ।

তোমার কথায় মনে হয় ওদের প্রয়োজন এখনও ওরা বুঝতে পারেনি,—

একেবারেই বোঝেনি তা নয়; তবে শ্রদ্ধা দিয়ে, সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সবটুকু বোঝেনি। ঠিক এই জন্যই বলছিলাম সময়ের আগেই ওরা দাবী জানিয়ে বসেছে। কেন, ওদের বলতে শোননি, ধর্ম্মঘট করে মালিককে জব্দ করতে ওরাও জানে, কিন্তু উপোস করে বড় বড় কথা হজম করতে ওরা নারাজ? দাও প্রচুর টাকা! চালাও ধর্ম্মঘট! কোথায় এদের গলদ, তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ অরূপ?

কিন্তু তবুতো একে এড়িয়ে যেতে পারবে না? আমি ধীরে ধীরে বললাম:

উদয় তখনি এ কথার কোন জবাব দিল না, ক্ষণকাল চিন্তা করে বলল, না, এখন আর দূরে সরে যাবার উপায় নেই। কিন্তু আর দেরী করলে চলবে না। তুমি আজই শ্যামসুন্দর বাবুর সাথে কথা বলে দেখ আমাদের সম্বন্ধে তার মনোভাব কি। তার ওপরেই নির্ভর করছে আমরা কোন পথে এগোব। আর এক কথা, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা উপস্থিত ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব গোপন রাখাই আমার ইচ্ছা।

উদয় চলে গেল। দেয়ালে টাঙ্গান বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখি বেলা প্রায় দশটা। বাইরে যাবার দরকার ছিল। তাছাড়া এত সব কথা শুনবার পর ঘরে মন টিকছিল না, উঠে পড়লাম।

তখনও রাস্তায় পা পড়েনি। ওপর থেকে কৃষ্ণার ডাক শুনতে পেলাম, অরূপদা, বাইরে যাচ্ছ?

পিছনে তাকিয়ে দেখলাম কৃষ্ণা ও ইন্দ্রাণী দোতলার ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, কিছু বলবি?

—বলতাম, কিন্তু থাক। আগে তুমি ঘুরে এসো।

কেন? বল না!

না, পরে বলব। তুমি বেশী দেরী ক'র না যেন অরূপদা।

না, বলেই একেবারে রাস্তায় এসে পড়লাম।

ধীরে ধীরে চলেছি। মন কিন্তু ছুটে চলেছে ঝড়ের বেগে। কখনো সম্মুখে কখনো পিছনে, কখনো বা বর্ত্ত-মানের দুস্তর মরুপথ পার হয়ে এগিয়ে চলেছে বিরামহীন গতিতে। এ চলার ছেদ নেই যেন কোথাও। জীবনের এতগুলি দিন যে কিসের জোরে কোন আকর্ষণে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করে এলাম ভাবতে গিয়ে বিস্ময় লাগল।

আদিঅন্তহীন মহাকালের ঢেউয়ের তালে তালে এ কোথায় ভেসে চলেছি? যতদূর দৃষ্টি যায় মানস চক্ষু বিস্ফারিত করে অতীতের পানে চেয়ে দেখলাম, বহুর চলার সাথে পা মিলিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে চলতে গিয়ে পথের ধূলায় এমন একটিও দাগ রেখে আসিনি, যাকে নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তে প্রয়োজন হলে একান্তই আমার বলে দাবী

করতে পারি। সংসারে বাবা ফেলে গেলেন একা নিতান্ত শিশুকালে ; বুদ্ধি যখন হ'ল, বুঝতে শিখলাম যে দিন, এক মা ছাড়া আর কাউকে চোখে পড়ল না। অনেক দুঃখ সয়ে অনেক চোখের জলে যখন সবে নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি, মাও চ'লে গেলেন স্বর্গে। তারপর কোথা দিয়ে কেমন করে এগিয়ে এল কৃষ্ণা ; তাকে নিয়ে আজ আর চিন্তার অবধি নেই। ওর আগামী দিনগুলোর দলিলখানা যদি পাকা হয়ে যেত, আমি সত্যিই ভার মুক্ত হ'তাম। কোথাও এতটুকু বন্ধন থাকত না। কে বলতে পারে, আরও কতদিনে নিষ্কৃতি পাব। সহসা চিন্তার স্রোত অবরুদ্ধ হ'ল। চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম নূতন পৃথিবীর নব রূপের সূচনা, —দেখলাম উদয়ভানু আর তারই পাশে আরেকখানি মুখ! মমতায় ঢলঢল, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল···অপরিমেয় অন্তরৈশ্বর্য্যে গরীয়ান। সমগ্র কামনা সংহত করে মনে মনে বললাম, ঈশ্বর, এত বড় একটা প্রাণের শিখা জ্বালালেই যদি, ব্যর্থতার ঝড় তুফান তুলে তাকে আর নিভিয়ে দিও না। ওরা দুটি ভাই বোন সুখে থাক্।

দুফোঁটা চোখের জল গাল বেয়ে নেমে এল, হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম।

হুজুর! আপনি এখানে?

চমকিত হ'য়ে চেয়ে দেখি, শ্যামসুন্দর বাবুর ড্রাইভার গাড়ী নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে পড়েছে, কিছুতেই ষ্টার্ট্ নিচ্ছে না। বললাম, এদিকেই এসেছিলাম। খবর সব ভাল তো শিউরতন ?

শিউরতন অনেক দিনের লোক। বয়স ষাটের কোঠা পার হ'য়ে গেছে। মাথার চুল একেবারে সাদা, গায়ে ফিন্ ফিনে পাতলা শার্ট্, হাতা গুটান। এত বয়সেও শরীরের বাঁধন একটুও শিথিল হয়নি। আশৈশব বাংলা মুলুকে থেকে পূরোদস্তুর বাঙ্গালী হ'য়ে পড়েছে। বললে, নাঃ, ভালো আর কৈ হুজুর। মিল তো বন্ধ হ'য়ে আছে প্রায় পনের দিন। সাহেব রেগে আগুন। সামনে এগোয় কার সাধ্যি ! এর আগেও দু'একবার গোলমাল হ'য়েছে, কিন্তু এমন মরিয়া হতে তাকে কোনদিন দেখিনি হুজুর। কালই সন্ধ্যাবেলা ম্যানেজার বাবুকে ডেকে হুকুম দিলেন, আর এক সপ্তাহের মধ্যে মিল চালু হওয়া চাই ; নইলে সমস্ত পুরনো লোক ছাড়িয়ে তিনি নূতন মজুর মিস্ত্রী এনে কাজ করাবেন। কেউ বাধা দিলে পুলিশের সাহায্য নিতেও পেছুবেন না।

এতক্ষণ পরে গাড়ীর ইঞ্জিন গর্জ্জন করে উঠল। শিউরতন একটা লম্বা কুর্নিশ জানিয়ে গাড়ী ছুটিয়ে দিয়ে বললে, হুজুর জানেন তো আজকাল আবার সেপাইগুলো কথায় কথায় গুলি চালিয়ে বসে।

উত্তরে কিছুই বলা হ'ল না। শিউরতনের গাড়ী চক্ষুর নিমিষে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

কেমন যেন সন্দেহ হ'ল। শিউরতন কি ইচ্ছে ক'রেই আমাকে কথাগুলো শুনিয়ে গেল? চিন্তিত মুখে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুতবেগে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। শ্যামসুন্দরের কঠিন মুখ বারংবার চোখের সম্মুখে দেখতে পেলাম, যেন লৌহদানবের রক্তচক্ষু নিষ্ঠুর প্রতিহিংসায় ধক্ ধক্ করে জ্বলছে!

(৭)

সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। নাতিবৃহৎ আলোকিত কক্ষের এক প্রান্তে আরাম কেদারায় বসে আছি। দামী আসবাবপত্র কিছু কিছু থাকা সত্ত্বেও চারিদিকে একটি পরিচ্ছন্ন ভাব।

প্রাচীরসংলগ্ন আলমারীতে অসংখ্য বই থরে থরে সাজান। ঘরখানি ইভার। এখানেই সে পড়াশুনো করে। শ্যামসুন্দর বাবু বাড়ী ফেরেন নি এখনো। সংবাদ নিয়ে শুনলাম, দুপুরে স্নানাহার সেরে তিনি রোজই বাইরে বেরিয়ে যান; ফিরে আসেন কোনোদিন রাত বারোটায়, কোনোদিন বা একেবারে রাত্রিশেষে। অথচ অপেক্ষা করা ছাড়া

উপায় নেই। তাঁর মুখ থেকে না শুনলে ব্যাপার যে কতোদূরে কোথায় গড়িয়েছে ঠিক বোঝা যাবে না। অন্দর থেকে এইমাত্র অভ্যর্থনা এসেছে, কষ্টার্জ্জিত দরবারী আভিজাত্যের অপরিহার্য্য আঙ্গিক একবাটি ধূমায়মান চা। অগত্যা তাতেই মনঃসংযোগ ক'রে নানা কথা ভাবছি।

ভাবছি নিজের কথা আর বহু মানুষের বহু বিচিত্র জীবনের কথা। সহস্র দিনের স্মৃতির চিহ্নগুলিকে যে পথে ফেলে এসেছি সে পথ বড় বন্ধুর···বড় দুর্গম। তার কোথাও আছে এতটুকু আলোর আভাস, কোথাও বা তাও নেই। কৃষ্ণার কথা ভাবতে গিয়ে মনে হ'ল, তার জীবন-বৃত্তের পরিধির মধ্যে উদয়ভানুর অনিবার্য্য পদক্ষেপ একটা আকস্মিক আবির্ভাব। ঠিক এইখানে এসেই তার চলার ছন্দ ব্যাহত হয়েছে ; এ যেন তার জীবনের অন্তলম্ব।

কতোক্ষণ যে এমনি এলোমেলো চিন্তায় কেটে যেত, আর কোথায় গিয়েই বা এর শেষ হ'ত জানি না। হঠাৎ কানে এল, নমস্কার ! অনেকক্ষণ আপনাকে একলা বসিয়ে রাখলাম, মাপ করবেন। ইভার মুখে এক প্রকার কুণ্ঠিত হাসি।

হেসে বললাম, আপনার লজ্জিত হবার কারণ নেই মিস্ চ্যাটার্জ্জি। জানি, নিশ্চয়ই কোনো জরুরী কাজে আটকে পড়েছিলেন।

হ্যাঁ, একটু ব্যস্ত ছিলাম সত্যি। তবে জরুরী কিছু নয়, নূতন পিয়ানোটা তেমন ভালো সুর দিচ্ছিল না। অথচ

কালকের মধ্যেই একটা রাশিয়ান্ টিউন্ আমাকে তুলতেই হবে; বাবার হুকুম।

রাশিয়ান্ টিউন্! কোথায় পেলেন?

কেন, আমাদের অরুণবাবু? উনি তো বহুদিন কন্টিনেণ্টে ছিলেন। ভারী মিষ্টি হাত। সোনার ফ্রেমে বাঁধান হাতঘড়ির দিকে চেয়ে এক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, আর মিনিট পাঁচেক। এখনি এসে পড়বেন।

আপনাদের সংবাদ নিতেই এসেছিলাম, এবার উঠি তা হ'লে। আচ্ছা, আপনার বাবা? তাঁকে দেখছিনে তো?

ইভা রীতিমত বিস্মিত হয়ে বললে, কেন, আপনি শোনেন নি? কৃষ্ণাও কিছু বলে নি?

আমি ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললাম, না! কেন, কি হয়েছে তাঁর?

ইভা যেন কতকটা তাচ্ছিল্যের সুরেই বললে, না, সে সব কিছু নয়। শারীরিক ভালোই আছেন। তবে মিল নিয়ে ভয়ানক গোলমাল চলছে। শ্রমিকরা অনেক দিন থেকেই সভা সমিতি করছিল। দিন পনের হ'ল মিলের কাজ বন্ধ ক'রেছে।

তারপর?

তার পরের কথা জানিনে অরূপবাবু। তবে বাবাকে তো জানি? শেষ পর্য্যন্ত দরকার হ'লে সরকারের সাহায্য নিতেও তিনি দ্বিধা করবেন না। কি যে হবে,—

বললাম, কি আর হবে বলুন? হয় কাজে যোগ দিতে বাধ্য হবে, নয় তো মরবে। অশিক্ষিত মজুর, ওদের না আছে বুদ্ধি না আছে অর্থ; ক'দিন হাত গুটিয়ে থাকবে?

ইভার মনের কথাটাই বোধকরি বলে ফেলেছি। দেখলাম তার মুখে খুশি যেন উপচে পড়ছে। বললে, আমিও ঠিক আপনার মত করেই চিন্তা করি, অরূপবাবু। দেখুন না, মজুর তার মত থাকবে না, সে দাবী করবে বাদশাহী মসনদ! আর আমাদেরও তাই ভয়ে ভয়ে মেনে নিতে হবে? তাছাড়া, শক্তিমান, প্রতিভাবান যাঁরা, তাঁরাই দিচ্ছেন ওদের প্রেরণা! ওরাত অৰ্দ্ধসভ্য একশ্রেণীর অদ্ভুত জীব। ওদের দোষ কি বলুন?

কথা শুনে রাগে সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। কিন্তু রাগ হলেই তো আর প্রকাশ করা যায় না! একথা ভুললে চলবে না, এই স্পৰ্দ্ধিতা তরুণী যার সমর্থনে উৎসাহিত হ'য়ে মানুষের ওপরে শুধুমাত্র দারিদ্র্যের অপরাধে এতখানি ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ উদ্গীরণ ক'রলে, সে শাশ্বতকালের ধনতন্ত্রের ট্রাষ্টি; সংসারজ্ঞানহীন এক স্বার্থবিমুখ পুরুষের অনুধ্যায়ী নয়। সুতরাং আবশ্যক হ'লে ওদের শুধু অসভ্য কেন, গরিলা বা শিম্পাঞ্জিও বলা যেতে পারে। বললাম, খুবই সত্য কথা।

নয় কি? আপনিই বলুন। নইলে দাবী করা তো দূরের কথা, কোনদিন চোখ তুলে চাইতেই কি সাহস পেয়েছে ওরা?

হ্যাট্‌স্ লাইক এ গুড্ গার্ল্ ! ঠিক বাবার মেয়ের মতোই কথা বলেছেন ! আমি তো একেবারেই ওদের ষ্ট্যাণ্ড করতে পারি না। দোজ্ ন্যাষ্টি ব্রুট্‌স্ !—দাঁতে পাইপ কামড়ে বিলিতী পোষাকের আড়ালে সযত্ন আত্ম-গোপনের চেষ্টায় কিঞ্চিত বিব্রত একটি নির্ভুল বাঙ্গালী যুবক ইভার সামনে এসে দাঁড়াল।

ইভাও তৎক্ষণাৎ সপ্রতিভ অভ্যর্থনা জানাল, বসুন অরুণ বাবু। একটু আগেই আপনার কথা হচ্ছিল।

বিলিতী ইঞ্জিনীয়ার সময়ের মূল্য জানে। ঘড়ির দিকে চেয়ে বললে, অসংখ্য ধন্যবাদ! কিন্তু আপনার সঙ্গে একটু একলা কথা বলতে চাই মিস্ চ্যাটার্জ্জি ;—তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললে, জাষ্ট্ এ ফিউ মিনিট্‌স্ !

আমি জবাব দেবার আগেই ইভা বললে, ইনি মিষ্টার অরূপ ব্যানার্জ্জী, আমার বন্ধু কৃষ্ণার দাদা। এ পরিবারের বহুকালের আত্মীয়। আপনার সঙ্কোচের কারণ নেই।

এটা ঠিক সঙ্কোচ নয় মিস্ চ্যাটার্জ্জী। তবে যে কথা শুধু আপনাকেই বলা যায় তা আর কারও শোনা উচিত নয়।

ইভার দিকে চেয়ে দেখলাম ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তার রক্তিম হয়ে উঠেছে। ভিতরের ক্রোধ চেপে রেখে সে ধীরে ধীরে বললে, তা হ'লে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে অরুণবাবু। ইভা শক্ত হয়ে বসল।

অরুণ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হলেও মুখে সে ভাব প্রকাশ করলে না। পাকা অভিনেতার মত গলার স্বর ও চোখের দৃষ্টিতে একটা সাবলীল ভাব ফুটিয়ে তুলে বললে,—অপেক্ষা আমাকে করতেই হবে মিস্ চ্যাটার্জ্জী! আপনার বাবার অনুরোধত অমান্য করতে পারিনে।

বাবার অনুরোধ? তেমন কোন বিশেষ অনুরোধ আছে না কি তাঁর? একটা কলহের আভাস স্পষ্ট হ'য়ে উঠল ইভার কথার ভঙ্গীতে।

আছে বৈকি! নইলে আমিই বা আপনাকে রোজ এসে বিরক্ত করব কেন? কথা এমন কিছু নয় কিন্তু বলার ধরণেই যেন ভিতরের উত্তাপ খানিকটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। আমার কেমন অস্বস্তি লাগল। কেন জানি না মনে হ'ল, এদের এই চাপা কলহের উপলক্ষ্য যা'ই হোক্ এর মূলে এমন কোন বস্তু রয়েছে যা' প্রকৃতপক্ষেই তৃতীয় কোন ব্যক্তির গোচরীভূত হওয়া শোভন নয়।

হেসে বললাম, মিস্ চ্যাটার্জ্জি. আমি নিচের ঘরে গিয়েই বসছি। আপনার বাবার কাছে একটু দরকার ছিল, ভাবছি দেখা করে যাব। আপনি বরং ততক্ষণ রাশিয়ান্ টিউন্‌টা ঠিক করে নিন। তাছাড়া অরুণবাবুর মত গুণী লোককে এক যায়গায় বেশীক্ষণ ধরে রাখলে অন্যায় হবে।

না, না, তার কিছুমাত্র দরকার নেই অরূপবাবু। আপনি এখানেই বসুন।

না কেন, মিস্ চ্যাটার্জী? নিজে আমি নির্গুণ লোক, গাইতে বাজাতে পারিনে। তা বলে সঙ্গীতের কদর বুঝিনে এমন নয়। শুধু শুধু বসে সময় নষ্ট করার চেয়ে ওতে বরং আপনার কিছু কাজ এগিয়ে থাকবে। একরকম জোর করেই যেন তাকে ঠেলে তুলে দিলাম।

ইভা আপত্তি জানাবার অবসর পেলে না। অরুণ কুমার প্রথমে আমার দিকে চেয়ে হর্ষধ্বনি করলে, ব্রেভো জেণ্টেল্ম্যান্! আপনি সংসারটাকে কিছু কিছু চিনেছেন দেখছি! পরে ইভার একখানি হাত ধরে ফেলে বললে, এর পর আপনার আর কোনো আপত্তি টিকতে পারে না মিস্ চাটার্জ্জি। ল্যেটাস্ হ্যাভ্ সুইট্ মেল্যডীস্।

ইভা এমনভাবে তার দিকে চাইল যে আমার মত আনাড়ীর পক্ষেও একথা বুঝতে কষ্ট হল না যে অরুণের সম্বন্ধে তার মনে আর যাই থাক বিশুদ্ধ অনুরাগ অন্ততঃ নেই। অথচ আমারই সম্মুখে বার বার 'না' বলবার লজ্জা থেকে সে নিজেকে বাঁচাতে চায়।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, শেষে কিন্তু বলবেন না আপনাকে একা ফেলে গেলাম,—যেন নেহাৎ কিছু না বললেই নয় এমনি ম্লান হাসির ক্ষীণতম আভাস তার মুখের ওপর দেখতে পেলাম।

না সে ভয় নেই, বলেই অল্প হেসে আমিও নীচে নেমে এলাম।

*　　　*　　　*　　　*

এক ঘণ্টারও ওপর নিচের ঘরে বসে আছি। অতবড় বাড়ীটার কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। রাত বোধকরি দশটার কাছাকাছি। কিছুক্ষণ থেকে পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজটাও শুনতে পাচ্ছি না। হঠাৎ বাইরে মোটরের ঘন ঘন হর্ণ শুনতে পেলাম। যাক্, এতক্ষণে বোধহয় শ্যামসুন্দর বাবু ফিরে এলেন। অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দিলাম ; রাত্রি এখনো বারোটা বাজেনি।

ভারী পায়ের শব্দ সদর থেকে এসে একেবারে আমার পাশের ঘরে থেমে গেল। ওখানা শ্যামসুন্দরের প্রাইভেট্ চেম্বার।

সঙ্গে সঙ্গেই উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় কক্ষটি ঝক্ ঝক্ করে উঠল।

পাশাপাশি এই দু'টি কক্ষের মাঝখানে একটা বড় জানালা। তারই মধ্য দিয়ে ও ঘরের প্রায় সমস্তই দেখতে পাচ্ছিলাম।

দেখলাম, মিলের মালিক গম্ভীর মুখে বসে আছেন। আর ম্যানেজার খোন্দকার নত মস্তকে হুকুমের অপেক্ষা করছে।

এমন অবস্থায় হঠাৎ তার সামনে যাওয়া উচিত কিনা চিন্তা করছি, ঠিক সেই মুহূর্তে শ্যামসুন্দরের কণ্ঠ গর্জন করে উঠল, আপনি আগে কিছুই জানতে পারেন নি ?

খোন্দকার রুদ্ধ স্বরে উত্তর করল, না স্যার, ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারিনি।

যদি ধরে নেওয়া যায় আপনিই এ ষড়যন্ত্রের মূল, আপনার নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারেন ?

ম্যানেজারের ভীত কণ্ঠ শুনতে পেলাম, আমি! আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন স্যার ?

শ্যামসুন্দরের কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর শোনাল,—শুধু আপনাকে নয়, অজ্ঞাত শত্রুর সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত মিলের প্রত্যেকটি লোককে আমি সন্দেহের চোখে দেখব। আর শুনুন, আপনার ওপর যে ছু'টো কাজের ভার দিয়েছিলাম তা শেষ করেছেন নিশ্চয় ?

হ্যাঁ স্যার,—খোন্দকারের গলাটা কেঁপে উঠল একবার, অনুসন্ধান করে যা জানতে পেরেছি তাতে রমাপদ লস্কর, সীতানাথ গোসাঞি এবং আরো ছু'চারজন যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, উদয়ভানুর সঙ্গে তাঁদের মাত্র মৌখিক পরিচয় ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ ছিল বলে জানা যায়নি।

হুঁ! কিন্তু বসুধা রায়ের রিপোর্টে তো ও কথা বলা হয়নি ? বরং তারা যে দলবদ্ধ ভাবে একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে

তুলছিল সারা ভারতবর্ষে, এই কথাটাই বিশেষ জোর দিয়ে বার বার বলা হয়েছে।

তার সব কথা সত্য নাও হতে পারে স্যার।

কিন্তু হওয়াটাই বা অসম্ভব কিসে?

প্রত্যেকটি কথা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম। একবার মনে হ'ল, আর না, এবারে নিঃশব্দে চলে যাব। কিন্তু উঠি উঠি করেও ওঠা হল না: আসল কথাটা এখনো জানা হয়নি। মুহূর্ত্ত কয়েক বোধকরি একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শ্যামসুন্দর বাবুর কথা শুনতে পেলাম; এবার তার কণ্ঠস্বরে পূর্ব্বেকার সে ঝাঁঝ নেই, বরং অত্যন্ত মোলায়েম আর দরদ মেশান।

তুমি কতদূর পড়াশুনো করেছ বিপিন?

আজ্ঞে, সে কিছুই নয়,—বিপিন বেশ স্পষ্ট গলায় বললে।

তা' হোক, শ্যামসুন্দর বাবু বললেন, ওতে আটকাবে না। তোমাকে আমার এসিস্‌ট্যাণ্ট্ করে নেব। কিন্তু তার আগে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বিপিনের মুখের দিকে তাকালাম।

তার নাম আমি জানতে পেরেছি যে এতকাল আমার নিমক খেয়ে আজ আমারই সর্ব্বনাশ করতে বসেছে।

বিপিন চমকে উঠল, আমি কি করতে পারি স্যার?

তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র তুমি ব্যর্থ করে দিতে পার। শ্রমিকরা তোমার কথায় ওঠে বসে এ সংবাদ আমি জানি। আর তুমিও তাকে দেখেছ। উদয়ভানু মুখোপাধ্যায়···আমার মেয়ে ইভার গৃহ-শিক্ষক। তার বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ তোমাকে সংগ্রহ করতে হবে, যাতে—

বিপিন মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল দ্বিধা কাটিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল, আমাকে মাফ করুন, হুজুর। এ কাজের ভার আপনি আর কাউকে দিন।

প্রচুর পুরস্কার পাবে।

আমি তো বলেছি আমি অক্ষম, বিপিনের কণ্ঠস্বর দৃঢ়তর শোনাল।

এ আমার আদেশ! হঠাৎ কঠোর স্বরে শ্যামসুন্দর বাবু ধমক দিয়ে উঠলেন।

এ অন্যায় আদেশ। আমি নিরুপায়!

এরপরে আর কোন কথা শুনতে পেলাম না, শুনলাম, হাণ্টারের সপ্ সপ্ কয়েক ঘা শব্দ।

ভয়ানক চমকে উঠলাম! এতটা আমি সত্যই আশা করতে পারিনি।

প্রয়োজন থাকলেও আজ আর এ নিয়ে শ্যামসুন্দরের সঙ্গে আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করে একেবারে বড় রাস্তার ওপরে এসে দাঁড়ালাম। আর ঠিক

তখনই আমার পাশ দিয়ে বিপিন আরক্ত মুখে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

বাড়ী ফিরে এসে দেখি কৃষ্ণা চুপ করে বসে আছে। কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত রেখে বললাম, এমন একলা বসে?

কৃষ্ণা চমকে উঠল, আমাকে আগে ও দেখতে পায়নি।

বললে, এই যে এসেছ! যাও তো, আর একটুও দেরী না করে একেবারে সমস্ত কথা শেষ করে তারপর বসবে। প্রায় দু' ঘণ্টা হ'ল তোমার বন্ধু বসে আছেন।

বন্ধু?—হঠাৎ খেয়াল হ'ল না কথাটা।

বন্ধু নয়? কি জানি। আমি ইন্দ্রাণীব দাদার কথা বলছি।

ঠিক্! উদয়ের আসবার কথা ছিল তো।

বললাম, তুই কি আজকাল সোজা করে কথা বলতে পারিসনে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা মাথা নিচু করে রইল, আমার কথার উত্তর দিল না। কেমন সন্দেহ হল। কাছে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরতেই দেখি চক্ষু ছল ছল করছে। মাত্র কয়েক মাস আগেই সে যে কতো বড় অসুখ থেকে সেরে উঠেছে একথা মনে করে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। কপালে বারবার হাত দিয়ে গায়ের তাপ

ভালো করে পরীক্ষা করে বললাম, শরীর কি ভালো নেই বোন ?

কৃষ্ণা হাত দিয়ে ধীরে ধীরে আমার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে বললে, তুমি ভাব এখনো আমি তোমার সেই বারো বছরের ছোট্ট বোনটিই রয়েছি, না অরূপদা ?

কেন ?

নইলে রোজ সকাল সন্ধ্যায় আমাকে শরীর নিয়ে জবাবদিহি করতে হয় কেন ?

ওঃ! এই কথা ? তা' তুই যে হঠাৎ সাবালিকা হয়ে উঠেছিস, ভালো মন্দ খোঁজ খবর নেওয়া চলবে না, এটা সব সময়ে খেয়াল থাকে না দিদি। কিন্তু তুই নিশ্চয়ই আমাকে কোনো কথা লুকোচ্ছিস।

কৃষ্ণা হাসিমুখেই বললে, তুমি যাও তো ; বাইরের লোক, সেই কখন থেকে বসে আছেন তোমার জন্য !—

তা যাচ্ছি, কিন্তু আমার কাছে তোর কোনো কথা লুকোনো চলবে না, বুঝলি ?

আচ্ছা, ঈষৎ হেসে কৃষ্ণা উত্তর করলে।

কি জানতে চাই তাও যেমন জানিনে, কি যে বুঝল, তাও তেমনি কৃষ্ণাই জানে। কিন্তু আর একটি মুহূর্ত্তও নষ্ট না করে একেবারে আমার ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। ইন্দ্রাণী তখন নিম্নস্বরে দাদার সঙ্গে কথা বলছে।

ইন্দ্রাণী বলছিল, তুমি যতই বল দাদা, কৃষ্ণাদির সম্বন্ধে ও অপবাদ একেবারেই খাটে না। নিজে তুমি কথা বলে দেখো। আমি বলছি, ভুল তোমার নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে।

উদয় হেসে বললে, তোর কৃষ্ণাদি বলেই সে কিছু অপূর্ব্ব হয়ে উঠতে পারে না ইন্দ্রাণী। ওঁরা বড় লোক, বড় ঘরের মেয়ে। কত সুখে আছেন। আমরা দুঃখ না পেলে ওঁদের অত সুখ কোথা থেকে আসবে বলতে পারিস ?

—ইন্দ্রাণী সত্য কথাই বলেছে উদয়। কোটি টাকার মালিক হয়েও কৃষ্ণার মত নিরহঙ্কার মেয়ে তুমি আর কোথাও খুঁজে পাবে না এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি,—আমি অতর্কিতে পিছন থেকে বললাম।

সর্ব্বনাশ! দু' তরফা ওকালতীর বিরুদ্ধে জবাবদিহি করতে পারি এত বিদ্যেবুদ্ধি আমার নেই। তার চেয়ে,—আমাকে লক্ষ্য করে বললে, তোমার সংবাদ কি তাই বল। দেখি যদি এদিকে কিছু সুবিধে হয়।

বললাম, শুভ সংবাদ দিতে পারলেই খুশি হতাম, কিন্তু ব্যাপার যা আন্দাজ করেছিলে ঠিক তাই। বসুধা সব কথা প্রকাশ করে দিয়েছে, স্বয়ং মালিকের মুখ থেকেই শুনলাম। বলে, এক এক করে ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা থেকে শুরু করে বিপিনকে বেত্রাঘাত করা পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই বিবৃত করলাম।

সকল কথা শুনে উদয় স্তব্ধ হয়ে রইল।

ইন্দ্রাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আনত মুখে নির্ব্বাক হয়ে আছে। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করা গেল না।

ধীরে ধীরে উদয়ের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, আকর্ণ-প্রসারী ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল। মুখের রেখাগুলো যেন বজ্রের ন্যায় কঠিন। বললে, আজই তোমাকে বলছিলাম অরূপ, এ ধর্ম্মঘট আমি চাইনে। কিন্তু নির্বুদ্ধিতা যখন অসঙ্কোচে আপনার সীমা ছাড়িয়ে গেল, আহত স্বার্থ প্রতিকার চাইল স্পর্দ্ধিত চাবুকের মুখে দরিদ্রের রক্তপাতে, আমি কোনোমতেই একে সহ্য করব না। বিপিনের সন্ধান নাও। সম্ভব হলে, কাল রাত দশটায় সে যেন এখানে উপস্থিত থাকে।

কথা শেষ করে সে উঠে দাঁড়াল, আচ্ছা, চললাম। ইন্দ্রাণী নিঃশব্দে বসেছিল, যেন এতটুকু স্পন্দন নেই তার দেহে। তাকে লক্ষ্য করে বললে, তুই বসে রইলি যে?

—না, যাই, ইন্দ্রাণী ম্লান হেসে উত্তর করল।

* * * * *

রাত্রি অনেকক্ষণ দ্বিপ্রহর অতীত হয়েছে। পথে জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই। উদয়ের সঙ্গে বড় রাস্তা

পর্য্যন্ত এসে পড়েছি। কষ্ণার পিছ্‌ডাক শুনতে পেলাম, তুমি কি এই রাত্রে আবার বাইরে যাচ্ছ অরূপদা ?

প্রশ্নটা কেমন বিসদৃশ মনে হল। কৃষ্ণার মনে হয়ত কিছুই নেই, তথাপি পাশেই দাঁড়িয়ে এমন একজন লোক যাকে এই রাত্রে পায়ে হেঁটে যেতে হবে প্রায় ছু' ক্রোশ পথ। যার মাথার ওপরে উদ্যত হয়ে আছে নির্ব্বিচার নিষ্ঠুর শাণিত খড়্গ,...যার বিলম্বিত ফিরে যাওয়ার প্রতীক্ষায় খোলা বাতায়নে সজাগ হয়ে নেই একটিও স্নেহাতুর দৃষ্টির উৎকণ্ঠিত অভ্যর্থনা। তারই সম্মুখে কৃষ্ণার এই শঙ্কাকুল জিজ্ঞাসা, তার তীক্ষ্ণ সতর্ক পাহারায় আমি সত্যই সঙ্কোচ অনুভব করলাম।

বললাম, না। কিন্তু আমার জন্য দেরী করিস নে কৃষ্ণা, তোরা খেয়ে নে। ছু'এক পা এর মধ্যেই অগ্রসর হয়েছিলাম। কৃষ্ণার অস্পষ্ট কয়েকটা কথা কানে এল, বাঃ, বেশ লোক তুমি !

উদয় যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়েছে এমনিভাবে বললে, না, না, তোমাকে আর আসতে হবে না অরূপ। কৃষ্ণা ঠিকই বলেছেন ; এই গভীর রাত্রে এমন করে পথ চলে যারা ভদ্র সমাজ তাদের সুখ্যাতি করে না।

যতদূর সম্ভব চোখের দৃষ্টি একাগ্র করে তার মুখের দিকে চাইলাম। কিন্তু বিদ্রূপের সামান্যতম ইঙ্গিতও সেখানে দেখতে পেলাম না। অথচ একথাও আমার কাছে

গোপন রইল না যে তার ঐ অল্পকটি কথার ভার যতটুকুই থাক, ব্যঞ্জনা আছে অনেকখানি।

উদয় কিছুকাল চুপ করে থেকে বললে, শাস্ত্রে বলে, পরের জন্য সব কিছু বিসর্জ্জন দাও, এর চেয়ে সুখের কিছু নেই; আমার কিন্তু মনে হয় স্বার্থ ত্যাগের দুঃখের দিকটাও বড় কম কথা নয়। সন্দেহ, অপমান, অত্যাচার তাদেরই সইতে হয়েছে সবার চেয়ে বেশী যারা দশের বোঝা মাথায় করে জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলিকে অপরিসীম ঔদাসীন্যে পশ্চাতে ফেলে গেল। জীবনের যা' কিছু যথাসর্ব্বস্ব নীরবে দান করেই যার সর্বসঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে গেল, আত্ম-প্রচারের মোহটুকুও অবশিষ্ট রইল না, অসাধারণ হলেও তোমাদের অতি শিক্ষিত ভদ্র শ্রেণীর বিচারে হয় সে নির্ব্বোধ, নয়তো জালিয়াৎ। না, না, তুমি দুঃখ ক'র না ভাই। ঠিক আমার পথে না চললেও তোমাকে আমি চিনেছি। নইলে আমার বিশ্বাস পেয়েছ কিসের জোরে?

বললাম, উদয়, তোমার কথাগুলোর অর্থ আমার কাছে অস্পষ্ট নয়; কিন্তু কেন যে আমাকেই এসব বলছ, তার—

একদিন আপনিই বুঝবে; কিন্তু আজ আর নয়। তোমার সত্যই ফিরে যাওয়া উচিত। একরকম জোর করেই আমার মুখ বন্ধ করে দিয়ে সে হন্ হন্ করে এগিয়ে গেল। একবারও পিছন ফিরে চাইল না।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। দূরে বিলীয়মান তার দীর্ঘ ঋজু দেহের দিকে চেয়ে অকারণেই আমার বুকের মধ্যটা হাহাকার করে উঠল।

মনে পড়ে সেদিন ঐ নিঃসঙ্গ যুবকটির দিকে চেয়ে চেয়ে আমার তুই চক্ষে সারা পৃথিবীর বেদনার ছায়া নেমে এসেছিল। নিজেকে বার বার এই একই প্রশ্ন করেছিলাম, এত বড় প্রাণ, এত বড় যার প্রতিভা তার সাধনা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? সেদিন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। কিন্তু আজ আমার সমস্ত সংশয় ঘুচে গেছে। আজ নিশ্চয় করে জানি, একাগ্র সাধনা তুর্যোগের ঝড়ঝাপটা তুচ্ছ করে মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় সার্থকতার উজ্জ্বল আলোয় একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবেই।

(৮)

পাথর-কাটা কুলিদের নিয়ে সাঁওতাল পরগণার দূর পল্লী অঞ্চলে যে গোলমালের সূত্রপাত হয়েছিল, আজও তা মেটেনি। গুণধর চিঠি লিখেছে,—বর্ষা শুরু হলে কাজ করা চলবে না, ফলে মোটা টাকা লোকসান হবে। কথাটা ঠিক। পাহাড়ী বর্ষা দেখেছি; তা যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড। তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় তার প্রবল ধারাবর্ষণ মাথায় করে বনের পশু তো ছার ক্ষুধার্ত্ত মানুষও আহারের

সন্ধানে বাইরে আসে না। অথচ সেই চলে আসার পর থেকে অনিবার্য ঘটনার পাকে এমনিই জড়িয়ে পড়েছি যে মীমাংসা তো নয়ই একটা জবাব পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। এই নিয়ে চারখানা চিঠি লিখল গুণধর।

কৃষ্ণার সঙ্গে এই নিয়েই আলোচনা করছিলাম। উদয়ের কাছে কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি। শুধুই সুযোগের অভাব বলে নয়; মনে আশঙ্কা ছিল পাছে এর সঙ্গেও তার কোন সম্বন্ধ বেরিয়ে পড়ে। পাছে অনিচ্ছায়ও বলতে হয়, দাবী তোমাদের ন্যায়ের সীমা লঙ্ঘন করেছে; অথবা শুনতে হয়, বহুর অধিকার হীন স্বার্থ-বুদ্ধির কুটিল বন্ধনে সঙ্কুচিত হয়ে পৃথিবীর মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষের জন্য সম্ভোগের স্বর্ণবেদী নির্ম্মাণ করেছে।

একদিকে অপচয়ের প্রচণ্ড উল্লাস, আরেকদিকে উপেক্ষিত আজন্ম বুভুক্ষা; মাঝখানে বনেদী স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর। বিলাসের এ সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় আমার সমর্থন নেই· এর কল্পনাও আমাকে ব্যথা দেয়। কিন্তু তাই বলে পরম বিশ্বাসে যে-সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব আমারই ওপর ন্যস্ত হয়েছে, তাকে মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দেবার অধিকারও আমার নেই।

কৃষ্ণাকে এই কথাই বলেছি, পাথর-কাটা মজুরদের বড় জোর আট আনা রোজ মজুরী বাড়ান যেতে পারে, তার বেশী কিছুতেই নয়।

কৃষ্ণা উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, কিন্তু ওদের দাবী যে চার টাকার এক তিলও কম নয় ?

ও একটা গণতন্ত্রের কূটনৈতিক হুমকি, তার বেশী কিছু নয়,—উৎকণ্ঠা গোপন করে হাসি মুখে বললাম।

কিন্তু এতে ওরা রাজী হবে না অরূপদা।

না হয় আর আট আনা বাড়িয়ে দেব।

যদি তাতেও না হয় ? কৃষ্ণার উৎকণ্ঠা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

তাতেও না হলে ? কিন্তু তখনকার কথা আজই তোকে কি করে বলি বোন ? আমি অসহায় দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকালাম।

তবে তাই লিখে দাও না গুণধরকে ; তোমার জবাব না পেয়ে ওরা যদি আরও শক্ত হয়ে বসে ?

আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমি যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম, কৃষ্ণার চোখ এড়ায়নি। বললে, কি ভাবছ অপরূদা ? পরক্ষণেই বললে, ঠিক, একটা কথা তো তোমাকে বলা হয়নি,—.

কি ?

ইভা আমাকে রাগ করে চিঠি লিখেছে ; মনে হয় আমি ওর কোনো বিশেষ অধিকারে হাত দিয়েছি। আমি কিন্তু একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

কৈ দেখি সে চিঠি ?

না, না, সে আমি তোমাকে দেখাতে পারব না। কি সব যা' তা' লিখেছে! তুমি একবার যাবে অরূপদা, ওদের বাড়ী?

কেন রে? আমি তার মুখ দেখেই কি মনের কথা জানতে পারব নাকি?

ঠিক মুখ দেখে না হলেও আমার বিশ্বাস তোমার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না।

বললাম, বেশ তো, কলেজ থেকে ওদের বাড়ী হয়ে আসব। কিন্তু তুই যে ভাবিয়ে তুললি কৃষ্ণা?

কেন? কৃষ্ণা বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল।

হেসে ফেললাম, বললাম, আমিও তো তোকে ঐ কথাই জিগ্যেস করছি। আমাকে জানান চাই, অথচ গোপন করাও দরকার।

একটি স্বচ্ছ সলজ্জ হাসি এক মুহূর্ত্তের জন্য তার মুখে দেখতে পেলাম। কিন্তু ঐ মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললে, গোপন যদি করেই থাকি, সে দায়িত্বও তোমার। ধীরে ধীরে কৃষ্ণা উঠে গেল। আমিও মুহূর্ত্ত কয়েক কৌতুকোজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লাম।

আজ এ কাহিনী লিখতে বসে বারবার একটা কথা মনে হয়; মনে হয় যে আপাতবিচ্ছিন্ন বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে এই আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি হবে তাদের সবটুকুই গল্পরচনার

নিয়ম রক্ষা করে সংঘটিত হয়নি। আমার অভিজ্ঞতার ইতিহাসে যার উপস্থিতি সবার আগে তাকেই হয়ত পিছিয়ে যেতে হবে এমন অনেকের পিছনে যারা অনেক পরে এসেছে। শুধু তাই নয়, এদের অনেককে আমি অপরের চোখ দিয়েও দেখেছি।

ইন্দ্রাণী কলেজে চলে গেলে কৃষ্ণাকে সারা দুপুরবেলা একা থাকতে হয়। গতবৎসর বি, এ, পাশ করবার পর ও নিজেই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। আমি কারণ জানতে চাইলে বলেছিল, কলেজ ভালো লাগে না অরূপদা, বাড়ীতে তোমার কাছেই পড়ব। সেই থেকেই নিঃসঙ্গ দ্বিপ্রহরের সাথে ওর ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

আজ ইন্দ্রাণী ঘরে নেই। কৃষ্ণা ঘুমোতে চেষ্টা করে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করে শেষে একেবারে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ঘুমোবার প্রচুর অবসর আছে বলেই ঘুম ওর সহজে আসতে চায় না। ইন্দ্রাণীর কিছুদিনের জন্য বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ একথা কৃষ্ণার জানা ছিল। তাই ও যখন বললে, আমি একটু ঘুরে আসছি কৃষ্ণাদি তখন কৃষ্ণা তার দাদার কথা তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল। উত্তরে ইন্দ্রাণী বলেছিল, দাদার কাজেই যাচ্ছি, তুমি ভেবো না।

এরপরে কৃষ্ণা তাকে বাধা দিতে সাহস পায়নি।

ইন্দ্রাণীর হঠাৎ এবাড়ীতে থাকা নিয়ে কৃষ্ণাও আমাকে আর কোন প্রশ্ন করেনি, আমিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তার কাছে এ

প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি। অথচ সে যে এ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ এমনও মনে হয় না। ইন্দ্রাণীই কিছু বলে থাকবে হয়তো!

একটা জিনিষ কিন্তু লক্ষ্য করেছি, ইন্দ্রাণী এখানে আসার পর থেকে উদয়ভানুর সম্পর্কে আমাকে আর সাবধান করে দেয়নি ও। বোধহয় বুঝেছে বন্ধুত্ব আমাদের যেখানে এসে পৌঁছেচে সেখানে নিষেধ শুধু নিরর্থক নয়, হাস্যকর।

বেলা তখন প্রায় আড়াইটা। কৃষ্ণা শেল্‌ফ্‌ থেকে একখানা বই টেনে নিয়ে অন্যমনস্কভাবে পাতা ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ তার মধ্য থেকে ইভার লেখা শেষের পত্রখানি বেরিয়ে পড়ল। বই রেখে দিয়ে পত্রখানি আবার প্রথম থেকে পড়ে গেল। ভাষা দুর্বোধ্য নয়, অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতটুকুও স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু অভিযোগের যথার্থ হেতু বোঝা যায় না। এক যায়গায় লিখেছে —"সাগরের জলে তৃষ্ণা মেটাতে চেয়ো না। ও লবণাক্ত বারি, শ্রান্তি দূর করবার সাধ্য নেই ওর। ওতে শুধু দেহকেই বিষাক্ত করে না, মনকেও ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে।"

বিজ্ঞানের এ সহজ সত্য কৃষ্ণার অজানা নয়। তবু তাকেই একথা এমন করে লেখা হয়েছে কেন?

পত্রের শেষের দিকটায় চোখ পড়ল। এখানে সুর সম্পূর্ণ আলাদা।......"স্বাভাবিক অধিকার বোধটুকুও হারিয়েছ? পরিচয়ের সাধারণ সীমা ডিঙিয়ে একান্ত হয়ে ওঠার সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করেছ শুনতে পেলাম; শুনে হাসি পেল।

রাগ যে একটুও হয়নি তা নয়, কিন্তু দুঃখ হয়েছে তার তুলনায় অনেক বেশী। তোমাকে নিরীহ বলেই এতদিন জানতাম। কিন্তু আজ দেখছি পরস্ব হরণেও তোমার লজ্জা নেই। এই জন্যেই কি আমার কাছে আসা বন্ধ করেছ? তোমার সঙ্গে শত্রুতা করতে চাইনে। কারণ তোমার যেখানে সুরু আমার সেখানে শেষ। আগে জানলে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।" তারপর এমনি দু'চারটে কথা।

তারপরে,......"ইভা আর যাই করুক মিথ্যে বলে না। অনেক চোখের জল তোমার সঞ্চিত হয়ে রইল।"

অধোমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কৃষ্ণা। এ কেমন চিঠি? হঠাৎ পথের দিকে চাইতেই চোখে পড়ল উদয়ভানুর উন্নত ঋজু দেহ তাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণ পার হয়ে নিচের ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করছে।

সারা বুকখানা এক নিমেষে তোলপাড় হয়ে উঠল তার। এই স্বল্পভাষী পুরুষটির দুর্নিবার আকর্ষণ সে মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। ইন্দ্রাণী ঘরে নেই, কিন্তু তাই বলে তাকে অনাদরে ফিরিয়ে দেওয়া চলে না। এক মুহূর্ত্ত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকল, একবার শুনে যাও তো ঝি?

ঝি সম্মুখে এসে দাঁড়াতেই বললে, ইন্দ্রাণীর দাদা এসেছেন। তাঁকে ছোটবাবুর ঘরে নিয়ে এসো; আমি যাচ্ছি।

মিনিট দুয়েক পরেই ঝি এসে বললে, বাবু জিগ্যেস করলেন, ইন্দ্রাণী দিদি কতক্ষণে ফিরে আসবেন।

বল গে কিছু বলে যান নি, আপনি বসুন।

ঝি সেই কথা বলে ফিরে আসতেই কৃষ্ণা বললে, কিছু খাবার আর এক কাপ চায়ের যোগাড় করতে হবে ঝি।

এ বাড়ীতে অতিথির আদর অভ্যর্থনা চিরকালের ব্যাপার। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঝি একহাতে কিছু খাবার ও অন্য হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে উদয়ের সামনে এসে বললে, দিদিমণি এটুকু খেয়ে নিতে বললেন বাবু, আমি চা নিয়ে আসছি।

উদয় বললে, একটু কাগজ দিতে পার?

এই যে এখানেই আছে, ঝি ড্রয়ার থেকে কয়েকখানি সাদা কাগজ বের করে টেবিলের ওপরে রেখে ঘর থেকে চলে গেল।

মিনিট সাত আট পরে ঝি যখন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অতিথির কাছে যাচ্ছিল তখন কৃষ্ণা কি ভেবে বললে, থাক, তোমাকে যেতে হবে না। আমিই চা নিয়ে যাচ্ছি।

এমন অপরিচিত নন যাকে নিশ্চিন্ত মনে এড়িয়ে যাওয়া যায়। বিশেষ করে অরূপদার বন্ধু, ইন্দ্রাণীর দাদা ; পর এঁকে কোনমতেই বলা চলে না। তাছাড়া লজ্জা করবার মত কি-ই বা আছে? হয়ত কথাই বলবেন না শেষ অবধি, যে খেয়ালী

মানুষ! জোর করে সকল দ্বিধা কাটিয়ে কৃষ্ণা ধীরে ধীরে উদয়ভানুর পাশে এসে দাঁড়াল।

উদয় তখন একমনে কি লিখছিল। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি টের পায় নি। আজই প্রথম সে এত কাছে থেকে এই অদ্ভুত মানুষটির মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। তার উন্নত দেহের বলিষ্ঠ ভঙ্গী আর আয়ত চক্ষুর গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াবার কথা মনে হতেই কৃষ্ণা অকারণে সংকুচিত হয়ে উঠল। অথচ এর কোন যথার্থ হেতু সে খুঁজে পেল না।

উদয় তেমনি লিখে চলেছে। সংসারের অন্য কোন বস্তুতে তার লক্ষ্য আছে মনে হয় না এমনই একাগ্র তন্ময় ভাব। ধীরে ধীরে চায়ের কাপ তার পাশের টিপয়ের ওপর রাখতে গিয়ে টুং করে শব্দ হল। উদয় অন্যমনস্ক চোখে সেদিকে একবার মাত্র তাকিয়ে মুখ না তুলেই বললে, কাউকে ডেকে দাও তো,--

কৃষ্ণা বুঝতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

চেয়ে দেখল প্লেটের ওপর খাবার তেমনি সাজান রয়েছে, একটিও স্পর্শ করা হয়নি। সসঙ্কোচে বললে, আপনি খেয়ে নিন।

রাখ ওখানে, দেখছি। খস্ খস্ করে সে লিখে গেল আরো আট দশ লাইন। খেয়াল নেই কার সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ একটু যেন বিরক্ত হয়েই বললে, দাঁড়িয়ে রইলে

কেন? যা বলছি শুনতে পাও না? লেখা তেমনি চলেছে।

কৃষ্ণার সমস্ত মুখ উজ্বল হয়ে উঠল চাপা হাসির আবেগে। কি যে শোনা উচিত আর কাকে যে ডেকে আনতে হবে কিছুই স্থির করতে পারলে না। এ কেমন অন্যমনস্ক মানুষ! ধীরে ধীরে বললে, একদম ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধহয়।

আঁা? এইবার মুখ তুলে চাইল উদয়। চেয়েই কিন্তু হা হা করে হেসে উঠল। কৃষ্ণা দৃষ্টি আনত করে মৃদু মৃদু হাসছে।

কিছু মনে করেন নি নিশ্চয়ই? আমি একেবারে বুঝতে পারিনি, উদয় এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললে। কথায় ওর ঝড়ের বেগ।

হ্যাঁ, এবার বলুন তো কি বলছিলেন? কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকাল সে কথা শেষ করে।

কৃষ্ণা হাসি গোপন করে সংযত কণ্ঠে বলল, চা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

না, না, ও ঠিকই আছে, চায়ের কাপে দু' একটা চুমুক দিয়ে বললে, বসুন না এখানে। আপনাকেই মনে মনে ভাবছিলাম। সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার কণ্ঠস্বর।

এক ঝলক রক্ত সহসা কৃষ্ণার মুখের ওপরে ছুটে এল।

কেন জানেন? অদ্ভুত বেহিসাবী যুবকের কণ্ঠ সহসা অতি গম্ভীর হয়ে উঠল, আপনার সম্বন্ধে অরূপ আর ইন্দ্রাণীর মুখে এত কথা শুনেছি যে ওদের দুজনের মতই আপনাকেও অত্যন্ত নিজের মনে হয়।

কৃষ্ণা আরক্ত মুখে চোখ নত করে রইল।

অথচ মজা দেখুন, এতো আর কিছুতেই সত্যি হতে পারে না? এক মুহূর্ত্ত উদয় চুপ করে থেকে পরে বলল, আপনাদের সাথে আমাদের হল খাদ্যখাদক সম্বন্ধ। তাই না?—আবার সেই হা-হা করে হাসি।

কৃষ্ণার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে সরে গেল। যে অস্বস্তিকর আনন্দের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব অনুভূতি এতক্ষণ তার সমগ্র চেতনা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, এই একটিমাত্র কথায় তার শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বাষ্পের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। উদয়ভানুর সঙ্গে এই স্বল্পকালের পরিচয়ের মধ্যে সে এমন কিছু দোষ করেনি যার জন্য তিনি এমন ভাবে আঘাত করতে পারেন।

অথচ এই নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক করার সঙ্কোচও সে কাটিয়ে উঠতে পারল না। সুতরাং নীরবেই এ উপহাস সহ্য করতে হল।

উদয় নিজের ঝোঁকেই বলে চলল, আপনি ইন্দ্রাণীকে অসময়ে আশ্রয় দিয়ে যে উপকার করলেন তার প্রতিদান নেই। আর কি-ই বা আমাদের আছে যা দিয়ে আপনাদের ঋণ শোধ করতে পারি?

এ কথা কেন বলছেন জানি নে। কিন্তু আমার তো মনে হয় ইন্দ্রাণী আমার রোগশয্যায় যা করেছে, নিজের বোন থাকলেও বোধহয় এর বেশী করতে পারত না। তার ঋণই কি শোধ দেওয়া যায়? অরূপদার কাছে শুনি, বাবা আমার জন্য অনেক রেখে গেছেন। এই একটি মাত্র অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ছাড়া আর কোন অন্যায় করেছি বলে আমার জানা নেই। কৃষ্ণা অতি মৃদুকণ্ঠে কথা কয়টি বলে গেল, কিন্তু চোখ তুলে চাইল না।

উত্তরে উদয়ের অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে হল। তবু এক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল, কতটুকু বলা উচিত, কতটুকু নয়। এইমাত্র সে যে-কথা শুনল, তাতে স্বল্পভাষিণী এই মেয়েটি প্রয়োজন হলে যে এর অপেক্ষাও শক্ত কথা অতি সংযত ভাবেই বলে যেতে পারে এ ধারণা হতে তার এক মিনিটও দেরী হল না।

একটু হেসে বললে, আপনি রাগ করেছেন: নইলে আপনার পক্ষে বোঝা একটুও কঠিন হত না যে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এই কথাই বলতে চেয়েছি যে আপনারা ও আমরা, এই আমাদের মধ্যে একটা শ্রেণীগত ব্যবধান রচিত হয়েছে। নইলে এ বাধা কোনো এক জনেরও সৃষ্টি নয়, আর এক দিনেই একে ডিঙিয়ে যাওয়াও যায় না। কিন্তু আমি কি ভাবছি জানেন?

কৃষ্ণা নিরুত্তরে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

ভাবছি, ঘটনাচক্রে আপনার সাথে পরিচিত হয়ে একটা নূতন উপদ্রবের সৃষ্টি করেছি।

কৃষ্ণাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললে, আমি জানি আপনি কি ভাবছেন।

কৃষ্ণা শঙ্কিত কণ্ঠে বললে, কি?

ভাবছেন আমার কথাই যে—

না, না, ও কথা,—ছিঃ! কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতা গোপন রইল না।

উদয় বিস্মিত হল, না কেন? নিশ্চয়ই আমার কথা ভাবছেন, আর না ভাবাই তো আশ্চর্য্য!

লজ্জায় কৃষ্ণার সারা মুখ সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল। সর্ব্বনাশ! না জানি এর পরে আরও কি বলে বসেন! এর কি একটুও হিসেব নেই? অথচ এ অবস্থায় চলে যাওয়াও অসম্ভব। অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে সে মাথা নিচু করে রইল।

ভাবছেন,—উদয় বলে গেল, উপদ্রব বলে যখন নিজেই স্বীকার করছেন তখন যত শীগগির হয় সরে যাওয়াই তো উচিত। কেমন, এই তো?

কৃষ্ণার বুক থেকে দুশ্চিন্তার পাষাণভার নেমে গেল। যাক্! তবু ভাল যে অন্য কিছু বলেন নি! কিন্তু কেন

যে মনের মধ্যে একটা তীব্র বেদনার অনুভূতি জেগে রইল, অনেক চেষ্টা করেও সে তার কোন সন্ধান পেল না।

উদয় বলল, তবে বিশ্বাস করুন, নিজে আমি আপনাদের কাছ থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করব।

কৃষ্ণা আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললে, আপনি অনেকদূর চিন্তা করেছেন দেখছি।

বাঃ! চিন্তা করব না? এ ত মানুষেরই কর্ত্তব্য! আপনি দিলেন বিপদের দিনে আশ্রয়, আর আমি আপনার কথা ভুলে যাব? আশ্চয্য! আমাকে দিয়ে আপনার কোন ক্ষতি হবে না দেখবেন। আচ্ছা, আমি উঠি তা হলে। হ্যাঁ, এই খামটা ইন্দ্রাণী এলে দেবেন। আর অরূপকে বলবেন সে যেন বাইরে না থাকে। আমি রাত দশটায় আসব। নমস্কার।

নমস্কার, কৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

উদয় আর পিছন ফিরে চাইল না, একেবারে রাস্তায় নেমে এসে সোজা দক্ষিণ দিকে চলতে লাগল। কৃষ্ণা জানালায় হাত দিয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল, কতক্ষণ সে নিজেও জানে না। এখনও যেন উদয়ভানুর কথাগুলো ওর কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, আপনার কথা ভুলে যাব? আশ্চর্য্য! আমাকে দিয়ে আপনার কোন ক্ষতি হবে না দেখবেন।

কৃষ্ণা আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে ফেলল। কখন যে নিজেরই অসাবধান মুহূর্তে তার চক্ষু দু'টি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল সে জানতেও পারেনি। এতক্ষণে নিজের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জায় ও সঙ্কোচে তার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ছিঃ ছিঃ! যদি ইন্দ্রাণী কিম্বা অরূপদা দেখে ফেলত!

হঠাৎ পিছন থেকে ইন্দ্রাণীর গলা শুনতে পেল, তুমি এখানে কৃষ্ণাদি? তোমার ঘরে দেখতে না পেয়ে ভাবলাম বেড়াতে গিয়েছ; তোমার দাদা বুঝি ফেরেননি এখনও?

না। কিন্তু তোমার দাদা এসেছিলেন।

চলে গেল যে?

তাত জানি না। কিন্তু এই চিঠিখানা দিয়ে গেলেন তোমাকে। কৃষ্ণা খামখানা ইন্দ্রাণীর দিকে বাড়িয়ে দিল।

ইন্দ্রাণী সেখানা উল্টে পাল্টে কয়েক বার দেখে নিল, কিছু বলে যায় নি?

বলে গেছেন, রাত দশটায় আসবেন।

কৃষ্ণা চেষ্টা করেও সহজ হতে পারছিল না। ভাঙা ভাঙা কথা, কেমন বেসুরো। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে ইন্দ্রাণী তার দিকে তাকাল। তারপর একেবারে তার বুকের কাছে এগিয়ে এসে আদর করে দু'হাতে মুখখানি

তুলে ধরে বললে, কি হয়েছে কৃষ্ণাদি? চোখ দু'টো অমন ছল্ ছল্ করছে? অসুখ করেছে?

কৃষ্ণাও ম্লান হেসে সোহাগ করে তার চিবুকটা নেড়ে দিয়ে বললে, হ্যাঁ বড়দি! মাথাটা বেজায় ধরেছে। সহরে বড় ডাক্তার কে আছে ডেকে আন, আমি ততক্ষণ ছট্‌ফট্ করি আর তুই মাথায় হাত বুলিয়ে দে।—

বেশ, যাও! আমার অন্যায় হয়েছে, ছোট্ট মেয়ের মত ঠোঁট ফুলিয়ে বললে ইন্দ্রাণী।

কৃষ্ণা হেসে ফেলল, অরূপদাকে বলব কাল তোকে পুতুল কিনে দেবে। বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, যা তো, মুখ হাত ধুয়ে আমার ঘরে চলে যা। এখনও আমার চা খাওয়া হয়নি।

ইন্দ্রাণী আর কোন কথা না বলে চলে গেল।

সেদিন কৃষ্ণার ঘরে বসে ইন্দ্রাণীর আরো কি কথা হয়েছিল জানতে পারি নি। কিন্তু ঐ একটি বেলার মধ্যে আমি যে-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম তাতে দু'টো জিনিষ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল; সেই কথাই বলি।

শ্যামসুন্দর বাবুদের চাটার্জ্জি লজ-য়ে যখন এসে পৌঁছলাম তখন রীতিমত সন্ধ্যা। নীচের বৈঠকখানায় বসে ইভার অপেক্ষা করছি। হঠাৎ ডাক এল ওপরে যাবার। গিয়ে দেখি ইঞ্জিনিয়ার অরুণ রুদ্র মূর্ত্তিতে কক্ষমধ্যে দ্রুত পায়চারি করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে এক লাফে আমার সুমুখে

এসে থমকে দাঁড়াল। বোধ করি একবার ভালো করে দেখে নিল আমার বৈশিষ্ট্যহীন নির্জলা দিশি চেহারা। পর মুহূর্ত্তেই আমার মুখের সামনে হাত নেড়ে বললে, ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ! বুঝলেন স্যার? জোর না করলে কিছুই জোটে না!

আর্য ঋষিদের এ পুরাতত্ত্ব আমার জানা ছিল। কিন্তু নিভাঁজ নেকটাই আর ওয়েষ্ট কোটের বর্ম্ম ভেদ করে হঠাৎ অনুনাসিক শাস্ত্রীয় আবৃত্তি পল্লীগ্রামের নিরীহ পুরোহিতের মুখে কড়া ইংরেজীর মতই বিস্ময়কর শোনাল।

বললাম, হঠাৎ আপনার এ ছন্দপতন?

অরুণ প্রথমে বুঝতে না পেরে চুপ করে রইল। পরে হেসে বলল, বসুন এখানে বলছি। উদয়ভানু আর্টিষ্ট্! চেনেন তাকে? চেনেন না? তা হোক্, শুনুন। মেয়ে পড়ান, ছবি আঁকা আর বড় বড় কথা বলা, এই তার পেশা। সম্প্রতি আব একটি কাজ জুটিয়েছে, মিলে ধর্ম্মঘট করান।

বললাম, ছেড়ে দিন অরুণ বাবু ওসব ভবঘুরে লক্ষ্মী-ছাড়াদের কথা।

ঠিক বলেছেন! একেবারে লক্ষ্মীছাড়া! কিন্তু ছেড়ে দেব? ছেড়ে দেব কি বললেন? ও কি সোজা মানুষ ভেবেছেন? পার্নিশস্ হম্বগ্! জানেন আপনি ওর ইতিহাস?

যদিও মনে মনে একটু বিরক্ত হয়েছিলাম, বাইরে সে ভাব প্রকাশ না করে কৃত্রিম উৎকণ্ঠিতস্বরে বললাম, না!

অরুণের উৎসাহ যেন ঠিকরে বেরিয়ে এল, মেয়েদের সম্বন্ধে ও একটি প্রফেশনাল চীট্! আর কিছু না থাক, ওর রূপ আছে ; আর সেই জোরেই ও আমাদের মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের সামনে বুক ফুলিয়ে চলে। কিন্তু এই সব শিক্ষিত মেয়েরা যে কি বলে ওকে সহ্য করেন জানি না।

বললাম, রূপের মোহ। এ ছাড়া আর কি হতে পারে বলুন ?

কিন্তু তাই বা কতক্ষণ থাকে ? এই দেখুন না, আমাদের মিস্ চাটার্জ্জি। দয়া করে শ'খানেক টাকা মাইনে দিচ্ছেন, আর ছবি এঁকে বড় জোর মাসে দু'শ টাকাই না হয় আয় হল ? কিন্তু ইভা এই যে তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ছায়ার মত, এর কোন অর্থ আছে বলতে পারেন ?

তার উল্টোপাল্টা কথা শুনে হেসে ফেললাম।

অরুণ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বললে, না, না, হাসির কথা নয়। মিষ্টার চাটার্জ্জিতো তাঁর মেয়েকে আমার কাছে বাগদত্তা করেই রেখেছেন ; অথচ ইভার ব্যবহারে আর চলা ফেরায় আমি সত্যই শঙ্কিত হয়ে উঠেছি।

অনেক আগেই অরুণবাবুর ব্যথার স্থানটা দেখতে পেয়েছিলাম, এবারে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। কৃষ্ণার কাছে ইভার রাগ করে চিঠি লেখার ব্যাপারটাও পরিষ্কার হয়ে এল।

কৃষ্ণা নিজেও আর আমার কাছে অস্পষ্ট নয়। কোথায় তার ভয়ের উৎস দেখতে পেলাম। কিন্তু কি ছেলেমানুষ কৃষ্ণা! উদয়কে সে কি এতদিনেও চিনতে পারে নি? সে যে কোনদিন—

দেখুন অরূপবাবু, বক্তা অরুণ যেন আরো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এই উদয়ভানুর অনেক কীর্ত্তিই আমি আবিষ্কার করব। শুধু একটি মাস সময় দিন আমাকে। দেখবেন,—

আচ্ছা, পরে দেখা হবে অরুণবাবু। নমস্কার! আমি ধীরে ধীরে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। তার ব্যক্তিগত ঈর্ষ্যার বিষোদ্গার নিঃশব্দে হজম করবার ধৈর্য্য বা সময় কোনটাই আমার ছিল না। অরুণ কুমারের একটা কথা শুধু কানে এল, ষ্ট্রেইঞ্জ!

বরাবর নিচের সেই ড্রইংরুমের কাছে আসতেই কিন্তু শুনতে পেলাম, শ্যামসুন্দর বাবু কার সঙ্গে অতি মৃদু কণ্ঠে কথা বলছেন; একটু কৌতূহল হ'ল।

কান পেতে শুনলাম,······বেশী নয়, মাত্র ছটি মাস যদি শ্রীঘর বাসের বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন তো হাজার টাকা পুরস্কার দেব আপনাকে।

কিন্তু তা কি সম্ভব হবে স্যার? এমন কোন নজির নেই যাতে ওর বিন্দুমাত্র অপরাধও প্রমাণ করা যায়। আর বসুধা রায়ের রিপোর্টের কথা বলছেন? সে যে টাকার

লোভে এ কাজ করে নি, আদালত একথা বিশ্বাস করবে কেন? তাছাড়া অতবড় নামজাদা শিল্পী, আন্তর্জাতিক খ্যাতি যার পিছনে, বিনা প্রমাণে রাজদ্রোহীতার অপরাধে তাকে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

আইনের কথা যা'ই হোক ইন্স্পেক্টর, আমার শত্রুকে জব্দ করা নিয়ে কথা। এতে যদি প্রয়োজন হয় আপনাকে আরো এক হাজার দিচ্ছি।

—না স্যার, উপায় নেই।

—যতো টাকা লাগে আমি দেব।

—আচ্ছা দেখি,......ইন্স্পেক্টরের বুটের আওয়াজ এগিয়ে আসছে। মুহূর্ত্তমধ্যে রাস্তায় নেমে এসে সহরের দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললাম।

উদয়কে যতদূর জানি, তার হাত দিয়ে মানুষের অকল্যাণ আসবে না। তার মতে একদিকে মানুষ মানুষের হৃদপিণ্ড ছিঁড়ে তপ্ত রুধিরের স্রোত বইয়ে আনন্দে হাততালি দেবে, বলবে আমরা জয়ী, আমরা বীর্যবান; আরেকদিকে চলবে আজন্ম-বঞ্চিত মুমূর্ষু মানবের কানে দিনের পর দিন গীতার নিস্কাম সাধনার অমৃত বর্ষণ! এপথে শান্তি আসবে না কোন দিন। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে দেখে আকাশ, দেখে আলো। মায়ের বুকের ক্ষীরে তার জীবনের পার্থিব ভোগের প্রথম অভিজ্ঞতার অধ্যায় শুরু। এই শিশুই একদিন বড় হয়ে ওঠে সম্ভোগের উগ্র কামনা নিয়ে। সারা তুনিয়ার অফুরন্ত সম্পদ প্রচণ্ড বেগে

নাড়া দেয় তার অসংখ্য অতৃপ্ত বাসনাকে। নিতান্ত জৈবিক ক্ষুধার তাড়নায় উন্মত্তের ন্যায় ছুটোছুটি করে উপেক্ষা ও ব্যর্থতার আঘাতে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় যখন রক্ত বমন করতে চায়, তখন তাকে ক্ষমা আর শান্তির মহিমা শেখানর মধ্যে আর যা'ই থাক, সুস্থ সবল মনের পরিচয় নেই। দুর্ব্বলের ত্যাগ, ত্যাগ নয়, আত্মবঞ্চনা! তাতে নির্ব্বোধ অহঙ্কারের প্রচুর আস্ফালন থাকলেও আনন্দের লেশ মাত্র থাকে না। ভোগের মধ্যেই তো ত্যাগের পরিপূর্ণ শুদ্ধ রূপ!

ভাবলাম, এতো মিথ্যা নয়! নইলে নিরর্থক হয়ে যেত যশোদার গৃহে ননীচুরির গোপন খেলা! নিরর্থক হত বৃন্দাবন-চারী চির-দুরন্ত কিশোর শিশুটির চির-মধুর কৈশোর লীলা! রূপৈশ্বর্য্যময় বিপুল বিশ্বের অনিরুদ্ধ সম্ভোগ-সাগরে অবগাহন করে আদিঅন্তহীন সর্ব্বগ্রাসী মহাকালের ঊর্দ্ধেও যিনি নিত্য বিরাজমান, তিনিই সর্ব্বত্যাগী পরম পুরুষ ভগবান! ভাবলাম শ্রীরাধার কথা। বিরহিণী প্রিয়ার অশ্রুজলের মহাসমুদ্র পার হয়ে একদিন তার ছায়া-শীতল শ্যামল কুঞ্জখানি, তার চির-বাঞ্ছিত প্রেমাস্পদ, তার নিষ্ঠুর দয়িতের পাদস্পর্শে সার্থক হয়ে উঠেছিল; ইহপরকালের সর্ব্বস্বত্যাগের বিনিময়ে এসেছিল তার পরম পাওয়া! একি অর্থহীন? মানুষের জীবনে কি এর কোন ইঙ্গিতই নেই? এমন কিছুতেই হয় না, কিন্তু অগণিত এই নিঃস্ব মানব? এরা ত্যাগ করবে কিসের আশায়?

এদের আজন্ম চোখের জল, একি নিরর্থক শুকিয়ে যাবে ? উদয়ভান্নর মত শতসহস্র মানুষ কি একদিন অনাগত কালের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসবে না, অকারণ-লাঞ্ছিত মানুষের ওপর অকৃত্রিম দরদ নিয়ে ? বুকে নিয়ে বিপুল শক্তি ? আসবে নাকি মুক্তির দেবতা তার সুধাপাত্র নিয়ে, উপেক্ষিত মানবের অশ্রুর প্রবাহ বেয়ে ?

হঠাৎ খেয়াল হল সম্মুখের অন্ধকার পথ সঙ্কীর্ণতর হয়ে গেছে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, উদয়ের ঘরের কাছে এসে পড়েছি। শুনলাম ইভার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, আপনি যত বড়ই হন, দারিদ্র্যের সম্মান নেই কোথাও একথা জানবেন।

উত্তর হল, জানি ইভা, এটা চিরকালের পুরনো কথা। কিন্তু দরিদ্র হলেও তারা মানুষ।

হোক মানুষ, কিন্তু ঐ অশিক্ষিত বুনোদের ভালো করা ছাড়াও আপনার অনেক কাজ—

ইভা! উদয়ের কণ্ঠ গর্জ্জন করে উঠল, মানুষের ওপর এত বড় ঘৃণা নিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে তোমার লজ্জা হল না ? ধনীর সন্তান তুমি, তুমি সুখে আছ। কিন্তু স্বার্থান্ধ ষড়যন্ত্রে যারা আজ পশু অপেক্ষাও হীনতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের এই পশুত্বের দায়িত্ব কার, ভেবেছ কোন দিন ?

প্রয়োজন হয়নি। কিন্তু আজ আমি শেষ জানতে এসেছিলাম আপনার ঠিক এই পথে চলার পরিবর্ত্তন

সম্ভব কিনা। রিক্ততার হাহাকার শুনতে পেলাম ইভার কম্পিত কণ্ঠস্বরে।

দূর থেকেই দেখলাম উদয়ের হাতের তুলিটি উঁচু করে ধরা, বোধ হয় ছবি আঁকছিল। সমস্ত মুখ স্বচ্ছ হাসিতে ভরে গেছে। বললে, অনেক রাত হল ইভা, বাড়ী যাও। আর কোন কথা হল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে আমারই পাশ দিয়ে চোখে আঁচল চেপে ইভা ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

কয়েক পা এগিয়ে এসে ডাকলাম, উদয় ?

এস অরূপ,—

উদয় হাতের তুলি রেখে দিয়ে দরজার দিকে তাকাল।

ইভা এসেছিল দেখলাম ? একেবারে তার পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, আমাকে উপদেশ দিতে, উদয় হেসে ফেললে। আর মনে করিয়ে দিয়ে গেল একটা ভয়ঙ্কর বিপদ আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

হাসির কথা নয় উদয়। আমি নিজের কানেও কিছু তার শুনে এসেছি।

উদয় আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। আমি একে একে সমস্ত কথা শেষ করে বললাম, শুধু টাকার জোরে চোখের সামনে এত বড় অন্যায় আমি কিছুতেই ঘটতে দেব না।

উদয় ধীরে ধীরে বলল, অরূপ, তোমাকে একটা অনুরোধ করব। রাখবে বল?

বিস্মিত হ'লাম। এমন করে ওকে আর কোনদিন কথা বলতে শুনি নি। বললাম, কি?

আমার আঁকা কয়েকটা ছবি প্রতিযোগিতায় প্রথম হ'য়েছিল। তখন ওগুলো বেশী দাম দিয়েই কেউ কেউ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রয়োজন ছিল না বলে সে ছবি আমি হাত ছাড়া করি নি। গলাটা একটু ধরে এলো তার। তবু আজ আর ওদের ধরে রাখব না। দেখোতো, যদি কেউ কিনতে চায়।

বললাম, ওতে আর কতইবা হবে? মাঝখান থেকে তোমার অত যত্নের ছবিগুলো পরের হাতে চলে যাবে।

তবু প্রায় হাজার দশেক হবে। ওতেই সম্প্রতি চলে যাবে। তা ছাড়া আর ত উপায় নেই। প্রবীরদের কেস আর দু'দিন বাদেই আরম্ভ হবে। তার জন্যও অনেক টাকার দরকার।

আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, যেমন করে পারি এই দু'দিনের মধ্যেই তার ছবিগুলি বিক্রি করে দেব। উদয়ের টাকার দরকার হবে জানতাম; তাই তার উপায়ও চিন্তা করে রেখেছিলাম। কিন্তু কি ব'লে তার হাতে সে টাকা তুলে দেব স্থির করতে পারছিলাম না। সুতরাং তার এ প্রস্তাবে মনে মনে খুশীই হলাম। ওর কাজ ত আগে

হয়ে যাক্, তারপর একদিন ছবিগুলো ফিরিয়ে দিলেই চলবে।

উদয় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল অরূপ, বিপিন বোধহয় এতক্ষণে এসে পড়েছে।

চল।

বাড়ী এসে দেখি বিপিন একা নয়, আরও দু'তিন জন তার কাছে বসে আছে। উদয় বিপিনের মুখ থেকে একটু একটু করে সমস্ত কথা জেনে নিয়ে বললে, যখন শুরু করেছ, এ ধর্ম্মঘট বন্ধ করা চলবে না। মনে রেখ যতদিন তোমাদের দাবী মালিক মেনে না নেয় ততদিন কোনোমতে বেঁচে থাকার দায়িত্ব তোমাদেরই: সাধ্যমত আমরা সাহায্য করব। কিন্তু সমস্ত নির্দ্দেশ তোমাদের মেনে নিতে হবে।

বিপিন রাজী হল।

উদয় বলল, মিলের সামনে গিয়ে ভিড় কর না তোমরা; তা'তে শুধু বিপদ বাড়বে।

এমনি আরো দু'একটা কথাবার্ত্তার পর বিপিন চলে গেল। কয়েক মিনিট সম্পূর্ণ চুপচাপ। গভীর চিন্তার রেখা উদয়ের মুখের ওপরে ফুটে উঠতে দেখলাম। অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য শ্রমিকদের এ গুরু দায়িত্ব সে কেমন করে বহন করবে? অথচ শেষ অবধি চিন্তা না করে ঝোঁকের মাথায় কাজ করবার মানুষও সে নয়। বললাম, কি যে হবে বুঝতে পারছি না।

উদয় মৃদু হেসে বললে, ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেতো চলবে না। যে করেই হোক একে ডিঙিয়ে যেতে হবে। তুমি ইন্দ্রাণীকে ডেকে আন অরূপ।

কিন্তু ডাকতে হল না ; কৃষ্ণার সাথে ইন্দ্রাণী এসে ঘরে ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। হাত তুলে কৃষ্ণাকে হাসি মুখে নমস্কার করে উদয় বললে, বস্থন। ইন্দ্রাণীকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, শোন, আমি হয়ত দু'চার দিন আসতে পারব না। কিন্তু তুই যেন ভাবিসনে। যদি কিছু প্রয়োজন হয়, অরূপ রইল।

তারপর চকিতে একবার মাত্র কৃষ্ণাকে দেখে নিয়ে হেসে বললে, ওকে বিশ্বাস করে বোধহয় ঠকবার ভয় নেই। কথাগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ভেসে এলো কানে। তড়িৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকে উঠলাম! এ কিসের ইঙ্গিত এই পরম গম্ভীর যুবকটি আমারই সম্মুখে ব্যক্ত করে বসল? কৃষ্ণার দিকে চোখ পড়তে মনে হল দেহের সমস্ত রক্ত যেন এক নিমেষে তার সারা মুখে ছুটে এসেছে। সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। বুঝলাম চিরদিনের অভিমানী মেয়ে সে, সংশয়ের ইঙ্গিতে মর্ম্মান্তিক আঘাত পেয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে উদয় অকস্মাৎ হেসে ফেললে একেবারে ছেলেমানুষের মত। বললে, অরূপ, তোমাকে একটা কথা এখনও বলা হয় নি। তোমরা কেউ ছিলে

না, আমি তখন বিকেল বেলায় এসেছিলাম। দেখলাম তুমি না থাকলেও অভ্যর্থনাটুকু রেখে গেছ তোমার বোনটির হাতে। কৃষ্ণাকে দেখিয়ে বললে, ইনি কিন্তু আমার ওপর সেই থেকেই রেগে আছেন।

কৃষ্ণা লজ্জিত মুখে হেসে বললে বাঃ! আমি রাগ করব কেন? বেশ ত!

করেন নি? তবে যে চুপ করে আছেন? বলেই হা হা করে হেসে উঠল উদয়।

বললাম, হাসছ যে?

কেন, আমি কি হাসতেও পারি না?

নিশ্চয়ই পার, কিন্তু তোমার হল কি?

কিছু না, মাঝে মাঝে এমনি হাসি, পাছে ওটা একেবারে ভুলে যাই। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, আপনি তখন আমার কথায় রাগ করেন নি শুনে খুসি হলাম। আর মিথ্যে তো বলি নি! আচ্ছা, তুমিই বলতো অরূপ! টাকা খরচ করবার পথ খুঁজে না পেয়ে যাঁরা অনিদ্রায় ভুগছেন, তাদের সাথে আমাদের ঠিক অহিনকুল সম্বন্ধ নয়?

ইন্দ্রাণী কৃত্রিম রুষ্ট স্বরে বললে, তুমি বুঝি এই সব কথা কৃষ্ণাদিকে বলেছ? ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইল কৃষ্ণার মুখের দিকে। হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে যেতেই বললে, তাই বুঝি তুমি তখন......

চুপ কর ইন্দ্রাণী! তোর অন্য কথা থাকে বল, নয়ত আমি চলে যাচ্ছি। কৃষ্ণার আর্ত্তস্বর শুনে চমকে উঠলাম! ইন্দ্রাণী একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিতে তার দাদাকে দেখে নিল। দেখলাম, কৃষ্ণার প্রতি মমতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে ওর চোখের দৃষ্টি। বললে, তুমি দুঃখ ক'র না কৃষ্ণাদি। আমি তোমাকে সব কথা পরে বলব।

কৃষ্ণা অল্প হেসে মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, দুঃখ কিসের ইন্দ্রাণী? কথা যদি ওঁর সত্যি হয়, রূঢ় হলেও তা সহ্য করবার ক্ষমতা আমার আছে। অরূপদা, আমি ওপরে যাচ্ছি। তোমাদের গোপন কথা একটু শীগ্‌গির সেরে নিও কিন্তু।

ঈষৎ হেসে সে চলে গেল; কিন্তু যাবার আগে উদয়কে নমস্কার করতে ভুলল না। উদয় হাসিমুখে চুপ ক'রে রইল। ইন্দ্রাণী কিন্তু রইল মুখ ভার করে। কৃষ্ণা চলে যেতেই উদয় বললে, ভালো লাগলেই তাকে সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না ইন্দ্রাণী। সে যে-ই হোক বোন, মনে রাখিস, শুধু ভালবাসাই তার চরম পরীক্ষা নয়।

তোমার সব কথার অর্থ খুঁজে পাইনে দাদা,—

আমার সব কথা যে আমারই কথা। তোর পক্ষে তার সবটুকু বোঝাতো সম্ভব নয়। তবু ভুলিসনে, তোর দাদা অনেক দেখে, অনেক দুঃখ পেয়ে একথা শিখেছে। কিন্তু এবার তোমরা উঠে পড় অরূপ; কৃষ্ণা সত্যই রাগ করবেন।

সকলেই উঠে দাঁড়ালাম। ইন্দ্রাণীর কিন্তু তখনও রাগ পড়ে নি। কৃষ্ণাকে কেন্দ্র করে সাবধানী ইঙ্গিত উদয়ের মুখে থেকে হলেও তাকে আঘাত দিয়েছে। আমি ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে হেসে বললাম, দাদার অপরাধে যেন আর কারো সাথে অসহযোগ ক'র না ইন্দ্রাণী। কিন্তু একথা আমি জোর করেই বলতে পারি উদয়, অভিমানে অন্তর পুড়ে ছাই হলেও যাদের মুখে কথা ফোটে না, ভালবেসে সর্ব্বস্বান্ত হয়েও যে সকল নারী নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে ঐশ্বর্য্যবতী, কৃষ্ণা সেই জাতের মেয়ে। মিথ্যাচার আজও ওর জীবনকে স্পর্শ করে নি। কেন জানিনা আমার বহুদিন মনে হয়েছে, ওর মত অতখানি শ্রদ্ধা তোমাকে আর কেউ করে না। রাগ ক'র না ইন্দ্রাণী, ওখানে তুমিও বুঝি কৃষ্ণার কাছে হেরে যাবে।

কথাটা বলে ফেলে নিজেই হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। কবে যে কৃষ্ণার কোন কথায় আমার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল আমি নিজেও স্মরণ ক'রতে পারলাম না। অথচ শুধু মনে হওয়াই নয়, এ আমার বিশ্বাস। চেয়ে দেখি, ভাই বোন দু'জনেই আমার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

আমি ঠিক আপনার মত করে বলতে পারি নে। তবু বলব, কৃষ্ণাদিকে ভালোবাসতে না পারার, আর সন্দেহ ক'রে ব্যথা দেবার দুঃখও বড় কম নয়। কথা শেষ করে ইন্দ্রাণী ওপরে উঠে গেল।

যেতে যেতে একবার শুধু বললে, কাল একবার এসো দাদা, কথা আছে,—

তোমরা দু'টিতে দেখছি আমাকে সহজে নিষ্কৃতি দেবে না। আমার দিকে চেয়ে উদয় হেসে বললে, কিন্তু ছবির কথা যেন ভুলে যেও না।

বললাম,—না।

(৯)

গুণধরের কাছে শেষ চিঠির উত্তরে লিখেছিলাম, তোমাদের মজুরি বড়জোর আড়াই টাকা অবধি বাড়ান যেতে পারে, এর বেশী নয়; কিন্তু আর কোন জবাব দেয়নি সে। সরকার মশায়ের কাছ থেকে দিন কয়েক আগে চিঠি এসেছে, তারা তাদের দাবী পরিবর্ত্তন করে নি। সুতরাং পাথর কাটা এ বছরের মত বোধহয় বন্ধ করতে হ'ল। মুখে যা'ই বলি, কলকাতা সহর থেকে দিনমজুর পাঠিয়ে পাহাড় কেটে ঘরে পয়সা আনা যে সম্ভব নয়, একথা ভাল করেই জানি। কৃষ্ণা এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চায় না। অথচ চার টাকা রোজ দিতে গেলেও আয়ের অর্দ্ধেক বেরিয়ে যায়। তাতেও ক্ষতি ছিল না। ভাবছি, এর পরে যখন দ্বিতীয় দফা দাবী নিয়ে তারা হাজির হবে তখন নিষ্কৃতি পাব কোন পথে। এমন করে জমিদারী রক্ষা করা চলে

না। পরঞ্জয়ের কথা মনে পড়ল। শান্ত, সংযত, কর্ত্তব্যে কঠিন এই যুবকটি যদি দেবদূতের মত এসে না পড়ত সেই বিপদের দিনে তো কৃষ্ণার জীবন-রক্ষা হত না কোনমতেই। আর তাকে দেখিনি; অথচ একটা কথা আজও জানা হল না—সে তাদের অলঙ্ঘনীয় হুকুম-নামা। কে সেই রহস্যময় অজ্ঞাত অধিনায়ক যার অঙ্গুলি-হেলনে যন্ত্রের ন্যায় ওরা চালিত হচ্ছে? একবার উদয়ের কথা মনে হয়েছিল। পরে ভেবে দেখেছি তা সম্ভব নয়। কারণ তা হলে এতদিনের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে অন্ততঃ একটুখানি আভাস পেতাম তার। কিন্তু পরঞ্জয়ের নাম তার মুখে কোন দিন শুনতে পাই নি। অথচ সেই দূর পাহাড়-অঞ্চলে তাদেরই সঙ্গে ইন্দ্রাণীর একত্র বাস করা, এও যেন অজ্ঞাত বাসের মতই রহস্যময়।

ক'দিন থেকে মনে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। সম্প্রতি উদয়ের আসন্ন বিপদের কথা স্মরণ করে, আর পাহাড়ী মজুরদের জেহাদ ঘোষণায় রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লাম।

উদয়ের আঁকা ছবিগুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছি। যখন তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম তখন কাজটা যে এত কঠিন, মনে হয়নি। কিন্তু একদিন পরেই বুঝলাম বাংলার সম্পদে নরকের রাজপথ নির্ম্মাণ করা যত সহজ, কোন মহত্তর শিল্পের মর্য্যাদা বাঁচিয়ে রাখা তত সহজ তো নয়ই, বোধকরি একেবারেই অসম্ভব! অথচ অসম্ভব বলে চুপ করে বসে

থাকা চলবে না। আজ একটি দিন মাত্র, কাল ভোরে না হ'লেও দুপুর বেলা উদয় নিশ্চয়ই আসবে। নিজের অক্ষমতার কথা ভেবে লজ্জা ও ক্ষোভের পরিসীমা রইল না। ভাবছি, আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখব। হঠাৎ ইন্দ্রাণী এসে বললে, আপনার কাছে এলাম।

চেয়ে দেখি বড় হাসি মুখ। বললাম, তাইতো দেখছি। কিন্তু এখনও যে চা খাওয়া হয় নি ইন্দ্রাণী। তোমাদের আজ হ'ল কি? ঝি-ই বা কোথায় গেল?

—কাল রাত থেকে ঝিয়ের অসুখ করেছে। কৃষ্ণাদি নিজেই চা তৈরী করছেন। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আরেক বার তাড়া দিয়ে আসি, বলেই ইন্দ্রাণী দ্রুত লঘু পদক্ষেপে চলে গেল।

কিছু আশ্চর্য্য হলাম। বিশেষ কারণ না থাকলে ইন্দ্রাণী আমার সঙ্গে কথা বলে না। এ বাড়ীতে ও নামে যে কেউ থাকে তাই মনে হয় না এমনি চুপ চাপ। কি জানি কি ওর মনের কথা? কিন্তু যাই হোক, ইন্দ্রাণীকে দেওয়ার মত খুব বেশী সময় হাতে নেই। একজন সম্ভ্রান্ত ঠিকাদারের সঙ্গে কথা চলছে। এবারের মত তাকেই পাথর কাটার পূরো কণ্ট্রাক্ট দিয়ে গুণধর সমস্যার সমাধান করব স্থির করেছি। তাতে লাভ অনেক কম হলেও গুরুতর লোকসানের সম্ভাবনা নেই। এ ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পাই নি আমি। ভাবছি, লোকটার সাথে পাকা কথা হয়ে গেলে

গুণধরকে এই কথাই লিখে দেব, সে যেন তাদের দেনা-পাওনার বিষয়টা এবারকার মত এর সাথেই ঠিক করে নেয়। পরে তাদের কথা আরো ভাল করে চিন্তা করে যা হয় করা যাবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে সমস্যাকে এই ভাবে এড়িয়ে যাওয়াই সবচেয়ে সহজ মনে হল।

রাজেশ্বর তলাপাত্র অতি পাকা লোক, ঝুনো ব্যবসায়ী। বিদ্যা না থাকলেও শুধুমাত্র ধারাল বুদ্ধির জোরে ঠিকাদারী ব্যবসায়ে সে আজ লক্ষপতি। ছেলেদের খেলার মাঠ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য-সম্মিলনীর বড় বড় আসরে তার ডাক পড়ে। এ হেন স্বনামধন্য রাজেশ্বর পৈতৃক আমলের শতচ্ছিন্ন ছাতাটি বগলে চেপে সদরে এসে উপস্থিত হয়েছে, গজাননের মুখে সংবাদ পেয়ে নিচে চলে এলাম।

—এই যে রাজেশ্বর বাবু, নমস্কার! ঘুম ভাঙতে বড় দেরী হয়ে গেল।

রাজেশ্বর যেন একেবারে অবাক হয়ে গেল। মিহি নরম গলায় বললে, নমস্কার। তা দেরী আর এমন কি হয়েছে বাবু। অপনারা রাজা মানুষ! আমাদের মত দু'টো পয়সার জন্য তো হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় না? দেখুন না, সারাটা জীবন গায়ের রক্ত জল করলাম, কিন্তু পাথর চাপা কপাল বাবু, দৈন্য আর ঘুচল না!

একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলাম। কথাটা যে মিথ্যা নয়, তার পায়ের দিকে চেয়েই বুঝলাম। দীর্ঘ

দিনের একনিষ্ঠ ভালবাসার অসহ্য চাপে সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত সৃষ্টি হলেও রাজেশ্বরের কঠিন প্রভুত্ব থেকে তার অসহায় পাদুকা যুগল মুক্তি পায় নি। বড় হাসি পেল। জহুরি জহর চেনে। রাজেশ্বর আমার রাজলক্ষণ চিনতে ভুল করে নি! গম্ভীর হয়ে বললাম, আপনি তা হলে রাজী আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেবে দেখলাম, আপনাদের মত লোকের সঙ্গে কারবার করাও তো কম সম্মানের কথা নয়? টাকা তো হাতের ময়লা বাবু, ধুয়ে ফেললেই পরিষ্কার।

ব্যবসাদারী গৌড়চন্দ্রিকায় মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম; বললাম, তাহলে কাগজ পত্র বের করুন, সই ক'রে দিচ্ছি; কাজটা শেষ হয়ে যাক।

—হ্যাঁ, এই যে! বলেই সে ব্যাগ খুলে একখানি কণ্ট্রাক্ট ফরম টেনে নিয়ে আমার সম্মুখে রাখলে। ষ্ট্যাম্প আমি দিয়েই এনেছি বাবু।

পড়ে দেখলাম নিয়মের কোথাও এতটুকু গলতি নেই, এমনই নিরেট। যথাস্থানে নাম স্বাক্ষর করে কাগজখানি তার হাতে ফিরিয়ে দিতেই রাজেশ্বর পরম আগ্রহে হাত বাড়িয়ে সেখানি গ্রহণ করে বললে, আপনার অ্যাডভান্স টাকাটা তুলে রাখুন বাবু। বলেই পকেট থেকে একখানি মোটা অঙ্কের চেক বের করে আমার সম্মুখে রাখল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, নমস্কার! আসি তা হলে।

—নমস্কার! কাজ স্থুরু হলেই একটা খবর দেবেন।

রাজেশ্বর সম্মতি জানিয়ে চলে গেল। নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললাম, বাঁচা গেল। একটা দায় থেকে তো নিষ্কৃতি পেলাম। এবারে বাকী রইল উদয়ের ভাবনা।

জানালার ফাঁকে রোদ এসে ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম বেলা কম হয় নি। ভাবলাম, আর দেরী করা নয়। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ব। আমারই কোন বাল্য বন্ধু এবং সহধ্যায়ী মাত্র মাস কয়েক আগে পিতার প্রচুর সম্পত্তি হাতে পেয়ে এই সহরেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ী ক্রয় করেছে। মানুষটি সৌখীন, তাতে শিক্ষিত। কিছুদিন পূর্ব্বেও সেখানে গিয়েছিলাম। ঘরে আসবাবপত্র যা দেখেছি তা নিতান্ত অল্প মুল্যের নয় বলেই আমার বিশ্বাস। চোখে লেগে গেলে হয়ত দু'একখানা ছবি সে কিনে ফেলতে পারে; একথা কাল রাত্রেই শুয়ে শুয়ে চিন্তা করেছি।

ওপরে এসে দেখি কৃষ্ণা আর ইন্দ্রাণী আমার ঘরেই বসে আছে। আমাকে আসতে দেখে কৃষ্ণা বললে, তুমি কি বলতো অরূপদা? তোমার জন্য ওর অবধি চা খাওয়া হয় নি।

হেসে বললাম, তুইতো খেয়েছিস?

হঠাৎ কৃষ্ণা গম্ভীর হয়ে বলল, ক'দিন তোমাকে ফেলে খেয়েছি শুনি? আজকাল তোমরা সবাই দেখছি

আমাকে খোঁচা না দিয়ে কথা বলতে পার না। কি জানি, কি দোষ করেছি,—

কৃষ্ণার কথায় ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হাসছে। কিন্তু আমি একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, তোকে নিয়ে যে ভারি বিপদ হল দেখছি! একটু ঠাট্টা করবারও যো নেই?

-যদি জানেন এতে কৃষ্ণাদি ব্যথা পায় তো এমন ঠাট্টা নাইবা করলেন। মৃদু হেসে ইন্দ্রাণী বললে।

—না, তা কেন, কৃষ্ণা বললে, তুমি কর না যত খুশী হাসি ঠাট্টা। কিন্তু অকারণ আমার এ অপবাদ কেন অরুপদা?

কি তোমাদের কাজ কতটুকু তার দায়িত্ব সে তোমরাই বলতে পার। তবু তোমার বন্ধু আমাকেই সেদিন এসে শুনিয়ে গেলেন যা মুখে আসে তাই। কেন? আমি কি করেছি তোমাদের? শেষের দিকে গলাটা কেঁপে গেল তার।

বুঝলাম সবই কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব আমার কছে নেই, তাই চুপ করে থাকতে হল। ইন্দ্রাণী আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে কৃষ্ণাকে বলল, তুমিও খেয়ে নাও কৃষ্ণাদি।

তিন জনেই চা খাচ্ছি, কিন্তু নিঃশব্দে। কিছুকাল অপেক্ষা করে বললাম, এবারকার মত রাজেশ্বরকেই

ষ্টোন ফিল্ডের পূরো কণ্ট্রাক্ট দিয়ে দিয়ে দিলাম দিদি।

—কে রাজেশ্বর? কৃষ্ণা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল।

বললাম, রাজেশ্বর তলাপাত্র; মস্ত বড় কণ্ট্রাক্টর। এইমাত্র কাগজপত্র সব সই করে দিলাম, বলেই একে একে সবিস্তারে তার পোষাক-পরিচ্ছদ আর কথাবার্তার বর্ণনা দিয়ে, অবশেষে তার পাদুকার চেহারা বর্ণনা করলাম।

কৃষ্ণা ক্ষণকাল পূর্ব্বের সমস্ত অভিযোগ ভুলে গিয়ে হঠাৎ একেবারে খিল খিল করে হেসে উঠল। ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে দেখি, সে প্রাণপণে অদম্য হাসির উচ্ছ্বাস সংযত করতে চেষ্টা করছে। মনে মনে খুসী হয়ে উঠলাম। ভাগ্যে তলাপাত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম; নইলে এত সহজে মেঘ কেটে যেত না। বিছানার ওপরে ছবিগুলি তখনও তেমনি পড়েছিল। তাড়াতাড়িতে তুলে রাখা হয় নি। কৃষ্ণা হঠাৎ প্রশ্ন করল, ও কার ছবি অরূপদা, দেখব?

—দেখ না। হেসে বললাম।

উঠে গিয়ে এক এক ক'রে ছবিগুলি নিবিষ্টমনে দেখতে লাগল কৃষ্ণা। ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন হাসছিলে কেন ইন্দ্রাণী?

—এতক্ষণে মনে পড়ল? থাক, দরকার নেই আপনার সে কথা শুনে।

—বাঃ! তখন যে তলাপাত্র—

—এখনও তবে তলাপাত্রকে নিয়ে থাকুন। বলেই

ইন্দ্রাণী হেসে ফেললে। তারপর কৃষ্ণাকে ডেকে বললে, কৃষ্ণাদি, সব ভুলে গেলে নাকি ? কি করব বলে দাও।

—যা তুই, আমি এখনি আসছি। কৃষ্ণা আবার ছবিগুলির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

ইন্দ্রাণী চলে যেতেই বললাম, কৃষ্ণা, আমাকে একবার বাইরে যেতে হবে। যদি কেউ আসে অপেক্ষা করতে বলবি।

ছবি কখানা একসঙ্গে বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে যাবো, কৃষ্ণা পিছন থেকে ডাকল, অরূপদা শোনো।

—কি, বল।—ফিরে তাকালাম তার দিকে।

—ছবি নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ?

-দরকার আছে। সংক্ষেপে বললাম।

—আমি শুনতে পাই নে ? কৃষ্ণা গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করল।

—কেন পাবি নে ? ঘুরে এসে তোকে সব কথা বলব। কৃষ্ণা অভিমান করবে জানতাম : তবু আর দেরী করবার সময় ছিল না। সুতরাং আর কথা না বলে বেরিয়ে পড়লাম।

*　　　*　　　*

রবিবারের অলস পূর্ব্বাহ্ণ। বন্ধুটিকে বাড়িতেই পেলাম। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী কয়েকটি যুবক তাকে ঘিরে নানা

বিষয়ের আলাপ আলোচনা করছিল। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নির্ব্বাক হয়ে গেল।

বন্ধুবর দরজার দিকে তাকিয়েই সোল্লাসে অভ্যর্থনা করল, আরে! অরূপ যে? এসো, এসো। তারপর? খবর কি?

—কোন্ খবর জানতে না পেয়ে তুমি উদ্বিগ্ন হয়ে আছ বল? শুধু তারই জবাব দেব। আমি হেসে ফেললাম।

বন্ধু যেন একটু অপ্রতিভ হল, তার মানে?

হাসি মুখেই বললাম, মানে, আমার সময় অত্যন্ত কম। তোমার সঙ্গে একটু একা কথা বলা দরকার। যুবক ক'টিকে লক্ষ্য করে বললাম, মাত্র তুচার মিনিট, তার পরই আমি চলে যাব।

যুবক ক'টি যেন মহা অপরাধ করেছে এমনি করে বললে, না, না, আমরা তো,···আপনি বসুন না! সে কি? মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে তারা উঠে দাঁড়াল।

এ-কথা সে-কথার পর একেবারে সোজাসুজি কথাটা বলে ফেলে ছবি ক'খানি তার সম্মুখে খুলে দিলাম। বেশ মনোযোগ দিয়ে সব ক'খানা ছবি সে দেখল।

বলললাম, কি? পছন্দ হ'ল?

—পছন্দ অপছন্দের কথা নয় ভাই। ছবিতো নিশ্চয়ই সুন্দর! কিন্তু এ তো তু'দশ টাকার ব্যাপার নয়? অত টাকা দিয়ে ছবি কেনার কথা আমার কল্পনায়ও আসে না।

বললাম, কেন? তোমার তো টাকার অভাব নেই। ইচ্ছা হলে তুমি এ ক'টা টাকা অনায়াসে দিতে পার।

—পাগল! ঐ দেখতেই অত। নইলে খরচ করলে আর কদিন?

তবু বললাম, তুমি একখানা অন্ততঃ রাখ।

—বার বার 'না' বলার লজ্জা দিও না ভাই, সাধ্য থাকলে নিশ্চই রাখতাম। মুহূর্ত্তকয়েক চুপ করে থেকে বলল, তুমিও যেমন, ছবির আবার দাম আছে নাকি এ দেশে?

এর পর আর কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হল না। কোন রকমে প্রত্যাখ্যানের লজ্জা গোপন করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

বাড়ী ফিরে এসে দেখি কৃষ্ণা কোমর বেঁধে লেগে গেছে রান্না করতে; আর ইন্দ্রাণী পাকা গৃহিণীর মত তার পাশে দাঁড়িয়ে কখনও রাগ করে, কখনও স্নেহের স্বরে মৃদু তিরস্কার করে এটা ওটা বলে দিচ্ছে তাকে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে ওদের বাদানুবাদ উপভোগ করতে লাগলাম।

—আঃ! কারিটা একেবারে নষ্ট করে দিলে কৃষ্ণাদি? সর ত আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

—তুই থাম্‌তো ইন্দ্রাণী! রান্না শেখাস নি আমাকে।

ইন্দ্রাণী একটুকরো মাংস মুখে দিয়ে বললে, তাতো বলবেই ; কিন্তু নিজে তুমি খেয়ে দেখত ?

এইবার সুযোগ বুঝে সামনে এসে দাঁড়ালাম। বললাম —বেশ, বেশ ! এমনি খেয়ে না রাঁধলে কি আর রান্না হয় ?

ইন্দ্রাণী একেবারে চমকে উঠল ! ও ভাবতেই পারে নি আমি এভাবে এসে হাজির হব। কৃষ্ণা কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত হল না, বলল, আমাকে বল না অরূপদা ; সে ঐ তোমার ইন্দ্রাণী, সমানে মুখ চলছে সেই থেকে।

শুধু ইন্দ্রাণী নয়, আমি অবধি অত্যন্ত লজ্জা পেলাম। ইন্দ্রাণীর আগে তোমার শব্দটাও যেমন আকস্মিক কৃষ্ণার মুখ নিচু করে হাসি গোপন করবার প্রয়াসও তেমনি বিস্ময়কর। অথচ কৃষ্ণা সে ধাতের মেয়েই নয় যে লঘু পরিহাসে শ্রদ্ধেয়কে অবমানিত করবে।

আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই কৃষ্ণা বললে, অরূপদাকে একটা আসন বিছিয়ে দে ইন্দ্রাণী। তুমি এখানেই একটু বসতো অরূপদা ? এক কাপ চা করে দিই। রান্না হতে বেলা সেই ত্ব'টো।

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইতে পারছিল না। কোনমতে একখানা আসন পেতে দিয়ে কৃষ্ণার গা ঘেঁসে বসল।

হেসে বললাম, তাই দে। তোরা ত্বটিতে মিলে যা' আরম্ভ করেছিস তাতে শেষ পর্যান্ত এ বেলা জুটলে হয়।

—ইস্! তা বলবেন না! কৃষ্ণাদি রান্না করতে দিলে না তাই, নইলে দেখতেন···। এতক্ষণে ইন্দ্রাণী কথা বলল। নইলে কি যে দেখতাম তার চোখের দিকে চেয়ে সত্যাই বোঝা গেল না; কিন্তু নিজের বুকের ভিতরটা যতখানি দেখা যায় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে বস্তু চোখে পড়ল তাতে আনন্দ যতখানিই থাক, বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল! কখন যে কেমন করে এ সম্ভব হল ভাবতে গিয়ে চিন্তার সূত্র হারিয়ে ফেললাম; কিন্তু নিজের কাছে স্বীকার না করে উপায় রইল না, ইন্দ্রাণী আমারও অজ্ঞাতে আমার মনে যে স্থানটি জুড়ে বসেছে সেখান থেকে তাকে 'না' বলে ফিরিয়ে দেওয়ার শক্তি আমার নেই!

বিশেষ বয়সের মেয়েদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা আমার এই প্রথম নয়। অধ্যাপক জীবনে এ অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। তথাপি কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে এ দুর্ঘটনা ঘটল, ভাবতে গিয়ে নিজের মনেই হাসলাম। এতদিনে সৃষ্টির আদি অধ্যায়ের শাশ্বত প্রশ্নের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছি।

এই ইন্দ্রাণী,······এই উদয়,······এদের ঘিরে যখন ঘোর দুর্য্যোগের ঘনঘটা এগিয়ে আসছে, ঠিক তখনই সুরু হল আমার জীবনের আর একটি অধ্যায়; যা' বহু পূর্ব্বেই আরম্ভ হতে পারত কিম্বা আজ না হলেও ক্ষতি ছিল না। এতদিন নানা দেশের নানা কাব্যের অধ্যয়ন আর

অধ্যাপনা নিয়ে নির্বিঘ্নে কালাতিপাত করেছি, কোথাও বাধা আসে নি এতটুকু। জানি, কোথায় তাদের শুরু, কোথায় শেষ। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে যে নিবিড় মোহময় জীবন্ত মহাকাব্যের মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তার আরম্ভও যেমন ঠিক জানা নেই; তার শেষ কথাটাও তেমনি অন্ধকারেই আত্ম-গোপন করে রইল।

তবু এ তো শুধু এক দিকের কথা। এর যে আরো একটা দিক আছে, সেখানে যে ঠিক এমনই নাও হতে পারে তা এতক্ষণ মনে হয় নি। একবারও ভাবি নি যে ইন্দ্রাণীর জীবনে অরূপের ছায়াপাত অনিবার্য্য নয়। এবার যেন নিজের কাছে অনেকখানি সঙ্কোচ অনুভব করলাম।

এমনি কত কি যে ভাবছি ঠিক নেই। চা খাওয়ার পরেও যে এখানে চুপ করে বসে থাকবার কোন সঙ্গত হেতু নেই, একথা শুধু তখনই খেয়াল হল যখন কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল,—কি এত ভাবছ অরূপদা? কতবার যে ডাকলাম, সাড়াই দিলে না।

বললাম, ভাবনার কি অন্ত আছে দিদি? এক তোকে নিয়েই তো সারা হয়ে যাচ্ছিলাম, তায় জুটলো আর এক দুর্ভাবনা! চেয়ে দেখি, ইন্দ্রাণী কখন চলে গেছে; কৃষ্ণা একা।

জিজ্ঞাসা করলাম, ইন্দ্রাণী কোথায় রে?

—তাকে চান করতে পাঠালাম না? তুমি দেখছি কোন কথাই শুনতে পাও নি। আচ্ছা অরূপদা, আমাকে তুমি নিশ্চয়ই কিছু লুকোচ্ছ। ঠিক না?

মৃদু হেসে বললাম, কেন বল্‌তো?

—কেন আবার কি? ক'দিন থেকেই দেখছি তুমি চুপ করে বসে থাক, ডাকলে শুনতে পাও না। কারণ জানতে চাইলে শুধু শুধু বকা খেয়ে মরি।

—কখন আবার তোকে বকলাম? সশব্দে হেসে উঠলাম আমি। এমন করে অনেকদিন হাসি নি। কৃষ্ণা অত্যন্ত খুশি হয়ে আদর করে বললে, বল না অরূপদা?

হাসি থামিয়ে ধীরে ধীরে বললাম, একজনের কিছু টাকা চাই, খুব দরকার। অথচ যোগাড় করতেও পারছি না এমনি বিপদ।

—কে সে? আমি চিনি তাকে? কৃষ্ণা সাগ্রহে প্রশ্ন করল।

—চিনিস হয়তো। গম্ভীর মুখেই উত্তর করলাম, সে এমনি একজন লোক, নাম উদয়ভানু। বলেই হো হো করে হেসে উঠলাম। কিন্তু কৃষ্ণা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

বললাম, কি রে কিছু বললি নে?

কৃষ্ণা নিরুত্তরে মুখ নিচু করে বসে রইল, যেন শুনতে পায় নি আমার কথা। প্রায় একমিনিট পর তার অতি

মৃতু কণ্ঠ শুনলাম, তুমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ ?

—হ্যাঁ। ভাবছি ছবিগুলো বেচে দেব। দু'দশ হাজার যা হয় আসবে। অথচ তুই ত জানিস নে এই ছবি ক'খানা তার যে কত প্রিয় ! অনেক দিন, অনেক দুঃখ সয়েও এগুলো সে হাত ছাড়া করে নি।

তাইতো ভাবি, স্বাধীন দেশে জন্মালে যে মাথার মণি হয়ে থাকত, আজ সামান্য ক'টা টাকার অভাবে দুর্ভাবনার শেষ নেই তার।

—একটা কথার উত্তর দেবে অরূপদা ? দাও ত বলি।

—কি ?

—এত টাকা হঠাৎ তাঁর প্রয়োজন হল কেন ? সঙ্কোচ কাটিয়ে কোনমতে ও কথাটা শেষ করল।

তারপর একে একে আমার মুখে সব কথা শুনে সেই যে কৃষ্ণা মৌন হয়ে রইল বহু চেষ্টা করেও তার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারলাম না। আরো কিছুকাল অপেক্ষা করে যখন উঠে পড়লাম তখন কৃষ্ণা মুখ তুলে তাকাল আমার দিকে ; ম্লান কণ্ঠে বলল, একটা অনুরোধ করব তোমাকে ?

কিছু না বলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলাম।

—দাম যাই হোক, ছবি হিসেবে যখন সত্যই অপূর্ব্ব, ও না হয় তুমিই রেখে দাও। এতো আর কিছুতেই অপব্যয় নয় ?

কথা শুনে একদিকে যেমন হাসি পেল অন্যদিকে তেমনি এক নিদারুণ দুর্ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বললাম, সেই ভালো বোন। উদয়ের কাছে শুনেছি, প্রথম যখন ওছবি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে দেখান হল তখন খুব চড়া দামেই তা বিক্রি হতে পারত। কিন্তু ওর মত ছিল না। তা বেশ, তোর কাছে থাকলে ছবির অমর্যাদা হবে না, ইচ্ছে হলে তাকে আবার ফিরিয়ে দিতেও পারবি।

যেন কি একটা ধরা পড়ে গেছে এমনি সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে কৃষ্ণা বললে, আর এক কাজ করলে হয় না অরূপদা ?

—কি ?

—আগেও তোমাকে বলেছিলাম, তারপর তুমিও ভুলে গেছ, আমারও আর মনে হয়নি। বলত কি ?

হেসে ফেললাম, নিজেই বললি আমি ভুলে গেছি আবার আমাকেই তার উত্তর দিতে হবে ?

কৃষ্ণাও হেসে জবাব দিল, বাবার একখানা বড় অয়েল পেন্টিং-য়ের কথা বলিনি তোমাকে ?

বললাম, বেশ তো, কাল এলে বলে দেখব ওকে। আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না ?

—কি ?

—কাকাবাবু, কাকীমা আর তুই, তিন জনের একখানা গ্রুপ ছবি করিয়ে নে না ?

কৃষ্ণা চুপ করে রইল। ওর স্বচ্ছ চোখের স্থির দৃষ্টির মধ্যে কিসের ছায়া পড়ল যেন। উদয়ের সম্বন্ধে এই অশেষ বুদ্ধিমতী মেয়েটির মনে দুর্ভাবনার অন্ত নেই জানি। জানি তার ওপরে শ্রদ্ধার সীমা নেই ওর। কিন্তু ঐ শ্রদ্ধার অতিরিক্ত আরো কিছু যদি অনভিজ্ঞ প্রথম যৌবনের রঙীন খেয়ালে পরিপুষ্ট হয়ে উঠে থাকে ওর মনে, হয়তো অশ্রুজলেই তার সমাপ্তি টেনে দিতে হবে। যে মানুষ এতবড় পৃথিবীতে নিজের ভোগের বস্তু খুঁজে পেল না ; বিশ্বমানবের ঐকান্তিক কল্যাণসাধনা আর আগামী দিনের পথচলার বিপুল পরিকল্পনায় যার প্রতিভা নিয়ত বহ্নিমান, সংসারের বাঁধন সে কি মেনে নেবে কোনদিন ? অথচ একথাই বা কেমন করে অস্বীকার করি, যদি সন্দেহ আমার সত্যই হয় তো তার সবটুকু দায়িত্বই আমার ? সহসা মনে হল কৃষ্ণা ঠিক এমনই কি একটা ব'লেছিল একদিন।

—অরূপদা ? অনেক বেলা হল যে, ওঠো না,—

চমকে উঠলাম। বাইরে চেয়ে দেখি দ্বিপ্রহর অনেকক্ষণ অতীত হয়েছে। বললাম, হ্যাঁ, উঠব।

* * *

সারাদিনের শ্রমে শরীর অবসন্ন। রাত্রি গভীর হয়েছে। ঘরের মধ্যে নিরেট অন্ধকার। নানা কারণে মন ভারাক্রান্ত ;

একে একে অনেকে ভিড় করে এল নিমীলিত চোখের সামনে। এল গুণধর···পাহাড়ী মজুর প্রজা, বণিক রাজেশ্বর, পরঞ্জয়, ইন্দ্রাণী, উদয়ভানু আর কৃষ্ণা! মানুষকে যেন নূতন দৃষ্টিতে দেখলাম আজি। কারও সঙ্গে কারও মিল নেই, তবু এক সূত্রে গাঁথা। যেন একের প্রয়োজনে বহুর সৃষ্টি; অথবা বহুর আবির্ভাবে রচিত বিশালপরিধি এক বৃত্তকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে একের অবিরাম দুস্তর পথচলা। এ চলার শেষ নেই কোথাও। শ্রান্ত পদক্ষেপ পথিমধ্যে কেমন করে একদিন অকস্মাৎ থেমে যায়। অতৃপ্ত মানুষ মাটির মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে। পরিপূর্ণ ঘুম······অখণ্ড স্তব্ধতা! কেমন বিশ্রী লাগল। কি এক অকরুণ শূন্যতা তীক্ষ্ণ ব্যথার মত সারা বুক জুড়ে ধীরে ধীরে সজাগ হয়ে উঠছে। অনেকক্ষণ জেগে রইলাম। তারপর কখন যে দু'চোখের পাতা জুড়ে এল জানি না, জেগে দেখি সকাল হয়ে গেছে।

* * *

তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিলাম। অনেক কাজ। কলেজের কর্তৃপক্ষের দরবারে আবেদন পাঠিয়ে দিলাম, দু'দিনের ছুটি চাই। কাল প্রবীরদের বিচারের দিন। উদয়ের কাছে শুনেছি, ধৃত যুবকদের আত্মীয় স্বজনেরা

তার কাছে দাবী জানিয়েছেন, ওদের মুক্তি চাই-ই ; তা সে যে কোন মূল্যেই হোক, তার দায়িত্ব নাকি উদয়ের। লস্কর-গৃহিনী কান্না-বিগলিত নরম স্বরে, গোসাঞিয়ের বিধবা পিসীমা ভগ্নকাংস্যনিন্দিত কণ্ঠে, আর গুপ্তবাবুর বোনঝি-যা-য়ের গঙ্গাজল উদ্যত সম্মার্জ্জনী হস্তে বিভিন্ন ভঙ্গীতে এই কথাই ঘোষণা করেছেন, এদের বেকসুর খালাস করে আনতে যে-অর্থের প্রয়োজন তা জুগিয়ে যাবার ভাবনা তারই। শুনে বিস্মিত হই নি। সংসারে নিজের বলতে যাদের কিছুই থাকে না, অভিসম্পাত আর অপযশের বোঝা তারাই চিরকাল মাথায় বয়ে বেড়ায়। এ নিয়ম শাশ্বত কালের।

শ্যামসুন্দর বাবুদের চাটার্জ্জীলজ-য়ে গিয়েছিলাম অপরাহ্নের দিকে। সেখানকার পরিবেশে স্বাস্থ্যহীনতা ফুটে উঠেছে অত্যন্ত তীব্র হয়ে। পিতা, পুত্রী ও ইঞ্জিনিয়ার অরুণ, এই ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়ে অতবড় ইন্দ্রপুরীটা যেন থম্ থম্ করছে। মনে মনে অরুণের প্রসংশা না করে পারি নি। ইভা যতই তাকে বারংবার অপমানে দূরে সরিয়ে দিতে চায়, ততই সে ক্ষুধিত রাহুর মত মুখব্যাদন করে তার দিকে এগিয়ে আসে ; তার কঠিন বাহুপাশ বিস্তার করে দেয় ইভার চতুর্দিকে। ইভা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে অরুণের ওপর, তারা বাবা আর সমস্ত পৃথিবীর ওপর। নাছোড়বান্দা প্রেমের কাহিনী এতকাল উপন্যাসে পড়েছি, এবার তার প্রত্যক্ষ রূপ চোখে দেখলাম। একটা সংবাদ কিন্তু সত্যই আমাকে

বিস্মিত করেছে, সে দুর্দ্ধর্ষ শ্যামসুন্দরের গুরুভার ঋণ! কয়েক লক্ষ টাকা ওভারড্রাফ্‌টের জোরে এতদিন যে উগ্র আভিজাত্যের ঠাট তিনি বজায় রেখে এসেছেন, মাসাধিককাল মিলের কাজ বন্ধ থাকায় তা সশব্দে ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে। আরো কিছুকাল এ অবস্থা চললে মিল তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। অজস্র টাকা চাই! হয়ত এই কারণেই তার বিচারে অরুণ কুমার আজ অদ্বিতীয় সুপাত্র।

ইভা যখন রাগের মাথায় অরুণকে বললে, যার সম্মান বোধ নেই তাকে পরিচিত বলে স্বীকার করতেও আমার রুচিতে বাধে; এর পরে কোন কারণেই আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয় আমি চাই না, তখন ক্ষোভে, দুঃখে জ্ঞান হারিয়ে শ্যামসুন্দর বাবু তাকে মৃদু তিরস্কার করলেন, ছিঃ মা! অরুণ আমাদের বন্ধু, সম্মানিত অতিথি। রাগ করে কি এমন কথা বলতে আছে? তুই এখনো তেমনি ছেলেমানুষ! তারপর একবার আমার দিকে আরেকবার অরুণের দিকে চেয়ে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন। মুখখানা কিন্তু বিবর্ণ হয়েই রইল।

অরুণ গম্ভীর মুখে বললে, নিশ্চয়ই শকড্‌ হয়েছে! নইলে এমন কথা ওঁর মুখ থেকে বেরোতে পারে না। আপনি ভাববেন না মিষ্টার চাটার্জ্জি। অসুস্থ মনের সামান্য একটা কথায় আমার তো রাগ করলে চলবে না? ও সব ঠুন্‌কো সেন্টিমেণ্ট্‌ আমার কোন কালেই নেই।

শ্যামসুন্দর হয়ত আশ্বস্ত হলেন; কিন্তু ইভা একেবারে জ্বলে উঠল এই নির্লজ্জ উক্তিতে। উত্তেজনায় তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠল; এবং পরমুহূর্তেই কোনদিকে না চেয়ে দ্রুতপদে ঘরের বাইরে চলে গেল।

ঠিক একমুহূর্ত পরে যা ঘটল, একমুহূর্ত আগেও মানুষ তা জানতে পারে নি, এমন দৃষ্টান্ত সংসারে বিরল নয়। বোধহয় একেই বলে আকস্মিক। শ্যামসুন্দরের জীবনেও এই সত্যোপলব্ধির সময় এল। যে-ধনের অহঙ্কারে তিনি পরম নির্ভয়ে মনুষ্যত্বকে দু'পায়ে দলিত করে এসেছেন, যে-ঐশ্বর্য্য দিয়েছে তাঁকে উদ্ধত স্বৈরাচারের উষ্ণ আস্বাদন, আজ অত্যন্ত অকস্মাৎ সে সম্পদের সৌধ পতনোন্মুখ। ন্যায়ের অমোঘ শাসন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে সে-সৌধের চোরাবালির বনিয়াদ বিপুল বলে নাড়িয়ে দিয়েছে। আর দু'সপ্তাহ মাত্র। এর মধ্যে ব্যাঙ্কের দেনা পরিশোধ না হলে আইনতঃ মিলের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরিত হবে। অরুণকুমারকে তাইতো এ বিপদের দিনে বিমুখ করা তার পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু সে কথা থাক্। ভাবছি উদয়ের কথা। কখন সে আসবে এই অপেক্ষায় বসে আছি। তার হাতে টাকাটা তুলে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম। সারাদিন কেটে গেল এমনি বহু চিন্তার মধ্য দিয়ে।

ঘরের পশ্চিমের জানালাটা বন্ধ ছিল, খুলে দিয়ে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম। অস্তমিতপ্রায় সূর্য্যের রক্তাভ রশ্মিপাতে এক নিমিষে ঘরের চেহারা বদলে গেল।

বাইরের পানে তাকিয়ে সঞ্চরমান লোকসমাগম দেখছি! কতো বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন জাতির নরনারী, কতো বিচিত্র বেশভূষা। দেখতে এও আমার বেশ লাগে। যাদের কিছুই জানা নেই, কিছুমাত্র পরিচয় নেই যাদের সাথে, দূর থেকে তাদের চঞ্চল পদক্ষেপের মধ্যে আমি অনন্ত জীবনের আভাস পাই যেন!

—একলা থাকতে এতও ভালো লাগে আপনার! কি করে পারেন বলুন তো? চুপি চুপি ইন্দ্রাণী এসে পিছনে দাঁড়াল।

বললাম, সারাদিনের মধ্যে কতক্ষণ আমি একলা থাকি. ইন্দ্রাণী, যে এমন করে নিন্দা করছ?

ইন্দ্রাণী লজ্জা পেয়ে বললে, না, না, নিন্দে কেন করব? আমি এমনি বলেছি। আপনি রাগ করলেন তো? বলেই ঘুরে এসে আমার সম্মুখের চেয়ারে বসে পড়ল।

—ভয়ানক! বলেই ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে হেসে ফেললাম। ইন্দ্রাণী স্বাভাবিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, দাদা কখন আসবে জানেন?

—জানি। এখন থেকে রাত দশটার মধ্যে।

—কৃষ্ণাদির ওপরে দাদা কিন্তু সত্যি অবিচার করছে।

—কেন?

—কেন নয় বলুন? ধনী হলেই সে কিছু মন্দ হয়ে যায় না। কিন্তু কেন যে এ সোজা কথাটা দাদা বুঝতে চায় না, শুধু সে-ই জানে।

—কৃষ্ণা কিছু বলেছে তোমাকে ? ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম।

ইন্দ্রাণী বলল, না, কিন্তু চোখ দু'টোতো আছে! মেয়েদের ব্যথা মেয়েদের কাছে গোপন থাকে না।

রীতিমত গম্ভীর মুখে বললাম, হয়ত থাকে না। তবে হ্যাঁ, চোখ তোমার আছে। আর বেশ বড় বড় চোখই। কিন্তু কি জান ইন্দ্রাণী ? চোখে না দেখলে যাদের জানা হয় না সংসারে অনেক বস্তুই তাদের অজানা থেকে যায়।

ইন্দ্রাণী চক্ষু নত করে একমুহূর্ত্ত কি চিন্তা করল, তারপর নিম্নকণ্ঠে অতি স্নিগ্ধ স্বরে বলল, আবার এমনও তো হতে পারে, যা নিজে জেনেও আর কাউকে জানান যায় না ? তাকে বলতে পারেন ভীরুতা। কিন্তু অজ্ঞতার স্থূল অপবাদ, সে তো একেবারে আলাদা জিনিষ!

শুনে সর্ব্বশরীর শিউরে উঠল। মৃদুকণ্ঠের সামান্য ক'টি কথা অপরের শিরায় শিরায় এমন করে যে প্রবল তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চার করতে পারে, এ ইতিপূর্ব্বে কোনদিন অনুভব করি নি।

অস্তমান আলোর উৎস থেকে গাঢ় রক্তচ্ছটা অজস্রধারে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সে আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখে, তার সর্ব্বাঙ্গে। কয়েক মুহূর্ত্ত তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলাম না।

সহসা ইন্দ্রাণী মুখ তুলে তাকাল, মৃদু হেসে বলল, একটা কথা কিন্তু আপনি রাগ করলেও বলব।

—কি? হেসে প্রশ্ন করলাম।

—নিজের সম্বন্ধে সচেতন থাকা ভালো। খুশী হলে তা নিয়ে অহঙ্কার করাও চলতে পারে; কিন্তু সেই জোরে আর কাউকে জড়পদার্থ মনে করলে তার ওপর চূড়ান্ত অবিচার করা হয়।

কথা শেষ করে ইন্দ্রাণী উঠে দাঁড়াল। তারপর এক মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে থেকে বলল, যাই, কৃষ্ণাদিকে পাঠিয়ে দিই গে।

ধীরে ধীরে ইন্দ্রাণী চলে গেল।

মনে মনে বললাম, ইন্দ্রাণী, রেখে ঢেকে যা তুমি বলে গেলে তা যদি সত্যি হয়, আমার সৌভাগ্যের সীমা নেই। আর এ যদি শুধু আমারই কল্পনা, মিথ্যে বলেই যদি একে বুঝতে হয় কোনদিন, ব্যথা আমি পাব; লোক-চক্ষুর আড়ালে অশ্রু হয়ত ঝরে পড়বে সেদিন; তবু ইন্দ্রাণীর পাশাপাশি আর কোনো নারীর দাঁড়াবার স্থান হবে না। দুঃখের দিনে সেই-ই কি আমার কম?

কৃষ্ণা এসে বললে, আমাকে ডেকেছ, অরূপদা?

বললাম, আয়, বোস দিদি। সারা বিকাল বেলা কোথায় ছিলি?

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল কৃষ্ণা, কেন, ঘরেই তো ছিলাম! কিছু বলবে?

—নাঃ, চুপ চাপ বসে ভালো লাগছিল না তাই।

—ওঁদের কেস তো কালই শুরু হবে······প্রবীরবাবুদের ?

—হ্যাঁ।

—রাজেশ্বর বাবু সংবাদ পাঠিয়েছেন ? কাজ আরম্ভ হল ওখানকার ?

—না দিদি, সেও আর এক ভাবনা। কোন রকম গোলমাল না হলেই বাঁচি।

—এই যে, নমস্কার !

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে দু'জনেই উন্মুক্ত দ্বারপথে যুগপৎ চেয়ে দেখলাম, উদয়ভানু। দৃঢ় সম্বন্ধ ওষ্ঠদ্বয়ে অনমনীয় সঙ্কল্পের বলিষ্ঠ অভিব্যক্তি। বললাম, এসো উদয়। ও দিকের খবর ভালো ?

ভাল মন্দের জবাব আজই কি করে দিই ? ঈষৎ হাসি মুখে সে আমার পাশে এসে বসল। কৃষ্ণার অবস্থা দেখে আমার হাসি পেল, এমনি জড়সড় ভাব। উদয়ভানুর এত কাছাকাছি, এমন মুখোমুখি বসবার সঙ্কোচ ও আজও কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

তারপর, উদয় জিজ্ঞাসা করল, তোমার ছবির খবর বল। এখনও কিছু ব্যবস্থা হয় নি বোধহয় ?

আমাকে তুমি এমনই নির্দায়িত্ব মনে কর নাকি ? সব কখানাই বিক্রী হয়ে গেল !

বিক্রী হয়ে গেল ? কেমন অসহায় আর্ত্তনাদের মত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। মুখে একপ্রকারের ম্লান হাসি, যা

শুধু কান্নারই নামান্তর। এক নিমিষেই তার সমস্ত কথা স্মরণ হল। উদ্গতপ্রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস সংযত করে মনে মনে বললাম, হায় দুর্ভাগ্য শিল্পী! পরাধীনতার অভিশাপে দেশের জল, স্থল, আকাশ, বাতাস ঝলকে ঝলকে তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করছে। দেশ তোমাকে চিনল না, অনাদরে দু'হাতে সরিয়ে দিল তোমার মহান্ রূপসৃষ্টি। জানল না, তুমি শুধু তাদেরই নও, সারা বিশ্বের গৌরব! প্রকাশ্যে বললাম, হ্যাঁ, ভাল দাম পেয়ে ছেড়ে দিলাম।

উদয় চুপ করে রইল। হেসে বললাম, কত দাম হল বলতো?

এবার সে হেসে ফেললে, এ ধরণের ছবি বিক্রী করায় তুমিই আমার প্রথম এজেন্ট। বাজার দাম তো ঠিক বলতে পারব না ভাই।

বললাম, এই নাও, পঁচিশ হাজার!

উদয় আশ্চর্য্য হয়ে গেল, বল কি হে! বাংলা দেশে এমন লোক আছে আমি জানতাম না! তারপর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে গাঢ় স্বরে বললে, জান অরূপ, এ টাকা হাত পেতে নিতে আমার কষ্ট হয়? কিন্তু এ ছাড়া আর উপায় ছিল না। তোমাকে কি আর বলব ভাই, কিন্তু জানতে ইচ্ছে হয় কে এই অজানা বন্ধু।

তাকে তুমি চেন না, নাম শুনে আর কি করবে? কিন্তু একটা শুভ সংবাদ আছে উদয়।

কি ?

যদি কোনদিন তুমি এ টাকা পরিশোধ করতে পার, ছবি সে ফিরিয়ে দেবে।

তাকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দিও অরূপ। তার এ মহানুভবতার ঋণ শোধ করতে পারব না জানি, কিন্তু কখনও যদি এ অর্থ সংগ্রহ করতে পারি আমি সেই মুহূর্তে ও-ছবি ফিরিয়ে নিয়ে আসব।

কৃষ্ণা সেই যে প্রথম থেকে চুপ করে বসে আছে, একটিও কথা বলে নি। চেয়ে দেখলাম উদয়ের শেষ কথা গুলির ভারে সে নুয়ে পড়েছে, মুখ তুলে চাইতে পারছে না যেন।

বাঃ! বেশ তো তোমরা! আমাকে একবার ডাকলে না দাদা ? ইন্দ্রাণী এসে কৃষ্ণার কোলের ওপর হাত রেখে বসল।

এই তো এলাম রে! উদয় হেসে ফেললে, তুই পড়াশুনো করছিস তো ?

এতক্ষণে কৃষ্ণা কথা বলবার সুযোগ পেল, একেবারেই না। আমি কতদিন বলেছি, অরূপদা রয়েছে, দেখে শুনে নে। তা আমার কথা একটুও শোনে না। বলে—

ইন্দ্রাণী কৃষ্ণার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, তোমার সব কথা শুনব কৃষ্ণাদি, কিছু বলতে হবে না তোমাকে। তারপর হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, আপনিই বলুন না, এত

ভাবনা চিন্তার মধ্যে পড়তে ভাল লাগে কারও? উদয়কে বললে, কৃষ্ণাদি কি চমৎকার রান্না করে দাদা! দাঁড়াও, তোমার জন্য কিছু নিয়ে আসছি। ইন্দ্রাণী উঠে গেল।

উদয় ডেকে বলল, ওরে শোন, শুনে যা ইন্দ্রাণী। কিন্তু ইন্দ্রাণী ততক্ষণে ওপরে চলে গেছে।

—আপনাদের বাড়ীতে ওর দেখছি দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে উদয় হেসে ফেলল।

মিনিট পাঁচেক পর, ইন্দ্রাণীর দেওয়া খাবার খেতে খেতে উদয় বললে, সত্যি, চমৎকার রাঁধেন আপনি! ওকে শিখিয়ে দেবেন তো। ওর হাতে খেয়ে শরীর নষ্ট হয়ে গেল।

সত্যি, কি যে রোগা হয়ে গেছে দাদা! ইন্দ্রাণী হাসি চেপে কোনমতে বললে।

উদয়ের অসাধারণ বলিষ্ঠ দেহের দিকে চেয়ে আমি আর কৃষ্ণা সশব্দে হেসে উঠলাম।

উদয় বলল, না, না, হাসির কথা নয়। তোর মনে নেই ইন্দ্রাণী, সেই দক্ষিণেশ্বরের গল্প? তুমি জান না অরূপ, সে প্রায় চার বছর আগের কথা। রাত ন'টার কাছাকাছি। স্থানটা অবশ্য নির্জ্জন ছিল। এক ধনী যুবক একটি তরুণীকে নিয়ে গাড়ী করে বেড়াতে এসেছিলেন। ফেরার মুখে হঠাৎ পড়ে গেলেন একেবারে নিখুঁত সাহেবি পোষাক পরা

দুটি ভদ্র গুণ্ডার হাতে। বিশ্বাস কর, দু'হাতে লোক দুটোকে একেবারে শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলেছিলাম।

চকিতে চেয়ে দেখলাম কৃষ্ণার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। আমি নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম উদয়ের দিকে।

উদয় বলে চলল, সে দিন ইচ্ছে হয়েছিল সেই ধনী যুবকটির দু'গালে দুই চড় লাগিয়ে দিয়ে তরুণীকে আমাদের বাড়ী এনে কিছুদিন আটকে রাখি। ওকি! আপনি শিউরে উঠলেন যে? এখানে ত আর সত্যি ডাকাত পড়ে নি।— বলেই সে হা হা করে হেসে উঠল।

বাপ্! হাসির কি গম্ভীর শব্দ! কোনো শক্তিশালী বিস্ফোরক যেন প্রচণ্ড শব্দে জলস্থল কাঁপিয়ে গর্জ্জন করে উঠল। চেয়ে দেখি কৃষ্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করে আছে।

ইন্দ্রাণী বললে, সেই-ই ভালো হত দাদা। মেয়েটিরও শিক্ষা হত; আর যুবকটিরও সখের বেড়ান বন্ধ হত।

উদয় হেসে ফেলল, তা নয় রে! টাকার জোরে যারা পৃথিবীকে জয় করতে চায়, এরা সেই শ্রেণীর লোক। হেরে গিয়েও এদের লজ্জা নেই।

নিজের মুখের চেহারা নিজে দেখতে পাচ্ছিলাম না সত্য, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম, নিতান্তই সন্দেহের বাইরে না হলে এতক্ষণে ধরা পড়ে যেতাম।

কৃষ্ণা আর সহ্য করতে না পেরে ধীরে ধীরে বলল, আমি যাচ্ছি অরূপদা ; তোমরা গল্প কর। উদয়কে নমস্কার করে সে কক্ষান্তরে চলে গেল।

কবে আমাকে নিয়ে যাবে দাদা ? ইন্দ্রাণী ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করল।

আর কয়েকটা দিন। প্রবীরদের বাইরে নিয়ে আসি। তারপর অবস্থা বুঝে যত শীগগির হয় নিয়ে যাব। কিন্তু এবার তুই যা দিদি। অরূপের সংগে আমার অনেক কথা আছে। আমার জন্য ভাবিস নে। আমি সুখেই আছি।

রোজ একটিবার তুমি এসো দাদা। নইলে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাই নে।—চোখে প্রায় জল এসে পড়ল ইন্দ্রাণীর। তাড়াতাড়ি সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর পর বহুক্ষণ ধরে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনা চলল। স্থির হল কোন্ এক তরুণ ব্যারিষ্টারকে প্রবীরদের কেস কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, তাকে পাঁচ হাজার ; আর বাকী বিশ হাজার টাকায় চার মাস নির্বিঘ্নে ধর্ম্মঘট চালিয়ে যাওয়া হবে। অবশ্য অর্থাগমের অন্য উপায় এর মধ্যেই খুঁজে নিতে হবে, যাতে দৈন্যের গুরুভারে নীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে না পড়ে।

আলোচনার ফাঁকে সুযোগ বুঝে উদয়কে গ্রুপ ছবির কথা বলে অবশেষে যখন বললাম, মস্ত বড় ধনী ; ছবি দেখে খুশী হলে আশাতীত পুরস্কার দিতে রাজী হয়েছেন,

তখন সে সম্মতি দিল। বললাম, তাঁরা চান এমন ছবি যা দেখে জীবন্ত মানুষ বলে ভুল না করে উপায় থাকবে না। তবে একটি অনুরোধ তাঁরা জানিয়েছেন, অবশ্য তোমার যদি অসুবিধা না হয় তবেই।

কি বল তো ?

তাঁদের ইচ্ছে তুমি এখানে বসেই ছবির কাজ শেষ কর। মেয়েটি আবার এমনি লাজুক যে তোমার ষ্টুডিওতে বসে সিটিং দিতে রাজী হচ্ছে না।

বেশ তো! এখানেই দেবেন। কিন্তু আজ আর বসব না অরূপ, এখনও ছু'একজনের সঙ্গে দেখা করা হয় নি। উদয় চলে গেল।

আমি কিন্তু একদিকে নিশ্চিন্ত হলাম উদয়ের সম্মতি পেয়ে। টাকার জন্য অন্ততঃ ভাবতে হবে না। তবু এ কথা তার স্বীকার না করে উপায় নেই, ধনতান্ত্রিক স্বৈরাচারের অবসান ঘটাতে হলে যে বস্তুর প্রয়োজন সকলের ওপরে, তা অপরিমেয় অর্থ নয় ; নীতির জন্য, ন্যায়ের জন্য অক্লান্ত নির্ভীক সংগ্রামের মৃত্যুপণ প্রতিজ্ঞা ! তাই সে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল আয়োজনহীন এই কঠিন সংঘাত !

(১০)

অনেক বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে প্রথমেই চোখে পড়ল টিপয়ের ওপরে ডাক ঘরের শীলমোহর করা একখানা বড়

খামের চিঠি, আমারই উদ্দেশ্যে লেখা। হাতে নিয়ে দেখলাম সাঁওতাল পরগণা থেকে এসেছে। বুকটা ধক্ করে উঠল! কি জানি, কি সংবাদ লিখেছে রাজেশ্বর! তাড়াতাড়ি চোখে মুখে জল দিয়ে গজাননের মারফৎ কৃষ্ণার কাছে চায়ের ফরমাস পাঠিয়ে পত্রখানি চোখের সম্মুখে খুলে ধরলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠি; কিন্তু গুরুত্বে নিরেট পাথরের মত ভারী।

সদলবলে সেখানে পৌঁছে পাহাড় কাটার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রাজেশ্বর যা কিছু করেছে, পত্রের প্রথমাংশে অতি অল্প কথায় তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে পরে লিখেছে, "আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা কোন কাজেই এল না বাবু! এরা যে এমন হিংস্র, আগে থেকে জানা থাকলে এ কাজে হাত দিতাম না। প্রথম যেদিন আমার লোক কাজ স্মুরু করে, ওরা প্রতিবাদ জানিয়ে যায়। বেশী নয়, সংখ্যায় তারা মাত্র পাঁচ জন ছিল। আমি গ্রাহ্য করি নি তাদের অন্যায় আব্দার। কে তারা? আমার সাথে কিই বা সম্বন্ধ? তাদের দিয়ে কাজ করাই নি, সে আমার খুশী। এর পরে তারা চলে গেল। কিন্তু যাবার আগে আমাকে উপদেশ দিয়ে গেল, তাদের সঙ্গে রফা না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কাজ বন্ধ রাখা হয়। কে জানত বাবু এর পরিণাম এমন শোচনীয় হবে!

পরদিন বেলা ন'টার সময় আমার পঁচিশজন মজুরকে রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান অবস্থায় তাঁবুতে নিয়ে এলাম।"

পড়া থামিয়ে তু'হাতে মাথার রগ টিপে ধরলাম। উঃ! সমস্ত শিরাগুলো একটা আচম্‌কা হ্যাঁচকা টানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যেন। চোখ বুঁজে স্থির হয়ে রইলাম ক্ষণকাল। ব্যাপার যে এমন মারাত্মক অবস্থায় এসে পৌঁছাতে পারে এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

বাবু! চা এনেছি।—

দিদিমণিকে একবার ডেকে দিও ত গজানন! চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে বললাম।

পত্রের শেষটুকু পড়া হয় নি এখনও। চোখ পড়ল একেবারে ঠিক যায়গাটিতে। ···"তা আঘাত যখন পেয়েছি, আমিও ছেড়ে কথা কইব না বাবু! দরকার হয় পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করব, কিন্তু পাথর কাটা মজুরের হাতে মার খেয়ে পালিয়ে আসতে পারব না। আপনার মান রক্ষার ভার আমার; শুধু হুকুমের অপেক্ষায় রইলাম।"

সর্ব্বনাশ! এর সঙ্গে বেয়নেট আর বেপরোয়া গুলির যোগাযোগ ঘটলে আর রক্ষা থাকবে না। বাংলার ভিজে মাটিতে পরিপুষ্ট গুণধরকে ভয় করিনে সত্য, কিন্তু কালো পাথরে তৈরী ঐ সব পর্ব্বতচারী,···ওরা বন্য শার্দ্দূলের মতই ভয়ঙ্কর! রক্তের দাগ ওরা রক্ত দিয়েই ধুয়ে ফেলে! এর মাঝামাঝি কোন পথ ওদের জানা নেই।

—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? ইন্দ্রাণী এসে ধীরে ধীরে কাছে দাঁড়াল।

তোমাকে ডেকেছি ?

হ্যাঁ, তাইত বললে।

হেসে বললাম, বেটা কৈবর্ত্ত, মূর্খের শিরোমণি। বলেছি দিদিমণিকে ডেকে দিও ; তা তোমাকে ডেকে আনলে কেন ?

ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে বললে, তাই ত ! গজাননকে জিগ্যেস করব কথাটা ! কিন্তু আপনার অনুমান ঠিক উল্টো হতেও পারে !

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ, আসলে ও ধূর্ত্তের একশেষ। হয়তো বখ্‌শিসের লোভে ইচ্ছে করেই এক আধটু ভুল করে বসে।—বলেই ইন্দ্রাণী হেসে ছুটে পালিয়ে গেল। মনে হল কান ছ'টো আমার অস্বাভাবিক গরম হয়ে উঠেছে। ভুল হবার মত অস্পষ্ট ইঙ্গিত তো এ নয় ? কিন্তু আমার দিক থেকে আজওতো মুহূর্ত্তের জন্যও সংযমের অভাব ঘটে নি ! তবে কি এ ? শুধুই পরিহাস ? কিম্বা··

··—এত বেলায় না খেয়ে যেন কোথাও বেরোবেন না,··—চেয়ে দেখি ইন্দ্রাণী আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু এবারে তার মুখের চেহারা একেবারে নিরীহ লক্ষ্মী মেয়েটির মত।

বললাম, আবার ফিরে এলে যে ?

—কৃষ্ণাদির হয়ে কথাটা জানিয়ে গেলাম। দাঁতে ঠোঁট চেপে মুহূর্ত্তকাল আনত দৃষ্টিতে স্থির হয়ে থেকে ইন্দ্রাণী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথাটা সত্য; বেলা কম হয় নি। রাজেশ্বরর চিঠিখানা তখনও হাতের মুঠোয় ছিল। যত্ন করে বই-য়ের ভাঁজে রেখে দিয়ে উঠে পড়লাম।

স্নানাহার শেষ করে আদালতে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রবীরদের কেস্ সুরু হয়েছে। পাবলিক প্রসিকিউটর ঝাঁঝালো গলায় বক্তৃতা দিয়ে আর বাছা বাছা বিশেষণ লাগিয়ে আসামীদের রাজদ্রোহীতা প্রমাণের চেষ্টা করে বসে পড়লেন।

এবার উঠে দাঁড়ালেন আসামীদের তরফ থেকে এক তরুণ ব্যারিষ্টার। দেখলাম শুধু সাজ সজ্জাতেই নয়, কথার মধ্যেও তার যথেষ্ট মুনশীয়ানার ছাপ রয়েছে। অতি সাবধানে যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার করে সরকারী উকিলের প্রতিটি সিদ্ধান্ত খণ্ডন করলেন; কেবল প্রধান আসামী প্রবীরের বেলায় ওকালতিটা তেমন জোরাল হল না। ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীর মুখে বিচার-কক্ষ পরিত্যাগ করলেন।

ডাক ঘরে জরুরী কাজ ছিল, ফিরতে বেলা শেষ হয়ে গেল। মনে তিলমাত্র স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। চারিদিক থেকেই যেন বিশৃঙ্খলা শুরু হয়েছে।

বাড়ী এসে কোনমতে জামা-কাপড় ছেড়ে একেবারে স্নানের ঘরে চলে এলাম। প্রায় দশ মিনিট পর স্নান সেরে যখন ঘরে এসে বসেছি তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে। মাথাটা এমন হাল্কা বোধ হল যেন কোন কিছু

ঠিক করে ভাববার সামর্থ্য নেই। সটান শুয়ে পড়লাম বড় ঈজিচেয়ার খানার ওপরে। ক্লান্ত চোখ আপনা থেকে কখন বুঁজে এলো।

অরূপদা, অরূপদা!—বাপ্ রে! কি যে ঘুমোতে পার!

কৃষ্ণার ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু চোখের পাতা এমনি ভারী হয়ে আছে যে চাইতে পারছি না। চোখ বুঁজেই বললাম, চা এনেছিস্?

এনেছি, কিন্তু ও বোধহয় আর খাবার মত নেই!

আড়মোড়া ভেঙ্গে সোজা হয়ে বসলাম; বললাম, কৈ, দে। কৃষ্ণা চা'য়ের কাপ এগিয়ে দিল। বললাম, মনটা ভাল নেই রে কৃষ্ণা। কি হবে বুঝতে পারছি না!

—কিসের কি হবে অরূপদা? কৃষ্ণা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

—কিসের নয় দিদি? শুভ লক্ষণ তো কোথাও দেখছি না। আচ্ছা, ইন্দ্রাণীকে তুই বলেছিস্ কোন কথা? মানে পাথর কাটার ব্যাপার?

না! কিন্তু হঠাৎ এ কথা বলছ কেন?

কৃষ্ণার প্রশ্নের উত্তরে রাজেশ্বরের পত্রের কথা এক এক করে বলে অবশেষে বললাম, আমার ইচ্ছে নয় উদয় বা ইন্দ্রাণী একথা জানতে পারে। কেন, বুঝতে পেরেছিস ত?

মুখখানা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল কৃষ্ণার। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে জানাল সে বুঝেছে। কিছুকাল

চুপ করে থেকে বলল, একি হল অরূপদা? মাটির মত শান্ত মানুষ ওরা; মুখ তুলে কথা কয় নি কোন দিন... ওরাই করলে রক্তপাত?

বললাম, রাজেশ্বরকে তারে সংবাদ পাঠিয়েছি, আমাদের দ্বিতীয় নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে যেন কোন কাজে হাত না দেয়।

কৃষ্ণা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। ধীরে ধীরে বললাম, আজ সারা দিন চিন্তা করেও কিছু স্থির করতে পারি নি। অথচ ঘটনা এমন যায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে দেরী করার সময় নেই। কাল্ সকালেই তাকে স্পষ্ট মতামত জানাতে হবে। তাই ভাবছি রাজেশ্বরকে তার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে এবারের মত কাজ বন্ধ করে দেব।

কথা শেষ করে কৃষ্ণার মুখের দিক চাইতেই কিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। ক্ষণকাল পূর্ব্বের সে অসহায় দৃষ্টি তার চোখ থেকে যেন মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তর্হিত হয়েছে। অথচ মনের কথাও তার অনুমান করবার সাধ্য নেই। বললাম, কৈ রে! উত্তর দিলি নে?

পূর্ব্ববৎ বাইরের অন্ধকার আকাশের পানে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কৃষ্ণা মৃদু কঠিন কণ্ঠে বললে, এ তো মজুরদের রক্ত নয় অরূপদা! তাদের ওরা আঘাত করে নি; আঘাত করেছে আমার বাবা অযুতাশ্ম চৌধুরীকে। তিনি

বেঁচে নেই সত্য, কিন্তু তার কৃষ্ণা আজও মরে নি! উত্তেজনায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, তুই কি বলতে চাস বোন?

সহসা ঘুরে দাঁড়াল কৃষ্ণা: ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, কোনদিন তোমার কাছে জোর করে কিছু চাই নি; কিন্তু আজ তোমাকে একটা অনুরোধ করব। যেখানটায় ছিল আমার সব চেয়ে বড় বাধা, অলঙ্ঘ্য সঙ্কোচ, সে ওরা নিজেদের নির্ব্বোধ ঔদ্ধত্যে কাটিয়ে দিয়েছে। যদি পথেও দাঁড়াতে হয়, আমি পিছিয়ে আসব না। আর আমার কোন দ্বিধা নেই অরূপদা। তোমার ত্'টি পায়ে পড়ি। এ কথাটা আমার রাখতেই হবে। কালই তুমি আদেশ পাঠিয়ে দাও, রাজেশ্বরের লোক নির্ভয়ে কাজ আরম্ভ করুক। প্রয়োজন হলে এ বিদ্রোহ দমন করতে তুমি চরম শক্তি প্রয়োগ করবে।

নিজের কান ত্'টোকে যেন বিশ্বাস হল না। এই কৃষ্ণাই আমাকে বারংবার আকুল মিনতি জানিয়েছে যাতে এই সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া যায়, অথচ আমি তখন রাজী হই নি। আর আজ ঘটনা যখন এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে গড়িয়ে আসছে: আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিদ্যা-বুদ্ধি দিয়েও যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে নিঃসংশয় হতে পারছি না, তখন সেই এক ফোঁটা ভীরু মেয়ে কৃষ্ণাই সামনে এগিয়ে এলো অকুণ্ঠ শক্তির সহজ মীমাংসা নিয়ে।

কেমন করে এ সম্ভব হল ভেবে পেলাম না। ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের মাঝখান থেকে। বললাম, তাই তো! তুই যে ভাবিয়ে দিলি দিদি! দুহাতে কাণের পাশ দুটো টিপে ধরে চুপ করে বসে রইলাম।

—শরীর কি তোমার ভাল নেই অরূপদা? কৃষ্ণার মুখের চেহারা এক নিমিষেই বদলে গেল। একেবারে স্নেহময়ী মায়ের যায়গায় নেমে এল সে। মাথার কাছে এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, শরীরের অপরাধ কি? একটানা ছ'মাস ধরে যে খাটুনি চলছে!

হেসে ফেললাম, তোর মত যার দিদি রয়েছে তার আবার শরীরের ভাবনা কি? তা নয় রে, শরীর আমার ভালই আছে। তবে...

তবে কি?—বলবে না আমাকে? কৃষ্ণা আমার পাশে এসে বসল।

—তোর অনুরোধের কথাই ভাবছি!

কৃষ্ণা চুপ করে রইল। পরে অতি শান্তকণ্ঠে বলল, আমার ওপর রাগ কর না অরূপদা। শুধু এই একটিবার আমার অনুরোধ রাখ। বাবা কি রেখে গেছেন আমি জানতেও চাই নে, ওর পরে লোভও নেই। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে বাবার অসম্মান হবে এ আমি সইতে পারি না। কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল।

—অরূপ ? এই যে আপনিও রয়েছেন ! নমস্কার ! উদয় দীর্ঘ পদক্ষেপে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

নমস্কার ! একমুহূর্ত অপেক্ষা করে কৃষ্ণা সলজ্জ হাসে বললে, চা খাবেন নিশ্চয়ই। এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি ইন্দ্রাণীকে দিয়ে।

উদয় বলল, চা খাব না। আপনি বসুন, কথা আছে।

আমার সাথে ? —কৃষ্ণা সসঙ্কোচে প্রশ্ন করলে।

—ঠিক আপনার সাথে নয়। কিন্তু আপনার পালিয়ে যাবার দরকার নেই। চাপা হাসিতে উদয়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

বাঃ! পালিয়ে যাব কেন ? বেশ ত! অরূপদা, ইন্দ্রাণী বলেছিল তাকে ডেকে আনতে, নইলে ভয়ানক রেগে যাবে। তাকে ডেকে আনি,—

কৃষ্ণা সবে দু'য়েক পা অগ্রসর হয়েছে, উদয় হা হা করে হেসে উঠল। তার আকস্মিক হাসির ধাক্কায় চমকে উঠে বললাম, কি, কি হল উদয় ?

কৃষ্ণা যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। উদয় কৃষ্ণাকে দেখিয়ে বললে, ওঁর কথা মনে করেই হাসি পেল। আমাকে উনি বোধহয় সহ্য করতে পারেন না। তাই যখনই আসি কোনো একটা কাজের ছল করে—

—ছিঃ, ছিঃ! কি যে বলেন আপনি! এ কখনও সত্যি নয়! বেশ ডাকব না ওকে। শেষে রাগ করলে আমার দোষ

দেবেন না যেন। কৃষ্ণা এগিয়ে এলো। উদয় ব্যস্ত হয়ে বলল, আপনি দেখছি ইন্দ্রাণীর মতই ছেলেমানুষ!

বললাম, শুধু তাই? রেগে গেলে আবার এমনি মুখ বন্ধ করবে যে কারও সাধ্য নেই কথা বলায়।

কৃষ্ণা কোন কথার জবাব দিল না, পায়ের নখ দিয়ে প্রাণপণে আঁচড় কাটতে লাগল নরম গালিচার ওপর।

উদয় গম্ভীর হয়ে বলল, দেখুন, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আপনি ইন্দ্রাণীকে ডেকে দিন।

—দিই, কৃষ্ণা ধীরে ধীরে চলে গেল।

ইন্দ্রাণী এসেই দাদার কোল ঘেঁসে বসল। উদয় আদর করে তার গায় মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, পড়াশুনো করছিস্ তো? অরূপ, তুমি একটু দেখো তো। ভাগ্য-গুণে যখন এসেই পড়েছে, একটা কাজ অন্ততঃ এগিয়ে থাক্। একে তো সময় পাইনে, তা ছাড়া...

ইন্দ্রাণী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, পড়তেও চাইনে তোমার কাছে।. সাহিত্য পড়াতে গিয়ে কখন শিবিপিথিকাসের মুখোমুখি ফেলে দেবে, আবার হয়ত ঝাঁ করে কান ধরে টেনে আনবে বলডুইন-চার্চিলের আসরে, ও আমার কাজ নয় দাদা।

তার কথার ধরণে তুজনেই হেসে উঠলাম। ইন্দ্রাণী গম্ভীর হয়ে বলল, হাসির কথা নয়। জানেন ত দাদা পর

পর পাঁচ ছটা ডিগ্রি নিয়ে হঠাৎ একদিন সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করল? সেই থেকে—

তুই থামতো ডেঁপো মেয়ে! বিশ্বাস কর অরূপ, ও যা কিছু শিখেছিলাম একেবারে ক্লীন্ ব্রাশ্ড্। যাকে বলে ধুয়ে মুছে যাওয়া তাই!

—সর্ব্বনাশ! আপনি এতগুলো সাবজেক্টে ডিগ্রি নিয়েছেন নাকি? চেয়ে দেখি কৃষ্ণা গজাননের হাতে কিছু খাবার আর স্বয়ং দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকছে।

উদয় হঠাৎ এ অভিযোগের কৈফিয়ৎ খুঁজে না পেয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে রইল হাসিমুখে।

তারপর হেসে বলল, জানেন তো, কাজ না থাকলে অকাজ বাড়ে? আমার অবস্থা ঠিক তাই। আর—ইন্দ্রাণীর মাথাটা আদর করে নাড়িয়ে দিয়ে বললে, এ মেয়েটার কথায় কান দেবেন না। ওর ধারণা ওর দাদা অদ্বিতীয় পণ্ডিত; হ্যাঁ রে, তোর দাদার আরো কি কি গুণ আছে শুনিয়ে দে না!

চেয়ে দেখি ইন্দ্রাণী রাগে মুখ ফুলিয়ে আছে। উদয়ের হাতে একখানা বই ছিল। একবার ইন্দ্রাণীর দিকে চেয়ে বইখানা তার হাতে দিয়ে বললে, এই নে ঝগড়ুটে মেয়ে। তোর জন্য আজ সকালে এনে রেখেছিলাম।

বইখানা হাতে নিয়ে নামের ওপর চোখ বলাতেই ইন্দ্রাণীর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, কবে বেরিয়েছে দাদা? আজই?

কৃষ্ণা ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে বই-এর নাম আর গ্রন্থকারের পরিচয় দেখে নিল।

উদয় বললে, তোমার জন্যও এক কপি এনেছি অরূপ। নাম দেখলাম "সংগ্রাম কোন পথে," লেখক উদয়ভানু।

বললাম—বইয়ের কথা তো একদিনও বল নি? এটা নিশ্চয়ই প্রথম বই নয়? উদয় কিছু বলবার আগেই ইন্দ্রাণীর মুখে শব্দের বান ডেকে গেল, বাঃ! আপনি দেখছি কিচ্ছু জানেন না! এই নিয়ে দশখানা হল, না দাদা?

কেন, নামও শোনেন নি কোনদিন?—অগ্নিশিখা, কল্পান্ত ইন্দ্রজাল, সোনার পৃথিবী?......

কিন্তু সে তো শ্রীকণ্ঠ কি এমনি একটা নাম…!

হ্যাঁ, ঐ নামেই ওগুলো বেরিয়েছে। শুনেছি দাদা দেখতে শ্রীকণ্ঠের মত বলে মা আদর করে ও নামটি রেখেছিলেন। কিন্তু বাবার পছন্দ হল না, তাই নাম হল উদয়ভানু। বাবা বলতেন—

—আঃ! তুই থামত ইন্দ্রাণী? দেখতো কত রাত হল? উদয় স্নেহের স্বরে তিরস্কার করল তাকে। উদয়ের

কথায় সচকিত হয়ে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত দশটার কাছাকাছি।

ইন্দ্রাণী লজ্জা পেল বোধহয়; বলল, রাগ কর না দাদা, আমার সত্যি খেয়াল ছিল না। চল কৃষ্ণাদি, আমরা ওঘরে যাই। কৃষ্ণার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে যেন কি একটা কঠিন আঘাত পেয়েছে। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে; আর তার পিছনে ইন্দ্রাণী। ওরা চলে যেতেই উদয় বললে, অরূপ, আমার এমন অনেক কথাই তুমি জান না যা তোমার জানা উচিত। একদিন তুমি জানতে চেয়েছিলে আমি কম্যুনিস্ট কিনা। তার উত্তরে দু'এক কথা যা বলেছিলাম নিশ্চই ভোলো নি?

—না। সব কথাই আমার মনে আছে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললাম, উদয়, তুমি তো অনেক দেখেছ, অনেক পড়েছ। একটা কথার উত্তর দিতে পার?

কি, বল?

এই যে মজুরদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে দিকে দিকে, এর পরিণাম কি? ধরে নেওয়া যাক্, রাজা আর প্রজার বিভেদ ঘুচে গেল, ধনী দরিদ্র বলে কোন স্তর বৈষম্য রইল না; আজ যারা শ্রমের মূল্যে কোনমতে বেঁচে আছে এদের সকলের হাতে যোগ্যতা অনুযায়ী শাসন ক্ষমতা এসে পড়ল। কিন্তু তারপর? এতেই কি বিরোধের অবসান হবে বলে তুমি বিশ্বাস কর?

—না। তার কারণ কোন মতবাদই সম্পূর্ণ নয়। তা সে ডিমক্রাসিই হোক আর কম্যুনিজম্ই হোক। যুগাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ সুবিধার দিকে নজর রেখে নূতন আদর্শের উদ্ভব করেন যাঁরা চিন্তাশীল, যাঁরা দরদী ; নীতির চেয়ে মানুষ যাঁদের কাছে বড়। পুরাতনকে আঘাত করতে তাই তাঁরা নির্ম্মম। দুঃখী মানুষ বড় আশায় ছুটে যায় নূতনের আকর্ষণে ; সারা পৃথিবীতে শুরু হয় তার একস্‌-পেরিমেণ্ট্‌! অরূপ, রাজনীতির মধ্যে আর যা কিছুই থাক স্বস্তির স্থান নেই।

—তা হলে……

উদয় হেসে বললে, এই তা হলেটাই আসল প্রশ্ন! শুধু তোমার আমারই নয়, সর্ব্বকালের...সর্ব্বলোকের। এর জবাব আজো পর্য্যন্ত কেউ দিয়ে যেতে পারেন নি ; বোধহয় পারা সম্ভবও নয়। পরিবর্ত্তনকে স্বীকার করে নিলে কোন সত্যকেই শাশ্বত বলে মেনে নেওয়া চলে না। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় এদের কোন বাঁধা ধরা সংজ্ঞা আছে বলে আমি বিশ্বাস করি নে ; যুগে যুগে এরাও রূপান্তর মেনে নেয়। ভালো যখন মেলে মানুষ তাকে পশ্চাতে ফেলে যায়, ও নিয়ে মন ওঠে না আর। খুঁজে মরে কোথায় আছে ভালোতর। আবার শুরু হয় তার যাযাবর জীবন যাত্রা। কোন ভালোর মোহেই এ এক যায়গায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না।

উদয় নীরব হয়ে রইল। তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করতে গিয়ে নিবিড় মেঘাচ্ছন্ন আকাশ চোখে পড়ল। ও আকাশ যেন স্বার্থ-ক্লিন্ন মানব-মনের প্রতীক। ওই মেঘ, ওই অখণ্ড আঁধারের ঘনঘটা! ওর পরমায়ু কতটুকু? স্বভাবের নিয়মে আসবে ঝড়, টুকরো টুকরো করে ওর সর্ব্বাঙ্গ ছিঁড়ে খুঁড়ে উড়িয়ে দেবে অনন্ত আকাশে; হয়ত বা শুরু হবে প্রবল ধারাবর্ষণ। নীল আকাশ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে। কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে মানুষ মনের গায়ে যে কালি মাখিয়েছে, যে বিষের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করেছে সমাজ আর তার কল্যাণের সম্ভাবনা, সে কালি মুছে যাবে কিসে? কি জানি? উদয় হয়ত এর জবাব দিতে পারে।

ছোট বাবু,—

মুখ না ফিরিয়েই উত্তর দিলাম, আজ আমার খেতে দেরী হবে।

—আজ্ঞে তা নয়! একজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে?

হঠাৎ কি একটা কথা মনে পড়ে গেল এমনি ভাবে উদয় বললে, ও আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। আচ্ছা, চললাম ভাই।

সঙ্গে সঙ্গে আজ আর এগিয়ে গেলাম না। মনে হল ঐ আগন্তুকের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া ওর

ইচ্ছে নয়! উদয় চলে যাবার মিনিটখানেকের মধ্যেই ইন্দ্রাণী এসে বললে, দাদা চলে গেল? আমার ভারী দরকার ছিল যে!

বললাম, তাইতো......

কাল আসবে নিশ্চয়ই?

হেসে ফেললাম। ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, হাসছেন যে?

কি করি বল? অন্ধকে পথ দেখিয়ে দিতে বলা, আর তোমার দাদাটির চলাফেরার সন্ধান রাখতে যাওয়া, দু'টোই সমান অর্থহীন। জবাব দেবার প্রয়োজন না হলে হয় হাসবে না হয় শুনতেই পাবে না; এতো তুমিই ভালো জানো ইন্দ্রাণী।

দাদাকে আপনি চিনেছেন দেখছি, বলেই ইন্দ্রাণী হাসি মুখে অন্যত্র চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। প্রায় পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কাটল। শুধু প্রকাণ্ড দেওয়াল ঘড়িটা অবিশ্রান্ত বেজে চলেছে। হঠাৎ ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করল, একটা সত্যি কথা বলবেন? ওর আয়ত চোখের দৃষ্টি আমার চোখের ওপর স্থির হয়ে আছে। ঈষৎ স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে একটি স্নিগ্ধ মৃদু হাসির রেখা যা আর কোথাও কোন দিন আমার চোখে পড়েনি।

বললাম, জিগ্যেস করেই দেখ না।

ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত্ত নীরবে আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, তখন দুপুরবেলা আমার কথায় রাগ করেছিলেন কেন? বলে ফেলেই আরক্তমুখে মাথা নিচু করল।

চোখের পলকে মনে পড়ল ইন্দ্রাণীর সেই হাসি, সেই ত্রস্তপদে ছুটে পালিয়ে যাওয়া।

বললাম, অমন মিথ্যে কথা শুনলে তোমার রাগ হয় না? ছদ্ম গাম্ভীর্য্যের আবরণ টেনে দিলাম চোখের দৃষ্টিতে আর কণ্ঠস্বরে।

ইন্দ্রাণীর মুখ থেকে সহসা হাসি মিলিয়ে গেল; বিস্মিত ব্যথিত কণ্ঠে বলল, মিথ্যে! আমি মিথ্যে বলেছি আপনার কাছে? কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে থেকে শেষে বলল, তা হবে।—

বললাম, হবে নয় নিশ্চয়ই তাই; এ-আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলতে পারি। আচ্ছা, তুমিই বলতো খেয়ে বেরোবার তাগিদটা তোমারই নিজের ছিল কিনা?

ইন্দ্রাণী হঠাৎ হেসে ফেলল, উঃ! কি সাঙ্ঘাতিক ছেলে আপনি! বলেই চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছিটিয়ে দিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে গেল।

ডেকে বললাম, শোনো, শুনে যাও ইন্দ্রাণী,—

ইন্দ্রাণী ফিরে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলল কি?

—কাছে না এলে বলব না।

—তবে থাক্! আমি শুনতে চাই নে। বলেই মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা না করে একবার আমার দিকে চেয়েই ইন্দ্রাণী চলে গেল।

পরমুহূর্ত্তেই বিষম সঙ্কোচ অনুভব করলাম।

ছিঃ, ছিঃ! এমন করে আমি যে নিজেকে উন্মুক্ত করে দিতে পারি একমুহূর্ত্ত আগেও একথা আমার জানা ছিল না। ইন্দ্রাণী হয়ত কত কি মনে করেছে! মনে মনে শপথ করলাম, এরপর তার সঙ্গে অত্যন্ত সাবধানে কথা বলব; আমার কোন আচরণে যেন এতটুকু অসংযমের ছোঁয়া না লাগে কোনদিন।

আজও স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের সেই শপথের পিছনে কি অপরিসীম তৃপ্তি লুকান ছিল। মনে আছে, সেদিন নিশীথপ্রায় স্তব্ধ রাত্রির আরক্তিম পটভূমিকায় ইন্দ্রাণীর অতি কাছাকাছি, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কি এক নিবিড় মধুময় স্বপ্ন-সাগরের তলায় তলিয়ে গিয়েছিলাম।

১১

নানা গোলযোগের মধ্য দিয়ে আরও কিছুদিন কেটে গেছে। স্বর্গগত অযুতাশ্ম চৌধুরীর উত্তুঙ্গ বংশগৌরব চোখের সম্মুখে রেখে কৃষ্ণার অনুরোধ আমাকে রক্ষা করতে হয়েছে। প্রায় তিন সপ্তাহকাল শেষ হল, আমার কড়া

হুকুম আর প্রয়োজন হলে সর্ব্বপ্রকার শক্তিসরবরাহের আশ্বাস পেয়ে রাজেশ্বর লোকজন নিয়ে পূর্ণোদ্যমে পাথর কাটার কাজ সুরু করেছে। বাধা যে কিছুই আসে নি এমন নয়, তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নি। রীতিমত পুলিশ-পাহারায় ষ্টোন্‌ফিল্ডের আবহাওয়া উত্তপ্ত হলেও অশান্ত নয়। অথচ হিংস্র বাঘ হয়ত নিঃশব্দে ওত পেতে আছে সুযোগের অপেক্ষায়, এ আশঙ্কাও ছিল প্রচুর। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে এক একটি করে তাই দিন গুণছি।

এদিকে প্রবীর ছাড়া অন্য সকলেই ছাড়া পেয়েছে। তার সাজা হল তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস।

কিন্তু সব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, অদ্ভুত করিতকর্ম্মা প্রতিভাবান বাঙ্গালী পুলিশের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও আজও উদয়ভানু কারা-প্রাচীরের বাইরে। অনেক চেষ্টা করেও এই ষড়যন্ত্রে তাকে জড়ান সম্ভব হয় নি।

কিন্তু বিপদ যে তা বলে সম্পূর্ণই কেটে গেছে তা নয়। শ্যামসুন্দর বাবুর জুটমিলের রুদ্ধ লোহদ্বার আজও উন্মোচিত হয় নি। বন্দুকধারী সিপাইয়ের কড়া পাহারায় অবরুদ্ধ কারখানার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ক'ইঞ্চি পরিমাণ ধুলো জমে আছে অনুমান করা দুঃসাধ্য।

ওয়াটারলু ষ্ট্রীট্ ধরে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সেণ্ট্রাল এভিনিউর দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রাস্তার পাশে দাঁড়ান একখানা ছাই-রংয়ের ষ্টুডিবেকার চোখে পড়তেই দেখি

একটি নকল সাহেব এক ইঙ্গ-ভারতীয় তরুণীর হাত ধরে গাড়ীতে উঠে বসল। চোখের পলকে ড্রাইভার গাড়ী ছুটিয়ে দিল। সাহেবের চোখে গাঢ় কাল রংয়ের চশমা, মুখখানা পরিচিত বলে মনে হল। অথচ চিন্তা করেও কারও নাম মনে এল না। পথে কাজ ছিল; শেষ হতে সন্ধ্যা প্রায় সাতটা বেজে গেল। সারাদিন বিশ্রাম পাই নি। ভাবছি বাড়ী ফিরে যাব। কিন্তু ঐ ভাবার বেশী আর হয়ে উঠল না। কেন, তাই বলি। ট্রামের ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে আছি। সামনেই নেমে যাব। সহসা পিছন থেকে ডাক শুনলাম, মিষ্টার ব্যানার্জ্জি!

চেয়ে দেখি ইঞ্জিনিয়ার অরুণ। পরিষ্কার ঝক্ ঝকে স্যুট্ পরা। অস্বচ্ছ চোখে কেমন একটা খাপছাড়া শ্রান্ত দৃষ্টি। বললাম, নমস্কার! ভাল আছেন ত?

অরুণ অল্প হেসে আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল; বলল, খুব ব্যস্ত আছেন নাকি? চলুন না, মিস্ চাটার্জ্জীর ওখান থেকে ঘুরে আসবেন।

ট্রাম ষ্টপে এসে দাঁড়াতে দু'জনেই নেমে পড়লাম। বললাম, রাত হয়ে এল, আজ আর যাব না অরুণ বাবু।

কি ব্যাপার বলুন ত? আসা যাওয়া একদম বন্ধ করলেন। ইভা সে দিন বলছিলেন আপনাদের কথা। আচ্ছা, আপনার সেই বান্ধবী, তাকেত আর নিয়ে এলেন না?

বান্ধবী ?—বলেই তার দিকে চেয়ে একেবারে চমকে উঠলাম। দেখি ঘণ্টা কয়েক আগে দেখা সেই নকল সাহেব, চোখে সেই কালো চশমা। এবার আর বুঝতে বাকী রইল না, এই অরুণই ষ্টুডিবেকার হাঁকিয়ে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রূপসীকে নিয়ে সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়েছিল।

অরুণ বললে, মিস্ চাটার্জ্জীর জন্মদিনে যাকে সঙ্গে এনেছিলেন—

ওঃ! কৃষ্ণার কথা বলছেন ? সে আমার বোন।

তাই নাকি ? আমি একটু অন্য রকম শুনেছিলাম! এনি ওয়ে,—

কথাটা সে এমন ভাবে শেষ করলে যে রাগে ও ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে উঠল। প্রথম দিন থেকেই এই লোকটার যে পরিচয় পেয়েছি, আর আজ যা চোখে পড়ল তাতে এর বেশী তার কাছ থেকে আশা করা যায় না। সুতরাং এ নিয়ে কথা বলতে প্রবৃত্তি হল না। বললাম, ওঁরা সব ভাল আছেন ? শ্যামসুন্দর বাবু, তাঁর মেয়ে ?···

নাঃ! সেই জন্যই ত যাওয়া! মিষ্টার চাটার্জ্জি ব্লাড্-প্রেশারে ভুগছিলেন প্রায় চার বছর। মিলের গোলযোগ শুরু হতে সেটা ভয়ানক বেড়ে যায়। এখন একেবারেই শয্যাশায়ী।

চলুন তা হলে, একবার দেখেই আসি।

কথা বলতে বলতে সাত আট মিনিটের মধ্যেই চাটার্জ্জি লজ-য়ে এসে পড়লাম। রোগীর শয্যাপার্শ্বে গিয়ে মনে

হল অবস্থা তেমন উদ্বেগজনক নয় ; তবে সেরে উঠতে কিছু দেরী হবে। ইভা ঘরে নেই। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স কি একটা ওষুধ তৈরী করছিল ; আমাদের দেখে মিহি গলায় অভ্যর্থনা জানাল, গুড্ ইভিনিং !

গুড্ ইভিনিং ! গুড্ ইভিনিং ! অরুণ পূরো সাহেবী কায়দায় এগিয়ে গিয়ে রিপোর্ট-বুকের খোলা পাতার ওপর মুহূর্ত্তে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, গেটিং ওয়েল ?—

—ইয়েস্ স্যার !

শ্যামসুন্দর বাবুর বোধকরি তন্দ্রা এসেছিল।

চোখ খুলে বললেন, বস তোমরা। আজ একটু ভালই আছি। তারপর অরুণের দিকে চেয়ে বললেন, ইভা ? সে কোথায় ?

আছে নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও! অরুণ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দিল।

—না, না, এ অন্যায় ! তোমরা এসেছ ; কোথায় সে নিজে এসে তোমাদের নিয়ে—নাঃ ! এ ভারি— তুমি দেখত অরুণ। কিন্তু অরুণকে দেখতে হল না। পিছন থেকে ইভার গলা শোনা গেল।

নমস্কার ! কখন এলেন অরূপ বাবু ? কৃষ্ণার খবর কি বলুন ত ? তারপর শ্যামসুন্দর বাবুর কাছে এগিয়ে এসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে, আজ তুমি

অনেক ভাল আছ বাবা। চুপ করে ঘুমোও। আমরা বরং পাশের ঘরে যাচ্ছি।

—যা, মা, আমার জন্য ভাবিসনে।

আমি ছাড়া যে আরও একজন অতিথি ঘরে উপস্থিত আছে ইভা যেন দেখতে পায়নি, এমনি ভাবে বললে, আসুন অরূপ বাবু।

অরুণের ওপর ইভার মনোভাব জানতাম; তথাপি আমারই সম্মুখে তাকে এমন ভাবে উপেক্ষা করায় আমি যথেষ্ট লজ্জা অনুভব করলাম। চেয়ে দেখি অরুণের মুখ লাল হয়ে উঠেছে; লজ্জায় অথবা রাগে, ঠিক বোঝা গেল না। ইভার অনুসরণ করে পাশের ঘরে চলে এলাম। আমাকে সোফায় বসিয়ে, স্বয়ং একখানা চেয়ারে বসে পড়ে ইভা বললে, কৃষ্ণাকে নিয়ে এলেন না যে? ও ভাল আছে ত?

হ্যাঁ, ভালোই আছে।

আমার ওপর ও রাগ করেছে, জানেন? অনেক দিন আগে ওর ভালর জন্যই ওকে কটা কথা লিখেছিলাম; তা আমাকে ও ভুল বুঝল।

কৃষ্ণার কাছে লেখা চিঠির কথা মনে পড়ল; কিন্তু মুখে যথাসাধ্য নিরীহ ভাব ফুটিয়ে তুলে হেসে বললাম, অসম্ভব নয়। তবে মুস্কিল হল মেয়েদের এসব রাগ অভিমানের ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া আমার

বোনটিকে তো জানেন ? ও যে কিসে কখন রেগে যায় বা খুশী হয়, এ রীতিমত দুর্ব্বোধ্য। বেশতো, আপনিই চলুন না একদিন।

—ও নিজে থেকে না এলে আমি যেতে পারিনে অরূপ বাবু। ওর রাগ আছে, আমার নেই ? বলবেন ওকে। হাসি মুখেই ইভা তার কথা শেষ করলে।

বলবার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে ভারি বিশ্রী লাগলো। তা ছাড়া এখানে বসে থেকে নষ্ট করবার মত সময়ও নেই। হঠাৎ ইভাই এই অস্বস্তিকর অবস্থার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলে : বললে, আমাদের কারখানার গোলযোগ নিয়েই বাবা ভেঙ্গে পড়েছেন ! অথচ কে বা কারা আড়ালে থেকে এই ধর্ম্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে আজ অবধি তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

বললাম,—এখনও ধর্ম্মঘট চলছে ? আশ্চর্য্য তো ! কিন্তু আপনার বাবা তো নূতন লোক নিয়ে অনায়াসে কাজ চালাতে পারেন ! সেই চেষ্টাই কেন করে দেখুন না ?

ইভা অত্যন্ত ম্লান কণ্ঠে বললে সে চেষ্টাও হয়েছে। তাতে শুধু গোলমালই বেড়ে উঠেছিল, কাজ এগোয় নি। তবে অন্যায় কিছু চিরকাল চাপা থাকতে পারে না। শুধু শুধু শ্রমিকদের মনে যিনি এই অসন্তোষ সৃষ্টি করেছেন শাস্তি তাকে একদিন পেতেই হবে। তা তিনি যত বড়ই হন আর যতই কেন না আত্ম-গোপন করে থাকুন।

—সে কথা সত্যি! কিন্তু আজ আর বসব না মিস্ চাটার্জ্জি। হাতে অনেক কাজ জমে আছে।

—সে কি! আর একটু বস্থন! এক কাপ চা অন্ততঃ খেয়ে যান।

আমি আপত্তি করবার আগেই ইভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এতক্ষণ লক্ষ্য করবার স্থযোগ পাইনি! এবার স্পষ্ট শুনতে পেলাম শ্যামস্থন্দর বাবু নিম্ন স্বরে কথা বলছেন অরুণের সঙ্গে।

—কোন উপায় নেই?

—আজ্ঞে না। আমি তো ভেবে স্থির করতে পাচ্ছি না।

—তুমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখ অরুণ। তোমাকে আমি পার্ট্নার করে নেব। কিন্তু মিল হাত ছাড়া হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর আমার কোন পথ থাকবে না। দুর্দ্ধর্ষ মিলের মালিক রুদ্ধকণ্ঠে তাঁর শেষ আকুল মিনতি জানালেন।

অরুণ ধীরে ধীরে বলল, উপায় নেই মিষ্টার চাটার্জ্জি। পাঁচ লক্ষ টাকা দু'দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা আমার শক্তির বাইরে। তবে চেষ্টা করে দেখব, যদি আপনার বাড়ীটা বাঁচাতে পারি। এর জন্য কতো দরকার বলুন তো?

—আশী হাজার! শ্যামস্থন্দরের দীর্ঘশ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পেলাম। তারপর সমস্ত মনোযোগ একাগ্র করে

শুনলাম, শ্যামসুন্দর অতি মৃদু স্বরে বললেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, এমন অবস্থায় কোনদিন দাঁড়াতে হবে।

কথাগুলো তার কান্নার মত শোনাল।

বোধহয় এ আমার দুর্ব্বলতা; কারও চোখের জল আমি সইতে পারি নে। কিন্তু এ কথাও মনে মনে স্বীকার করতে হল উদ্ধত অবিচারের শাস্তি এমনি প্রলয়ঙ্কর রূপ নিয়েই এগিয়ে আসে। অশ্রুজলের মহাসমুদ্র সৃষ্টি হলেও দুষ্কৃতির ভার এতটুকু লঘু হয় না। ন্যায়ের অমোঘ বিধান এমনি কঠিন, এমনি অনিবার্য!

শ্যামসুন্দরের কথার উত্তরে অরুণকুমার তাঁকে কতোখানি আশ্বাস দিল শুনতে পেলাম না; ইভা পরিচারিকার হাতে চায়ের কাপ দিয়ে ঘরে ঢুকে বললে, আপনার দেরী হয়ে গেল, না?

কথাটা সত্য, তাই নিরুত্তরে অল্প একটু হেসে চায়ের কাপটা তুলে নিলাম। ইভা বোধ হয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে অরুণের গলা শোনা গেল, চললাম মিষ্টার ব্যানার্জ্জি। উইশ্ ইউ গুড্ লাক্!

গট্‌গট করে সে নিচে নেমে গেল। চেয়ে দেখি ইভার চোখ মুখ লাল হয়ে উঠেছে। অরুণ যে ইচ্ছা করেই এই খোঁচাটুকু দিয়ে গেল এ কথা বুঝতে তার এক মুহূর্ত্তও সময় লাগেনি।

অবশিষ্ট চা-টুকু নিঃশব্দে পান করে বললাম, অনেক ধন্যবাদ মিস্ চাটার্জ্জী। সময় পেলেই আরেকদিন আসব।

মনে হয় আপনার বাবা এর মধ্যেই ভালো হয়ে উঠবেন। নমস্কার!

নমস্কার। গাড়ী আছে তো? না থাকে, আমাদের ড্রাইভার পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে।

আরেকবার ধন্যবাদ দিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। রাত আটটার কাছাকাছি। উদয় ক'দিন থেকে আমাদের বাড়ী যায়নি। তার ইচ্ছা ছিল আরো কিছুকাল ইন্দ্রাণী কৃষ্ণার কাছেই থাকে; কিন্তু ইন্দ্রাণী এক রকম পীড়াপীড়ি করেই চলে গেছে।

গ্রুপ্ ছবি নির্ম্মাণ করার যে দায়িত্ব উদয় গ্রহণ করেছিল, তার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে: শুধু কৃষ্ণার সিটিং নেওয়া বাকী। উদয় অবশ্য এখনও জানতে পারেনি মেয়েটি কে। আজকালের মধ্যেই হয়ত এ রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে, মনে এও একটা দুর্ভাবনা ছিল। পাছে সে ভাবে কৃষ্ণা ছল করে তাকে অর্থ-সাহায্য করতে চায়, আর আমি জেনে শুনে কৌশলে তার হাতে এ করুণার দান তুলে দিচ্ছি, এমন আশঙ্কাও যে মনে জাগেনি তা নয়। তার জবাবও আমি স্থির করে রেখেছি। আর এতো সত্যিই মিথ্যে নয় যে কৃষ্ণা যা কিছুই দিয়ে থাক, সে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হতে প্রতিভার পদপ্রান্তে স্বতঃ-উৎসারিত শ্রদ্ধার অঞ্জলি।

মানুষের ওপরেও আর কোনো সত্তা আছে কিনা সে তর্ক দার্শনিকেরাই করুন; কিন্তু অন্তরের সহজ অনুভূতি দিয়ে

যাকে সত্য বলে বুঝতে পেরেছি, কোনো ক্ষতির ভয়েই তাকে অস্বীকার করতে পারিনে। তাইতো বারবার নিজের কাছে এ কথা জোর করেই বলেছি, মানুষ সত্য, মানুষ বড় : কিন্তু শিল্পী মানুষ...সে যে আরো বড়। এই বিচিত্র জগতে সৃষ্টি কর্ত্তার সে একচ্ছত্র প্রতিনিধি। সেই অতুল রূপ সৃষ্টির পণ্য সাজিয়ে তাকে যদি ঘুরে মরতে হয় দেশবাসীর দ্বারে দ্বারে তু'মুঠো ক্ষুধার অন্ন যোগাতে, দেশের পক্ষে তার বড় অধঃপতন আমি কল্পনা করতে পারিনে।

এক ফোঁটা মেয়ে কৃষ্ণাকে নিজে আমি হাতে করে মানুষ করেছি। ওর চিন্তায় তাই আমার চিন্তার ছাপ পড়েছে।

সংসারের ছোট বড় কাজ কর্ম্মের মধ্য দিয়ে কতোদিন কতো কথার যে আলোচনা করেছি ওর সঙ্গে, তার শেষ নেই। অদৃষ্টের পরিহাসে সংসারের সমস্ত প্রিয়জনকে হারিয়ে কোথা দিয়ে কেমন করে আজ এইখানে এসে পৌঁছেছি, ভাবতে বিস্ময় লাগে। আমার বোন বলে নয়, কৃষ্ণার মত মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। আপন শুদ্ধ অন্তরের আলো দিয়ে অতি সহজেই ও সত্যের সন্ধান পায়। উদয়ভানুকে তাই ও ভালো না বেসে পারে নি। তাইতো তার কাজে ওর সর্ব্বস্ব উজার করে দেওয়ার প্রস্তুতির মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থের স্পর্শ নেই ; আছে শ্রদ্ধানত পূজারিনীর মর্ম্মান্ত নিবেদন, ঐকান্তিক অর্ঘ্য-রচনা।

কিন্তু উদয় তো এত কথা জানে না। আর মুখে বলে জানাবার, বোঝাবার বস্তুও এ নয়। ঠিক এইখানেই আমার আশঙ্কা।

হঠাৎ আশ্চর্য্য হয়ে দেখি, ব্রীজ পার হয়ে কখন সহরের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পড়েছি। আর কিছুদূর অগ্রসর হলেই ঘন গাছপালার আড়ালে উদয়ের ঘর। ভাবলাম, যখন এতদূরেই এসে পড়েছি, একবার দেখে আসি উদয় আর ইন্দ্রাণীকে।

কি অদ্ভুত মেয়ে ইন্দ্রাণী! উদয়ের বোন হবার যোগ্যতা যেন ওতেই সম্ভব। সংকল্পে অটুট, বুদ্ধিতে শানিত, স্নেহ মমতায় কোমল। দুর্ব্বার ওর আকর্ষণ! হাস্য পরিহাসে চঞ্চল অথচ সংযমের নিয়মে বাঁধা তার তনুদেহের চিক্কণ উদ্দাম যৌবন শ্রী চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পেলাম যেন।

ধীরে ধীরে এসে বৃক্ষলতায় ঘেরা বহুদিন আগে দেখা সেই ঘরগুলির সামনে দাঁড়ালাম। ইন্দ্রাণী কনুইয়ে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে কি একখানা বই পড়ছিল। কাঁচা মাটির ঘর ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করছে। বাহুল্যের চাপে কোথাও তা বিন্দুমাত্র ভারাক্রান্ত হয়নি। মাথার কাছে রক্তাভ কাঁচের আধারে মোমের বাতি জ্বলছে। সমস্ত মিলিয়ে এ যেন এক নূতন পৃথিবী গাঢ় আবীরের রংয়ে স্বপ্নায়িত হয়ে উঠেছে।

ডাকলাম, ইন্দ্রাণী?

ইন্দ্রাণী এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ডাক শুনে একেবারে ধড়মড় করে উঠে বসে স্খলিত বস্ত্রাঞ্চল তাড়াতাড়ি গায়ে টেনে দিয়ে হেসে বললে, উঃ! কি যে ভয় দেখাতে পারেন! এমন করে ডাকতে হয় বুঝি?

হেসে বললাম, অন্যায় হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি। কিন্তু কৈ উদয়কে দেখছি না তো?

দাদার আপনাদের ওখানে যাওয়ার কথা ছিল। যায় নি?

—জানি না তো! আমি ভেবেছিলাম এখানেই তাকে পাব। দেখতো, মিথো এতটা পথ—

ইন্দ্রাণী আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, কষ্ট করে আসা! তা হলে—

হ্যাঁ, আর দেরী করা ঠিক হবে না। উদয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।

কথা শেষ করে সবেমাত্র বাইরে পা বাড়িয়েছি, ইন্দ্রাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল। পিছনে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, হাসচ যে?

হাসি থামিয়ে ইন্দ্রাণী বললে, আপনি ভাল ছেলে একথা সবাই জানে; শুধু জানে না, আসলে আপনি শিশুর মতোই অবুঝ আর রাগী।

বললাম, দোহাই তোমার, একটু সোজা করে বল ইন্দ্রাণী।

তেমনি গম্ভীর মুখেই ইন্দ্রাণী উত্তর করল, বলব, ঘরে আসুন।

কেমন কৌতূহল হল। ঘরে এসে বসলাম। ইন্দ্রাণী এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, আবার যেন রাগ করবেন না। আমি আসছি,—বলেই অন্য ঘরে চলে গেল।

বেশীক্ষণ একা থাকতে হল না। মিনিট পাঁচেক পরেই ইন্দ্রাণী ফিরে এলো। হাতে পরিপাটি করে সাজান একটি ছোট থালায় কিছু খাবার। পিছনে মধ্যবয়সী একটি স্ত্রীলোকের হাতে চায়ের সরঞ্জাম। বললে, এবার তুমি যাও দীপুর মা, আমিই সব করে নেব।

নিশ্চিন্ত আরামে চা খাওয়ার মত মনের অবস্থা নয়। বিশেষতঃ উদয় আমাদের বাড়ীতে অপেক্ষা করছে জেনেও এখানে বসে থাকা যে শোভন নয় এ কথা খুব বেশী করেই মনে হচ্ছিল। ধীরে ধীরে বললাম, এ সব হাঙ্গামা পোহাবার কোন প্রয়োজন ছিল না ইন্দ্রাণী। জান, আমার নষ্ট করবার সময় নেই……

নষ্ট করবার সময় কি আমরই আছে? কিন্তু কি করি বলুন? আমারও যে উপায় নেই! নিন্, খেয়ে নিন্ এটুকু।

এতক্ষণ তার কণ্ঠস্বরে একটা হাল্কা কৌতুকের ভাব মেশান ছিল; কিন্তু শেষের কথাগুলো অত্যন্ত গম্ভীর

আদেশের মত শোনাল। এতটুকু মেয়ে যে এত সহজে একজন পুরুষকে হুকুম করতে পারে এ আমি নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাস করতাম না। বললাম, তুমি খাবে না ?—

ইন্দ্রাণী তেমনি স্বরেই বলল, না, আমি কলেজ থেকে আসি নি। খেয়ে নিন আপনি। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে অগত্যা খেতে সুরু করলাম।

কত কথাই মনে আসছে। কত বিস্মৃত-প্রায় কাহিনী, পরিচিত অপরিচিত কত মুখ। অথচ কোন কিছুই স্থায়ী হচ্ছে না। এ যেন এক নির্ব্বাক ছায়াচিত্র। অতি দ্রুত বেগে মনের রূপালী পর্দ্দায় প্রতিফলিত হয়ে মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

—আচ্ছা, যদি বলে দিই ? ইন্দ্রাণী হেসে ফেলল। চমকে উঠলাম, তার মানে ?—

মানে একটা আছেই।

তোমার কি হয়েছে ইন্দ্রাণী ? সোজা কথা বলতে কি ভুলে গেলে ? বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চাইতেই দেখি সে দাঁতে ঠোট চেপে মুখ নিচু করে আছে। মিনিট দুয়েক কেটে গেল, বললাম, উদয়ের সাথে দেখা না হলে কি হবে বলতো ?

ইন্দ্রাণী চকিতে আমার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল। চাপা হাসির আবেগে তখন তার সারা

মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বললে, কিছুই হবে না। বলবেন, ইন্দ্রাণী জোর করে ধরে রেখেছিল।

কানের মধ্য দিয়ে যেন আচমকা তীব্র বিদ্যুৎ প্রবাহ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ল। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে বললাম, সাহস ত তোমার কম নয় ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্রাণী কিছুকাল চুপ করে থেকে হেসে বললে, সাহস আবার কি ? সত্য কথা বলেছি। কিন্তু আপনার ওপর ভয়ানক রাগ হয়েছিল, জানেন ?

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা, আর কেউ না জানুক আপনি ত জানেন, ইন্দ্রাণী আপনার পর নয় ? তাকে দেখতে আসায় এমন কি দোষ আছে আমি ভেবে পাই নে।

পাবার কথাও নয়। যে নিরীহ লক্ষ্মী মেয়ে তুমি! বলেই সশব্দে হেসে উঠলাম। ইন্দ্রাণী নিঃশব্দে মুখ নিচু করে হাসতে লাগল।

বললাম, রাগ হয়েছিল কেন ?

—আপনি বলুন ত ? হাসি মুখে প্রশ্ন করল ইন্দ্রাণী।

তা হলে তোমার মনের মধ্যে খানিকটা যায়গা করে নিতে হয়। আপত্তি না থাকে ত বল,—

ইন্দ্রাণী জবাব দিল না। নিঃশব্দে কেটে গেল কিছুক্ষণ। কিন্তু এভাবে চুপ করে থাকা এমনি লজ্জাকর যে আমাকেই শেষ পর্য্যন্ত আগে কথা বলতে হল, চুপ করে রইলে যে ?

ইন্দ্রাণীর সারা মুখ সিঁদুরের মত লাল হয়ে গেল। কথা বলতে গিয়ে গলাটা কেঁপে গেল একবার, কি করি বলুন? আমি প্রশ্নই করেছি; উত্তর দেবার দায়িত্ব আপনার। তার জন্য প্রয়োজন হলে যা খুশী করতে পারেন। আমি তা'তে বাধা দেবার কে? আর দিলেই বা আপনি শুনবেন কেন?

এরপর আর কোন কথা আমার মনে এল না। অথচ চুপ করে থাকাও অসম্ভব। হঠাৎ ইন্দ্রাণীর বাঁ হাতখানি তুলে নিয়ে বললাম, রোসো! হাত দেখে বলে দিচ্ছি। পামিষ্ট্রি বিশ্বাস কর তো?

স্পষ্ট অনুভব করলাম আমার হাতের মধ্যে তার হাতখানি একবার মাত্র কেঁপে উঠেই শিথিল হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই তার হাত ছেড়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললাম, ঠাট্টা নয় ইন্দ্রাণী। আমি জানি কেন তুমি রাগ করেছিলে।

ইন্দ্রাণী দুই চক্ষুভরা আগ্রহ নিয়ে আমার দিকে চাইল, কেন?

বললাম, এতদিন আমার সঙ্গে ঝগড়া করবার সুযোগ পাও নি বলে।

—আর কিছু জানেন না? দুষ্টুমীর হাসি ক্ষণিকের জন্য টোল খেয়ে গেল ওর আরক্তিম গাল দুটির ওপর।

বিস্ময়ের ভাণ করে বললাম, না!

—আমার অদৃষ্ট। নইলে আমিই বা এমন মানুষের জন্য কষ্ট পাব কেন, যে কিছুমাত্র দোষ না করেও ভয়ে ভয়ে কথা বলে। ভালবাসে, তবু জোর করে বলতে পারে না, তোমাকে ভালবাসি ইন্দ্রাণী! তোমাকে না দেখে আমি থাকতে পারিনে। হাসতে গিয়ে ওর মুখখানা সহসা করুণ হয়ে উঠল; ফুটে উঠল দুই চোখের কোণে দু'বিন্দু অশ্রুজল। আমার অলক্ষ্যে ও চোখ দু'টো মুছে নিতে চেষ্টা করল।

আনন্দে, সঙ্কোচে, আশায়, নিরাশায় বুকের মধ্যটা যেন প্রচণ্ড ঝড়ে ভেঙ্গে দুমড়ে পড়বার উপক্রম হল। হৃদয়ের নিভৃত মণিকোঠায় একান্ত সঙ্গোপনে লুকিয়ে রেখে এতদিন যাকে কৃপণের মত উপভোগ করেছি, সে আজ আপন ভালোবাসার দাবীতে আপনাকে সবলে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। চেয়ে দেখি ইন্দ্রাণী আভূমি দৃষ্টি নত করে মাটিতে আঁচড় কেটে যাচ্ছে; আঁকা বাঁকা অর্থহীন আঁচড়! না-বলা কথার চাপে শক্ত মাটির বুকে অসংখ্য গভীর দাগ।

হাত দিয়ে মুখখানা তুলে ধরে বললাম, এত বুদ্ধি···এত জোর···তবু এত অভিমান কেন?

—কারও ওপর আমি অভিমান করিনি! সলজ্জ হাস্যে আমার দিকে চেয়ে ইন্দ্রাণী উত্তর করল।

এতক্ষণে সঙ্কোচ যেন অনেকখানি কেটে গেল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললাম, এবার আর বাধা দিও না ইন্দ্রাণী। সত্যিই যাওয়া দরকার।

ইন্দ্রাণী হাসি মুখে বাইরের দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে এল ; বলল, কৃষ্ণাদি আমাকে যেতে বলে নি ?

বললাম, শুধু বলা নয়, দু'বেলা উঠতে বসতে আমাকে অনুরোধ করছে তোমাকে নিয়ে যেতে। অথচ···আর তাই বা কেন ? নিজে তুমি যেতে পার না ? কলেজ থেকে ফিরে আসবার পথে রোজই তো আসতে পার !

ইন্দ্রাণী মৃদু হেসে বললে, রোজ না হোক্ মাঝে মাঝে হয় তো পারি। আচ্ছা, যাব দু'এক দিন পরে। কেমন ?—

যেয়ো, আমি ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম !

একটু দাঁড়ান ! ইন্দ্রাণী সহসা নত হয়ে আমাকে প্রণাম করল। আমি বাধা দেবার সময় পেলাম না। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, একি ইন্দ্রাণী ?—

ইন্দ্রাণী বোধকরি লজ্জা পেয়েছিল ; বলল, কিছু না ! এমনি ইচ্ছে হল।

দুয়ারে একটি হাত রেখে নত নেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। দক্ষিণের দমকা হাওয়ায় তার কুঞ্চিত কালো চুলের কয়েকটি গুচ্ছ চোখে মুখে এসে পড়েছিল। হাত দিয়ে পরম স্নেহে তাদের মাথার ওপরে সরিয়ে দিয়ে বললাম, আর কখনো যদি চোখের জল দেখতে পাই, সত্যিই রাগ করব কিন্তু।

তেমনি নতমুখেই ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে চলে গেল। একটিবারও ফিরে চাইল না।

দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছি। কি এক অস্বাভাবিক আনন্দ ফুলে ফুলে উঠছে সারা বুক জুড়ে! ইন্দ্রাণীর এত দিনের এত কথা, এত হাসি ছাপিয়ে, নিরালায় সবার চোখের আড়ালে আজিকার এই একটি মাত্র প্রণাম আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, সকল চেতনাকে যেন এক নিমিষে সজাগ করে দিয়ে গেল। কি এক অতৃপ্ত রসানুভূতি তড়িদ্‌বেগে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেল আমার দেহের প্রতি ধমনীতে······প্রতি রক্ত কণিকায়!

* * * *

বাড়ী পৌঁছে সোজা নিজের ঘরে চলে আসছিলাম। দক্ষিণ দিককার শেষ ঘরখানার দিকে চোখ পড়ল। দরজা খোলা। দেখে আশ্চর্য্য হলাম। অযুতাশ্ম বাবুর মৃত্যুর পর ওঘর খোলা থাকত না কোনদিন। ওটা তিনি স্বয়ং ব্যবহার করতেন। শুধু কৃষ্ণা রোজ সকাল-সন্ধ্যায় ঘরের আসবাবপত্র নিজের হাতে ঝেড়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে আসে! এমনি করেই অতীত হয়েছে অনেকগুলি বৎসর।

কৃষ্ণার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী কথা ছিল। ঝিকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, দিদিমণি শুয়ে আছেন। সুতরাং ডাকাডাকি না করে নিজেই তার কাছে চললাম। যেতে যেতে খোলা দরজার পাশে অযুতাশ্মবাবুর বিশ্রাম কক্ষের অভ্যন্তরে চেয়ে দেখলাম, একজন প্রৌঢ় বয়স্ক

ভদ্রলোক একখানা প্রকাণ্ড সোফার ওপরে বসে আছেন, পার্শ্বে উপবিষ্টা এক বিগত-যৌবনা রমণী। বেশ ভূষায় উভয়কেই অতি সম্ভ্রান্ত বলে মনে হল। ঘরের মধ্যে আলো ছিল না। শুধু পশ্চিমের উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বাইরের ক্ষীণ আলোর কয়েকটি রেখা কক্ষপ্রাচীরে প্রতিফলিত হয়ে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। স্বল্পালোকিত সেই প্রায়ান্ধকার কক্ষে এমন নিঃশব্দে বসে আছেন, ওঁরা কারা ?

আপনার বলতে কৃষ্ণার বা আমার এমন কেউ কোথাও নেই, যাঁরা এ সময় হঠাৎ এসে পড়তে পারেন। ধীরে ধীরে ছুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনারা—

স্বন্ স্বন্ করে একটা প্রবল দমকা হাওয়া ঘরের মধ্যে ছুটে এল ; জানালাটা আছড়ে পড়ল সশব্দে। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর পেলাম না। দেখলাম উপবিষ্ট মনুষ্য দু'টির দেহ একবার ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে স্থির হয়ে গেল।

একটু সঙ্কোচ অনুভব করলাম। কি জানি, এমন ভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করে ভাল করি নি বোধহয়।

হঠাৎ পিছনে পদশব্দ পেয়ে চেয়ে দেখি কৃষ্ণা এই দিকেই আসছে। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, এ তোদের কি রকম বন্দোবস্ত রে কৃষ্ণা ! ভদ্রলোকদের একা বসিয়ে রেখে তুই দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?

কৃষ্ণা বিস্মিত হল, কোথায় কাকে বসিয়ে রাখলাম অরূপদা ?

আমি অধিকতর বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, তার মানে ? ওঘরে যাঁরা বসে আছেন, তাদের কথাই বলছি। আমি ত চিনতেই পারি নি ; তা ছাড়া ওঁরাও কোন কথা বললেন না।

কথা শেষ হতেই একমুহূর্ত্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে কৃষ্ণা হঠাৎ হেসে উঠল।

ব্যাপার বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বললাম, —ওঁরা শুনতে পেলে কি ভাববেন বল্ তো ? দিন দিন তুই যেন আরও ছেলেমানুষী সুরু করেছিস্ !

—শুধু শুধু বকছ কেন অরূপদা ? তোমার কথা শুনলে, ·····আবার সেই হাসি ! যেন কি একটা মজার কথা বলেছি। এবার শুধু বিরক্ত নয়, রীতিমত রাগ হল। কৃষ্ণা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হাসি থামিয়ে বললে, ওরা শুনতে পেলে আর দুঃখ ছিল কি অরূপদা ? সে ভয় নেই। কিন্তু কেন জান ?

এবার রাগ রইল না সত্য, কিন্তু বিস্ময় বেড়ে গেল, বললাম, না দিদি ! তোর কথার এক বর্ণও বুঝতে পারছি নে ?

—এস তবে,— কৃষ্ণা আমার হাত ধরে এক রকম টানতে টানতেই সেই কক্ষের সুমুখে নিয়ে এল। তারপর আমার

হাত ছেড়ে দিয়ে, একটু দাঁড়াও, বলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিতেই আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম।

কৃষ্ণা অতি মৃদুস্বরে বললে, তোমার বন্ধুর হুকুমে এই ঘরে বসেই সিটিং দেবার আয়োজন করে দিতে হল। কিন্তু অনেকক্ষণ বসে থেকেও যখন দেখলেন তুমি এলে না, তখন বললেন, কোন কারণে হয়ত মেয়েটি আজ আসতে পারছেন না। অথচ আমারও দেরী করবার উপায় নেই। বলবেন কাল সকাল থেকেই কাজ সুরু করব। আমার কিন্তু ভয়ে বুক কাঁপছিল অরূপদা। যদি জানতে চাইতেন মেয়েটি কে, কোথায় থাকে, মিথ্যে বলা আমার পক্ষে সহজ হত না। অথচ এ অবস্থায় কি যে বলা উচিত তা'ও বলে যাও নি।

কৃষ্ণার সব কথাই কানে আসছিল, কিন্তু দু'ই চক্ষুর বিস্মিত একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল অযুতাশ্মবাবু ও তাঁর সহধর্মিণীর বিশালায়াতন আলেখ্য দু'টির ওপর।

অযুতাশ্মবাবু বসে আছেন একখানা প্রকাণ্ড সোফায়। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহে দামী কালো মখমলের ওভার-কোট; চোখে রিম্‌লেস চশমা; দৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ বুদ্ধির দীপ্তি। পার্শ্বে উপবিষ্টা স্ত্রী কাঞ্চনময়ী; তপ্ত কাঞ্চনের মতই রঙ, চাইবামাত্র চোখ ঝলসে যায়। স্বামীর দিকে চেয়ে আছেন অপলক দৃষ্টিতে। অধরে অভিব্যক্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তির অর্দ্ধস্ফুট হাসি। আগে থেকে জানা না থাকলে ঐ

আধ-ছায়া আধ-আলোয় একে ছবি বলে চিনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন।

ছবি আঁকবার জন্য আমার ঘর ঠিক করা হয়েছিল; সুতরাং এ ঘরে, ওরকম কিছু হবে আমি ভাবতে পারি নি। তা ছাড়া সম্পূর্ণ হয়ে যাবার পর এ ছবি দু'টি আমি একবারও দেখিনি। তাই আমার এ দৃষ্টি-বিভ্রম! তুলির টানে যে এমন করে জীবনের ঢেউ বন্দী হতে পারে, রং আর রেখার সমন্বয়ে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে সৃষ্টির স্পন্দন, যা' বহু পূর্ব্বেই বিলীন হয়ে গেছে অনন্ত কালের গর্ভে, এ যেন আজই প্রথম নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করলাম। সমগ্র বুদ্ধি, সমস্ত বিচার, সমস্ত সম্ভব অসম্ভবের চুলচেরা গণিতিক হিসাব এই বিরাট প্রতিভার সম্মুখে অপরিসীম বিস্ময়ে মৌন হয়ে রইল। কৃষ্ণা নির্নিমেষে চেয়েছিল ছবির দিকে। অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টি আমার মুখের পরে রেখে যেন নিজেকেই বললে, ছবি যে এমন হতে পারে জানতাম না।

—সত্যিই বলেছিস বোন, অতি মৃদুকণ্ঠে বললাম, ভাল ছবিত কতই দেখেছি! দেশ বিদেশের নামজাদা চিত্রও দু'একখানা চোখে পড়ে নি তা নয়; কিন্তু এর যেন কোথাও তুলনা নেই।

কৃষ্ণা চোখ মুছে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা অরূপদা, এ-ছবির তুমি দাম দেবে কি করে? অপরিমেয় শ্রদ্ধা-মমতায় বিগলিত ওর কণ্ঠস্বর।

কথাটা কী যে ভাল লাগল! বললাম, ঠিক প্রশ্নই তোর মনে এসেছে দিদি! ভয় হয় দাম দিতে গেলেই এ ছোট হয়ে যাবে।

অরূপদা, একটা কথা বলে দাও না!

—কি?

আমি জানি, আমাকে উনি বিশ্বাস করেন না। হয়ত আমার মত তুচ্ছ একটা মেয়ের কোন প্রয়োজন নেই ওঁর কাজে। আমি তোমাদের সকলের বাইরে। কিন্তু তাতেও আমি দুঃখ করব না অরূপদা! শুধু—

কৃষ্ণার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, ওকথা কেন দিদি? আর কেউ না জানলেও তোর অরূপদা জানে, সংসারে তুই কারও থেকে তুচ্ছ ন'স। আর—

সহসা কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেলাম। কৃষ্ণা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে এক মুহূর্ত আমার পানে চেয়ে থেকে বললে, বল না দাদা!

বললাম, আর উদয়ের কথাই যদি বলিস বোন, আমি নিশ্চয় জানি, তোর এত বড় শ্রদ্ধা, এতবড় ভালবাসা সকল আড়াল ডিঙিয়ে একদিন তার চোখে

পড়বেই। তোর অরূপদার মুখের এ কথাটা তুই বিশ্বাস করিস।

অনেকক্ষণ কৃষ্ণা কথা বলতে পারল না। চোখে আঁচল দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। দেহ তার কেঁপে কেঁপে উঠছিল নিরুদ্ধ কান্নার আবেগে। তারপর যেন সম্পূর্ণ আলাদা সুরে ভগ্ন কণ্ঠে বলল, আমি তো তাঁর স্নেহ দাবী করি নে অরূপদা। তাঁর পথ আগলেও দাঁড়াব না কোনদিন। তুমি শুধু একটা কথা তাঁর কাছে জেনে নিও, কৃষ্ণা কোন অপরাধে তাঁর বিশ্বাসের যোগ্য নয়।

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, উদয় তোকে অবিশ্বাস করে কে বললে? ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললাম, ভুল বুঝেছিস্ তুই। ওর চলার পথে যারা কোনদিন আসে নি, তাদের এড়িয়ে চলা ওর নিয়ম।

কৃষ্ণা ম্লান হেসে বললে, অনর্থক কাউকে অপমান করাও বুঝি ওঁর নিয়ম?

এ প্রশ্নের উত্তর ছিল না। অন্ততঃ আমার সে দিন মনে হয় নি। শুধু কোনমতে ওর ব্যথার যায়গাটা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম; হেসে বলেছিলাম, কাল দেখা হলে উদয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করব।

আজ একথা লিখতে বসে কৃষ্ণার সে-দিনের মুখের চেহারাটা মনে পড়ছে। কি অসহায় ব্যাকুল কণ্ঠে ও

বলেছিল, না, না, তুমি সর্ব্বনাশ কর না অরূপদা। তাঁর সাথে কোন সম্বন্ধই ত নেই। তুমি বুঝতে পারছ না, একথা শুনে কি শাণিত বিদ্রূপ তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠবে। ছিঃ! ছিঃ! সে লজ্জা আমার সইবে না!

আমাকে আর কোন কথার অবকাশ না দিয়ে কৃষ্ণা চলে গিয়েছিল। উদয়কে অস্বীকার করবার প্রবল আগ্রহ দেখে সেদিন হাসি পেয়েছিল সত্য; কিন্তু একদিকে এক নিস্পৃহ নিরাসক্ত আজন্ম বিপ্লবী, আরেকদিকে স্নেহাতুর দুর্জ্জয় অভিমানিনী কৃষ্ণা সে দিন আমাকে সত্যই আশঙ্কিত করে তুলেছিল।

সর্ব্বাঙ্গে তখন ছিল পরিপূর্ণ যৌবনের তেজ, মনেও বুঝি ছিল তারই অহঙ্কার। আপন শক্তির বাইরে আর কিছু চোখে পড়ে নি সে-দিন। অথচ আজ কত সহজেই না বিশ্বাস করি, সংসারের ছোট বড় সকল সমস্যারই শেষ মীমাংসা যদি কারো হাতে থেকে থাকে, সে ঐ মহাবিচক্ষণ বুদ্ধি বিভ্রমকারী বহুদূরদর্শী দার্শনিক নয়; প্রলয়ঙ্কর আণব শক্তির আবিষ্কারক দুর্দ্ধর্ষ বৈজ্ঞানিকও নয়, সে ঐ একমাত্র অদৃশ্য ঐন্দ্রজালিক পরম শক্তিমান সর্ব্বব্যাপী আদি-অন্তহীন কাল!

যতদূর দৃষ্টি যায় মানস চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখলাম, সকল সমস্যা, সমস্ত মীমাংসা সেই অন্তহীন কালের

মহাতরঙ্গশীর্ষে বুদবুদের ন্যায় আবির্ভূত হয়ে আবার কালের গর্ভে বিলীন হচ্ছে।

আজ যেন অনুভব করছি জীবনের প্রতি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত কী অতৃপ্ত অগণিত জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল! আর এদেরই জবাব খুঁজতে গিয়ে পরমায়ুর শেষ ক্ষণটি পর্য্যন্ত মানুষের কী উন্মাদ হয়ে ছুটে চলা! মনে হয় বিশ্ব সংসারে মানুষের তৈরী জটিল রাজনীতি আর সমাজ-নীতির সমস্যা থেকে শুরু করে, নিরালা গৃহের কোণে নর-নারীর প্রেমের সমস্যা পর্য্যন্ত, কেউ কোনদিন শেষ প্রশ্নটিও যেমন করতে পারেনি, তার শেষ উত্তরও বুঝি তেমনি সীমাহীন অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে।

১২

সকাল বেলা ঘুম ভেঙ্গে প্রথমেই মনে হল উদয়ের কথা। আজ থেকে কৃষ্ণার সিটিং সুরু। উদয়কে এখনো জানানো হয় নি মেয়েটি কে। এই লুকোচুরির ব্যাপারে কৃষ্ণা তাই কিছু সঙ্কুচিত; অথচ কেন যে উদয়কে একথা গোপন করেছি তাকে খুলে বলি নি।

গজাননকে কৃষ্ণার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলল, দিদিমণি তু'তিন বার এসে আপনাকে ঘুমোতে দেখে ফিরে গেছেন।

বললাম, বলগে আমি ডাকছি।

গজানন চলে যাচ্ছিল। ডেকে বললাম, শোনো, অমনি এক কাপ চা নিয়ে এস তো ?

শরীরটা কেমন ভারি বোধ হচ্ছিল। ভাবলাম চা আসতে এখনো অন্ততঃ দশ মিনিট ! ততক্ষণ আরেকটু গড়িয়ে নেওয়া যাক্।

কাল নির্জ্জন সন্ধ্যায় অত্যন্ত অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী আমার সমস্ত অন্তর যে স্নিগ্ধ সুধা-রসে সিঞ্চিত করে দিয়েছে, চোখ বুজে সেই কথাই ভাবছি।

সম্মুখে বহুতর সমস্যার ভয়াল ভ্রূকুটি : তবু যেন মনে হয় এদের আমি আর ভয় করিনে। যেন মহাপ্রলয়ের সর্ব্বগ্রাসী ধ্বংসলীলা সম্মুখে রেখেও আমি পরম নির্ভয়ে এগিয়ে চলবার জোর পেয়েছি।

অনেক দিন রাজেশ্বরের সংবাদ পাই নি। পাথর-কাটা নিয়ে বোধহয় আর কোনো গোলযোগ ঘটে নি। কোনমতে আর মাস দুই কেটে গেলেই এবারের মত শেষরক্ষা হয়। এঁর পর বাকী রইল উদয়ের আদর্শের প্রথম পরীক্ষা.........শ্যামসুন্দর বাবুর জুটমিল-ধর্ম্মঘটের শেষ ফলাফল।

একটা কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না ; সে উদয়ের আসন্ন বিপদ। কেন জানি না, আমার স্থির বিশ্বাস উদয় সহজে নিষ্কৃতি পাবে না।

সহসা ঘরের মধ্যে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে বুঝলাম গজানন চা নিয়ে এসেছে। মুখ না ফিরিয়েই বললাম, রাখ ওখানে। কিন্তু কোন রকম শব্দ না পেয়ে মনে হল সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতক্ষণে উদয়ের এসে পড়বার কথা। জিজ্ঞাসা করলাম, কেউ আসে নি?

কাকে চান শুনি?—

হঠাৎ তীব্র তড়িৎস্পর্শে চমকে উঠলাম যেন, পাশ ফিরে দেখি, ইন্দ্রাণী একেবারে আমার শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছে।

একমাথা ভিজে চুল সারা পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। কপালে কুঙ্কুমের টিপ্; বাসন্তী রংয়ের একখানা সাদাসিধে শাড়ী তার তনু দেহটিকে নিবিড় মমতায় জড়িয়ে রয়েছে।

এক নিমিষে সমস্ত দেহ-মনে আনন্দ উদ্বেল হয়ে উঠল। মনে হল, চন্দ্রালোকিত মধুমাসের নিস্তব্ধ নিশীথে কে যেন বীণার তারে মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে গেল, কাকে চান শুনি? ত্বরিতে উঠে বসে অল্প হেসে বললাম, তোমাকে।

ইন্দ্রাণী লজ্জারক্ত মুখে দাঁতে ঠোঁট চেপে এক মুহূর্ত্ত তার চোখের দৃষ্টি অন্যত্র ঘুরিয়ে নিল; তারপর চকিতে আমার দিকে চেয়ে খুব ছোট করে বলল, বড় যে সাহস হয়েছে। দাঁড়ান, কৃষ্ণাদিকে সব কথা বলে আসছি।

ইন্দ্রাণী চলে যায় দেখে ত্রস্ত-কণ্ঠে ডাকলাম, ইন্দ্রাণী, শোনো! শুনে যাও! কিন্তু ততক্ষণে সে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। ইন্দ্রাণী কি সত্যিই রাগ করলে? কি জানি! স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্! হঠাৎ দেখলাম গজানন ঘরের সুমুখ দিয়ে গজেন্দ্র গমনে চলেছে। মনে মনে বললাম, বেটা বুড়ো শয়তান! ওরই জন্য যত গণ্ডগোল! উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম, এদিকে এসো ত গজানন!

গজানন শশব্যস্তে ছুটে এলো। এমন ভাবে ও কোন দিন আমাকে কথা বলতে শোনে নি। বললে, কি বলছেন ছোট বাবু?

বলছি তোমার মুণ্ডু।

আজ্ঞে—। গজানন জড়সড় হয়ে দাঁড়াল।

তোমাকে চা আনতে বলেছিলাম না?

আজ্ঞে, ছোট দিদিমণি বললেন—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, থাক, তুমি চা নিয়ে এসো, বলেই দক্ষিণের জানালার কাছে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লাম।

ইন্দ্রাণী কালই সন্ধ্যায় বলেছিল, দু'এক দিন পরে আসবে; অথচ আজ ভোরেই যে কেন চলে এসেছে ভেবে পেলাম না। ইন্দ্রাণীকে প্রথম দেখা থেকে আজ এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তার সমস্ত কথা একে একে মনে পড়ল।

সহরের কোলাহল ছাড়িয়ে বহু দূরে সেই পাহাড়তলীর বাড়ীতে···কৃষ্ণার রোগশয্যায় আচম্বিতে সেই অনাহুত আসা···তারপর···

ও বেচারার অপরাধ কি শুনি ? পিছন থেকে ইন্দ্রাণী বলে উঠল, যান, মুখ হাত ধুয়ে আসুন। আমি ততক্ষণে চা নিয়ে আসছি।

বললাম, কৃষ্ণা কোথায় ? তার সাড়া পাচ্ছি না যে ?

খাবার তৈরী করছে, কৈ, উঠুন না !

মাথা যেন খসে পড়ছে ইন্দ্রাণী ! উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইন্দ্রাণীর সমস্ত মুখখানা সহসা ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। আর্তস্বরে বলল, সর্ব্বনাশ ! অসুখ করে নি তো ? তারপর এক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে একবার একটু দ্বিধা করল ; পরক্ষণেই এগিয়ে এসে আমার কপালে ও বুকে বার বার হাত দিয়ে গায়ের তাপ পরীক্ষা করে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। থাক, আর উঠে কাজ নেই। আমি জল এনে দিচ্ছি, এখানেই মুখ ধুয়ে নিন্। অমনি কৃষ্ণাদিকে···

এবার হেসে ফেললাম। বললাম, রক্ষা কর ইন্দ্রাণী। আমার কিছুই হয় নি। শুধু শুধু সকাল বেলার খাওয়াটা বন্ধ কর না !

ইন্দ্রাণী আমার চোখের দিকে ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, কি যে মানুষ আপনি! এমন করে ঠাট্টা করতে হয় নাকি?

বললাম, ইন্দ্রাণী, আমাকে ছাড়া—

ইন্দ্রাণী হঠাৎ আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বললে, না, আর একটি কথাও নয়। যান, তৈরী হয়ে আসুন। দাদা এখনি এসে পড়বে!

* * * *

বোধহয় আধ ঘণ্টা কি আরও একটু পরে। উদয় তৈরী হয়ে বসে আছে অযুতাশ্ম বাবুর প্রাইভেট রুমে। তাকে বলেছি, তুমি যাও, মেয়েটিকে আমি নিয়ে আসছি।

কৃষ্ণা আর ইন্দ্রাণীকে নিয়ে ধীরে ধীরে চলেছি। দূর থেকে চোখে পড়ছে উদয়ের উন্নত ঋজুদেহ। দীর্ঘ অবয়বে গাঢ় মসৃন্ কালো রংয়ের ওভারকোট হাঁটুর নিম্ন অবধি নেমে এসেছে; কাশ্মীরি ধরণে পায়জামা পরা। বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উর্দ্ধে উঠে যাচ্ছে।

ঘরের কাছে এসে ইন্দ্রাণী ডাকল, দাদা, চেয়ে দেখ! উদয় এক দৃষ্টে চেয়েছিল তারই আঁকা ছবি ছু'টির দিকে। ইন্দ্রাণীর কথায় মুখ ফিরিয়ে এক মুহূর্ত্ত আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে বললে, বাঃ!

কি সুন্দর যে দেখাচ্ছে আপনাকে! ইচ্ছে হয় আপনারই একটা সিটিং নিয়ে নিই!

ইন্দ্রাণী হাসিমুখে বললে, তাই নাও দাদা। কৃষ্ণাদির একটাও ভাল ছবি নেই। তা ছাড়া এত রূপ তুমি আর কোথাও পাবে না, এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

উদয়ও হেসে ফেললে, বেশ, আপনি রাজি থাকেন ত বলুন, কাজ সুরু করে দিই! আপনার তো টাকার অভাব নেই? খুশী করতে পারলে বেশ ভাল দাম আদায় করে নেব! 'না' বললে তখন ছাড়ব না, কি বলেন? হা হা করে হেসে উঠল উদয়।

তারপর হাসি থামিয়ে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল, তিনি এলেন না? সেই মেয়েটি?

ঠিক এই আশঙ্কাই করছিলাম। আড়চোখে কৃষ্ণার মুখখানা একবার দেখে নিলাম। মনে হল সে.যেন ঈষৎ রক্তাভ। চাপা মৃদু কণ্ঠের একটা কথা কানে এল, দেখ্ ইন্দ্রাণী, ফের যদি বাজে কথা বলিস ভয়ানক শাস্তি পাবি।

ইন্দ্রাণীর চোখে চোখ পড়তেই সে হেসে ফেলল, কোন কথা বলল না।

উদয় কি চিন্তা করছিল সে-ই জানে। দেখলাম তার চোখের দৃষ্টিতে গভীর তন্ময়তা।

মনে হল এই উপযুক্ত সময়। মৃদু কণ্ঠে ডাকলাম, উদয়!

অ্যাঁ,—

—তোমার কাজ স্নুরু করবে না ?

যেন কিছু বিস্মিত হয়েছে এমনি করে বললে, হ্যাঁ, এসেছেন তিনি ?

বললাম, তুমি লক্ষ্য কর নি, নইলে অনেকক্ষণ থেকেই সে তোমার সামনে রয়েছে। কৃষ্ণার মাথায় হাত রেখে বললাম, উদয় আমাদের পরম আপনার। আর শিল্পী, সে ত সাধারণ মানুষ নয়, লজ্জা কি দিদি ?

একটা স্বচ্ছ হাসির ছটায় উদয়ের সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে কি অরূপ ? ইনি-ই--

হ্যাঁ, আমার এই বোনটি-ই নেক্স্ট্ সাবজেক্ট্। ঐ ওর বাবা স্বর্গগত অযুতাশ্ম চৌধুরী, আর ঐ মা ; যাঁদের তুমি রংয়ে আর রেখায় বাঁচিয়ে তুলেছ।

কৃষ্ণা সসঙ্কোচে মৃদু হেসে বললে, আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার অনেক আগেই ঐ দু'খানা ছবির কথা অরূপদাকে বলেছিলাম। তোমার মনে নেই অরূপদা ?

কৃষ্ণার কথাটা এমনি খাপছাড়া শোনাল যে, উদয় আর আমি দু'জনেই হেসে ফেললাম। ইন্দ্রাণী মুখ টিপে হাসতে লাগল ; বলল, তোমাকে কিছুই বলতে হবে না কৃষ্ণাদি। আমরা সবাই জানি, দোষ যদি সত্যিই কারও থাকে, সে শুধু ওঁর। না দাদা ? বলেই ইঙ্গিতে আমাকে দেখিয়ে দিল।

উদয় তখনও মৃদু মৃদু হাসছে। হেসে বললাম, রাগ কর না ভাই। আগে থেকে নাম বলতে কৃষ্ণা কোনমতেই রাজী হল না।

কৃষ্ণা ঘোরতর আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইন্দ্রাণী সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি তা হলে থাক কৃষ্ণাদি। দাদা, আমরা ওঘরে যাচ্ছি। বলেই হাত দিয়ে পাশের ঘরখানি দেখিয়ে দিয়ে একবার মাত্র আমার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করে ধীরে ধীরে চলে গেল।

নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললাম, যাক্! একটা ভাবনা দূর হল। এখন উদয়ের হাতে টাকাটা তুলে দিতে পারলেই বাঁচি!

* * * *

পাশাপাশি দু'টি ঘর। খোলা জানালার মধ্য দিয়ে উদয়ের ছবি আঁকার আয়োজন প্রায় সবটুকুই চোখে পড়ছে।

কৃষ্ণা দাঁড়িয়ে আছে ঘরের এক কোণে চিত্রার্পিতার ন্যায়! আর শক্তিমান শিল্পী উদয়ভানু ধ্যান-স্তিমিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে আছে। চোখের সম্মুখে ঠিক এভাবে ছবি তুলতে কোন দিন কাউকে দেখিনি। বড় বিস্ময় লাগল, বড়ই অদ্ভুত!

পূর্বদিক থেকে অজস্র সূর্য্যালোক এসে কৃষ্ণার সর্ব্বাঙ্গে লুটিয়ে পড়েছে। ওর উজ্জ্বল দেহ-শ্রী ঝলমল করছে সেই

আলোয়। দক্ষিণ থেকে ছুটে-আসা দুরন্ত দমকা বাতাস ওর কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশ-পাশ আর আলম্বিত বস্ত্রাঞ্চল নিয়ে মাতাল হয়ে উঠল। মনে হল, ঐ বেপরোয়া উশৃঙ্খল হাওয়া আর ধ্যানমগ্ন শিল্পীর অন্তর্ভেদী রহস্যঘন দৃষ্টির সম্মুখে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়েছে ও। সহসা উদয়ের কণ্ঠস্বর শুনলাম, চোখ তুলুন!

কৃষ্ণা চোখ তুলে তাকাল; কিন্তু দৃষ্টি তার উন্মুক্ত আকাশে ক্ষণকাল স্থির হয়ে থেকেই ধীরে ধীরে দিগন্ত রেখায় নেমে এল।

বললাম, তুমি বরং কৃষ্ণার কাছে যাও ইন্দ্রাণী। একা ওর ভারি লজ্জা হচ্ছে।

হলেও উপায় নেই, অনুত্তেজিত কণ্ঠে ইন্দ্রাণী উত্তর করলে, ছবির কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ও ঘরে কারও যাওয়া চলবে না।

হেসে বললাম, এও বুঝি তোমাদের একটা হুকুম?

ইন্দ্রাণী খোঁচাটুকু লক্ষ্য করল। কয়েক মুহূর্ত্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আমাকে নিঃশব্দে শাসন করে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে চাপা গলায় বলল, 'তোমাদের' নয়, বলুন 'তোমার'! হ্যাঁ, এ আমার হুকুম। হল তো? বলেই ফিক্ করে হেসে ফেলল।

বেশ গম্ভীর হয়ে বললাম, ইন্দ্রাণী, আমাকে আর তুমি ভয় কর না, না?

ইন্দ্রাণী বোধকরি হঠাৎ এ কথার অর্থ বুঝতে পারল না ; বলল, কেন ?

—কেন, তুমিই জান ! হয় তো আমার মধ্যে অসাধারণ কিছু দেখতে পাও নি তাই !

যদি তাই হয়, আমার ভুল হয় নি নিশ্চয়ই ?

না, ভুল তোমার হয় নি। বরং আমার দুঃখ হচ্ছে তোমার কথা ভেবে যে, নিতান্তই ভাগ্যদোষে এমন একজনের সঙ্গে তুমি জড়িয়ে পড়লে যে সত্যই তোমার বন্ধুত্ব দাবী করবার যোগ্য নয় ! পণ্ডিতেরা একে বলেছেন ভাগ্যের পরিহাস !

ইন্দ্রাণী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল ; তারপর অতি মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, থাক্ মাফ চাইছি। আর কোনদিন কোন কথা বলব না।

কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম ; কিন্তু সেই সঙ্গে মনে মনে খুশীও হলাম। ইন্দ্রাণী ততক্ষণে দু'এক পা এগিয়ে গেছে। হঠাৎ উঠে গিয়ে পিছন থেকে ওর দীর্ঘ বেণীটা টেনে দিয়ে বললাম, দেখি মুখ !

আঃ ! ছাড়ুন !—বলেই ইন্দ্রাণী চোখের পলকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। এ যে তিরস্কার ! অথচ এর কোন যথার্থ হেতু আমার চোখে পড়ল না। নিজের যায়গায় ফিরে এসে নিঃশব্দে বসে রইলাম। কত কথা যে

মনে হল তার ঠিক ঠিকানা নেই। ইন্দ্রাণীকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয় আমি নিরুপায়। কিন্তু এছাড়া কোন দিন কোন ছলে বিন্দুমাত্র অসংযমের পরিচয় দিয়েছি বলেও আমার স্মরণ হল না। আর কেউ না জানুক, নিজের কাছে আজ অন্ততঃ গোপন নেই ইন্দ্রাণী আমার কতখানি। কিন্তু তাই বলে নিঃস্বের দীনতা নিয়ে তো তার কাছে হাত পাতি নি!

কতক্ষণ এমন করে বসে ছিলাম খেয়াল ছিল না, শুনলাম, ডান হাতটা আর একটু উঁচু করতে হবে। না, না, ওভাবে নয়: পাশের ওই হাতলটা ধরে থাকুন।

চেয়ে দেখি কৃষ্ণা, তার নির্দ্দেশমত হাতটি উঁচু করে রাখল।

—নাঃ! আপনি কাজ করতে দেবেন না দেখছি। আরার চোখ নামালেন তো?—উদয়ের কথায় রীতিমত বিরক্তি।

কৃষ্ণার কুণ্ঠিত বিব্রত কণ্ঠ-স্বর শুনতে পেলাম, কি করে আর চাইব, বলুন না?

—ভয়ঙ্কর সমস্যা! কি বলেন? বিরক্ত হয়েও উদয় হেসে ফেললে। আচ্ছা শুন্নুন, সোজা আমার মুখের দিকে তাকান। এমন ভাবে তাকানো চাই যাতে মনে হবে এক আমি ছাড়া আর কোন বস্তুতে আপনার লক্ষ্য নেই।

কে যেন সহসা মুঠো মুঠো আবীর মাখিয়ে দিয়েছে, এমনি রাঙা হয়ে উঠল কৃষ্ণার সমস্ত মুখ। তাকান দূরে

থাক, মনে হল বিষম লজ্জার ভারে তার চোখের পাতা নুয়ে পড়েছে। চেষ্টা করেও সে চাইতে পারছে না। এক মুহূর্ত্ত পর সে যতদূর সম্ভব নিজেকে সহজ করে নিয়ে বললে, বুঝেছি : কিন্তু কাজটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

—কেন? এ আর শক্ত কি?

কৃষ্ণা সলজ্জ মৃদু হাস্যে উত্তর দিল, সে আপনি বুঝবেন না। আপনার তো কোন দিন এমন করে সিটিং দিতে হয় নি?

—না।

—তাইতো বললাম! কৃষ্ণা হেসে ফেলল।

কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়ে এতক্ষণে ও সহজ হয়ে এসেছে।

—নিন, যা বলছিলাম—উদয় তুলিতে খানিকটা রং মাখিয়ে ক্যান্‌ভাসের দিকে এগিয়ে গেল। অতি ধীরে সঞ্চালিত হল শিল্পীর নিপুণ তুলিকা। তারপর সঞ্চরমাণ অজস্র রেখা কখন দক্ষিণে, কখন বাঁয়ে, কখন বা অতি অকস্মাৎ মুহুর্মূহু দিক পরিবর্ত্তন করে তির্য্যক গতিতে ছুটে চলল ক্রমপরিস্ফুটমান এক নারীদেহের প্রান্তসীমা অবধি।

চক্ষুর পলকে যেন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হল। বিস্ময়াবিষ্ট নেত্রে চেয়ে দেখলাম রংয়ে আর রেখায়, আলোয় আঁধারে সেই বিশাল বিস্তৃত পটভূমিতে তিল তিল করে বন্দী হতে চলেছে কৃষ্ণা।

নিবিড় কাল মেঘের ন্যায় তার দীর্ঘ চিকুর ক্ষীণ কটিতট অতিক্রম করে নেমে এসেছে বহু নিম্নে। স্তরে স্তরে লুটিয়ে পড়েছে অলকগুচ্ছ মুখের দু'পাশে রাশি রাশি পুষ্প-স্তবকের মত। ধীরে ধীরে ফুটে উঠল তার মুখের সীমান্ত রেখা, ফুটল ভ্রূ···নাক···ঠোঁট···আর শুভ্র মরাল গ্রীবা।

সহসা উদয়ের দিকে চোখ পড়তেই মনে হল, এ যেন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ। পরম একাগ্র, পরম গম্ভীর···সৃষ্টির তাগিদে আত্মবিস্মৃত এক অপরাজেয় চিত্রশিল্পী।

একটুও নড়বেন না যেন! শিল্পীর কণ্ঠস্বরে গম্ভীর আদেশ।

কৃষ্ণা যথাশক্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল উদয়ভানুর দিকে চেয়ে। ওর চোখের দৃষ্টি অসহায় একাকীত্বের গুরুভারে আনত হয়ে আসছে বারংবার।

হঠাৎ গর্জ্জন করে উঠল উদয়, একেবারে অপদার্থ মেয়ে আপনি! চোখটা নষ্ট করে দিলেন তো? এবার ঘুমোন গে, যান! সিটিং দেওয়া আপনার কাজ নয়।

দেখলাম কৃষ্ণা একথায় বিচলিত হলেও তার মুখের হাসি মিলায় নি! আড়চোখে একবার নিজের ছবিটা দেখে নিয়ে বললে, বাঃ! আমি ত ঠিকই চেয়ে ছিলাম।

—আপনার খুশীমত চাইলে হবে না, চাইতে হবে আমার নির্দ্দেশ মেনে! চাপা ক্রোধের আভাস পেলাম ওর কথায়।

কিছুকাল মৌন হয়ে থেকে বললে, এই শেষ বারের মত আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি কেমন করে আপনাকে দাঁড়াতে হবে। ডান হাতটি আগের মত উঁচু করে রাখুন।...হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। মাথাটা আর একটু তুলতে হবে,...আরো... আরো একটু! নাঃ! হল না। দাঁড়ান! দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে এসে উদয় ছু'হাতে কৃষ্ণার মুখখানি তুলে ধরে বললে, ঠিক এইটুকু, বুঝলেন? আর,—ছু'একটি চুর্ণ-কুন্তল কৃষ্ণার আরক্ত কপোল থেকে সন্তর্পণে সরিয়ে দিয়ে বললে, আঁচলটা আর একটু বাঁ দিকে সরিয়ে নিন। উদয় ফিরে এসে নিজের যায়গায় দাঁড়াল। তারপর পরিপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কৃষ্ণাকে দেখে নিয়ে মৃদু গম্ভীর স্বরে বললে, আশ্চর্য্য আপনার রূপ! ইন্দ্রাণী বলতো এত রূপ আর কোথাও নেই। কথাটায় তখন কান দিই নি, কিন্তু এখন দেখছি ওর চোখ আছে।

অপরের কথা জানিনে। অন্ততঃ আমি একথা জোর করেই বলতে পারি, রূপের এ প্রশংসা লোভী পুরুষের সস্তা ভাবোচ্ছ্বাস নয়, এ শুধু সৌন্দর্য্যের তীর্থদ্বারে মুগ্ধ শিল্পীর নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা নিবেদন।

কৃষ্ণার তখনকার মুখের চেহারা বর্ণনার বস্তু নয়। তার ইষৎ উঁচুকরা ডান হাতখানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। জীবনে এমন করে যেন কোনদিন ও নিজেকে বিপন্ন মনে করে নি, এমনি অসহায়,

কুণ্ঠিত অভিব্যক্তি ওর সর্ব্বাঙ্গে। অথচ যাকে নিয়ে তার এই অপরিসীম লজ্জা, তার মনের কথা একবর্ণও বোঝা গেল না।

এই অসীম শক্তিশালী পুরুষটির ওপর তার মনোভাব আমার অজানা নয়। জানি, ভয়ে ভয়ে এমন করে তাকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে তাকেই সে একান্ত করে কামনা করে। তাই তো তার এ সঙ্কোচ, এ বিষম লজ্জা। তাই সে উদয়ের কর-স্পর্শে বারংবার শিউরে উঠেছে।

হঠাৎ খেয়াল হল সূর্য্য মাথার ওপরে উঠে এসেছে: বেলা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি। ইন্দ্রাণী সেই যে চলে গেছে আর আসে নি। বড় বিশ্রী লাগল। যা'ই কেন না ঘটুক এ বাড়ীতে সে অতিথি ছাড়া আর কিছু নয়। তাই তার এই অকারণ দূরে চলে যাওয়া আমাকে শুধু ব্যথাই দিয়েছে: কিন্তু আমার নিঃশব্দ উপেক্ষা তাকে অপমানিত করবে।

কথাটা মনে হতেই উঠে পড়লাম। একবার সন্ধান নেওয়া দরকার। মিনিট খানেক পরে গজাননের মুখ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করলাম তা একদিকে যেমন পীড়াদায়ক আরেকদিকে তেমনি উদ্বেগ-সংকুল।

শুনলাম, ঘণ্টা খানেক আগে কারা দু'টি অচেনা যুবক হঠাৎ এসে এ বাড়ীতে উপস্থিত হতেই ইন্দ্রাণী তাদের সঙ্গে চলে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু বলে যায় নি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ! বললেন, আর হয়তো শীগগির আসা হবে না গজানন, তোমাদের ছোটবাবু জানতে চাইলে বল।

—আর কিছু বললে না ?

—আজ্ঞে না। সময় হল না যে! ছোট দিদিমণি—

হঠাৎ ভয়ানক ধমকে উঠলাম, চুপ কর হতভাগা! তোকে আর পণ্ডিতি করতে হবে না।

গজানন অপরাধীর মত মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওর সত্তর বছরের অভিজ্ঞতায় এমন সঞ্চয় ছিল না, যাতে আমার আকস্মিক ক্রোধের হেতু ও খুঁজে বের করতে পারে।

একেবারে সোজা উদয়ের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, ইন্দ্রাণী চলে গেল যে ?

ছবির কাজ তখনকার মত শেষ হয়েছিল। উদয় তুলি রেখে দিয়ে আমার দিকে তাকাল। তার পর ঈষৎ হেসে বলল, বাংলার সীমান্ত পার হয়ে সংবাদ এসেছে, সেখানকার পাথুরে জমি এতদিনে তাজা রক্তে ভিজে নরম হয়ে উঠেছে। কিছু ভাল বীজ ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। সেই খোঁজেই গিয়েছে ইন্দ্রাণী। কেন, তোমাকে বলে যায়নি বুঝি ?

—না। কিন্তু তুমিও তা হলে এখনি চলে যাচ্ছ ?

—হ্যাঁ। তবে সন্ধ্যায় ফিরে আসছি। ছবির কাজ অনেকখানি বাকী রইল।

কৃষ্ণার চোখ দেখে মনে হল উদয়ের কথার অর্থ এক বিন্দুও সে বুঝতে পারে নি। ধীরে ধীরে বলল, আপনাদের কিন্তু আজ এখানে খাওয়ার কথা ছিল।

নিশ্চিন্ত থাকুন। ও ব্যাপারে আমার কোনদিন ভুল হয় না।—উদয় মৃদু হেসে বলল। তারপর আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, অরূপ, তুমি একবার শ্যামসুন্দর বাবুদের বাড়ীটা ঘুরে এস। আমার জন্য ওঁরা নাকি ভয়ানক অস্থির হয়ে পড়েছেন।

এমন গম্ভীর মুখে সে কথা বলল যে কৃষ্ণাও হাসি লুকোতে পারল না; বলল, আপনাকে ওরা অত্যন্ত ভালবাসে।

উদয় হেসে উঠল সশব্দে। পরে হাসি থামিয়ে বলল, না, না, হাসির কথা নয়। এমনি আরো দু'একজন ধনীর কাছ থেকে যে উগ্র অভ্যর্থনা এসেছে, তাতে মনে হয় কুঁড়ে ঘরে থাকাও আর বেশীদিন সম্ভব হবে না।

—কেন? আপনি তাদের কি করেছেন?

সহজ ভাবে কথাটা জানতে চাইলেও তার উৎকণ্ঠা গোপন রইল না।

উদয় সকৌতুকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল কৃষ্ণার মুখের দিকে। তারপর ঈষৎ হাসিমুখে বলল, কি করেছি? কিন্তু সে তো আপনাকে এক কথায় বলতে পারব না; আর বললেও আপনি শুনে খুশী হবেন না।

—তার চেয়ে বলুন আমি ওকথা শুনবার যোগ্য নই!

—এই দেখুন, আপনি রাগ করলেন। বেশ, শুনুন। যে সম্পদে একজনের সত্যিকার অধিকার আছে, মনে করুন, এত কাল সে তা জানতে পারে নি। অথচ সে যখন দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের অভাবে তিল তিল করে শুকিয়ে মরছে, মানুষ হয়েও নিজের দিকে ফিরে তাকাবার অবসর পেল না কোনদিন,······একটিবার জানতে পারল না কত বড় ক্ষমাহীন অবিচারের চাপে তার সমস্ত মনুষ্যত্ব বিকৃত হয়ে পড়েছে, তখন তারই চোখের সম্মুখে অবাধে চলেছে অপচয়ের লজ্জাহীন বিলাস।

—না, না, ! এমন কখনও চলতে পারে না। কৃষ্ণার কণ্ঠস্বর মমতায় সিক্ত হয়ে ওঠে।

—কিন্তু তাই তো চলে আসছে চিরকাল। এ নিষ্ঠুরতা কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ অনুভব করে নি।

তবেই বুঝে দেখুন, আমি যদি তাকে বলি, তুমি দরিদ্র নও, ঐ যে ওখানে রয়েছে তোমার ঐশ্বর্য্য কসাইয়ের হাতে বন্দী হয়ে। মরেই তো যাচ্ছ! একবার চেষ্টা করে দেখ যদি তোমার জিনিষ তুমি ফিরে পাও···তা হলে সেই পরস্বভোগী ধনী বন্ধুটি আমাকে ফুলের মালা দেবে না নিশ্চয়ই ?

—কেন, সে তো তার একলার জিনিষ নয়? কৃষ্ণা অধীর হয়ে বলে উঠল।

উদয় হেসে ফেলল, কিন্তু মুস্কিল হল এই সোজা কথাটা সে বুঝতে চায় না।

ব্যথিত স্বরে কৃষ্ণা ধীরে ধীরে বলল, এ ত সত্যিই অন্যায়। একজন করবে সারা জীবন অপব্যয় আর...

—কিন্তু এমনি করেই তো সহস্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে একজনের সঞ্চয় ভারী হয়ে ওঠে। নইলে দেখুন না, টাকা নিয়ে তো মানুষ জন্মায় নি। মাটি, জল, আর বতাস, এও কারো একলার হতে পারে না।

—কিন্তু সকলের বেলা তো ও কথা সত্যি নয়। এমনও তো দেখা যায় যে একজন ধনী হয়েও নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় করেন নি, পরের জন্য সারা জীবন মুক্ত হস্তে দান করে গেছেন? তিনি? কৃষ্ণা অনেকখানি উৎসাহ নিয়ে বলল।

—তিনি নিরীহ ভালমানুষ। কিন্তু একথা কি একদিনও আপনার মনে হয়নি যে, দানের মধ্য দিয়ে আর একটা যে বস্তু নির্লজ্জের মত উঁকি মারে, সে দান-গ্রহণের দৈন্য? তাইতো একথা ভুলতে পারি নে, পরস্ব-লুণ্ঠন অপরাধ; কিন্তু দৈন্যকে দানের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখা তার অপেক্ষাও গুরুতর অপরাধ। প্রথমটা শুধু আঘাত করেই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু দ্বিতীয়টা মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে নিঃশেষে বিলুপ্ত করে। পলিটিক্সের নিষ্ঠুর বিচারে আপনার ঐ ভালমানুষটি রেহাই পাবেন না, মিস্—

আমি ক্রিশ্চান নই, নাম ধরে ডাকতে পারেন, কৃষ্ণার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল। তথাপি প্রাণপণে আপনাকে

সংযত করে ও শেষ চেষ্টা করে বললে, তবু, এ কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে টাকা থাকলেই সকলের টাকার লোভ থাকে না? প্রয়োজন হলে অনেকে তা বিলিয়ে দিতেও পারে?

কথা শুনে উদয় হাসিমুখে বললে, পারে? বেশ তো! এখনই তার পরীক্ষা হোক। আপনার তো অনেক আছে, আর গরীব দুঃখীরও কিছু অভাব নেই। তাদের হয়ে আমিই চাইছি; দিন না বিলিয়ে আপনার যা কিছু আছে? বলেই এক মুহূর্ত্ত কৃষ্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল।

কিন্তু কৃষ্ণা এ হাসিতে যোগ দিল না। বাইরের দিকে মুখ করে নিরুত্তরে বসে রইল। তার অসহায় অবস্থা দেখে অল্প হেসে বললাম, তুমি যত খুশী হাসতে পার, তবু আমি জানি ও সত্যিই দিতে পারে। কিন্তু তোমার হাতে সে-অর্থের অপচয় হবে না, এ প্রমাণ তো কৈ দিতে পার নি?

সহসা কৃষ্ণা যেন লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল; ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, না, না, ছিঃ! এ তুমি কি বলছ অরূপদা! ওকথা একবারও মনে হয়নি আমার।

উদয় একেবারে উঠে দাঁড়াল; বলল, আর নয় অরূপ, অনেক বেলা হল, কৃষ্ণাকে লক্ষ্য ক'রে হেসে বলল, আমি কিন্তু আপনার নিন্দে করি নি। আচ্ছা চললাম; নমস্কার।

উদয় চলে গেল। কৃষ্ণা কোনমতে তাকে প্রতিনমস্কার করে সেই যে একভাবে মাথা গুঁজে বসে রইল, একবারও মুখ তুলে চাইল না।

প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বললাম, অমন করে বসে থাকিস নে কৃষ্ণা; ওঠ। আমাকে আবার বাইরে যেতে হবে।

—চল, কৃষ্ণা অত্যন্ত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

শ্যামসুন্দর-প্রাসাদে যখন এসে পৌঁছলাম বেলা তখন অপরাহ্নের কাছাকাছি। অসহ্য গরমে সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু আলোর চিহ্ন নেই, আকাশ এমনি কাল মেঘে ঢাকা।

ওপরে সংবাদ পাঠিয়েছি, এখনও ডাক আসেনি। ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চাইছি। উদয় সন্ধ্যাবেলা আসবে। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা চলবে না। আজই দুপুর বেলা সে যে সাচ্চা মালের ইঙ্গিত দিয়ে গেল তাতে মারাত্মক কিছু ঘটা অসম্ভব নয়।

—আপনি ওপরে আসুন বাবু!

চেয়ে দেখি ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে একটি অল্প বয়সের ছেলে। বললাম, চল। তুমি নতুন এসেছ বুঝি?

—আজ্ঞে না! আমি তো এ বাড়ীতে কাজ করিনে!

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে?

উত্তরে সে যা বললে তা সংক্ষেপে এই: শ্যামসুন্দর বাবুর অসুখটা দিন দুয়েক আগে হঠাৎ বাড়াবাড়ির দিকে যায়। ইঞ্জিনিয়ার অরুণ প্রথমে দূরে থেকে অর্থ সাহায্য দিয়ে, পরে স্বয়ং নিজে এসে অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করেছে। কিশোর ভৃত্য তারই পার্শ্বচর।

অরুণের এ বাড়ীতে আসা-যাওয়া বহু দিনের পুরানো ইতিহাস। কোথায় তার মধু-চক্র তাও কারো জানতে বাকী নেই। তথাপি ইভার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে যে-ভয়ানক বিষাক্ত দংশন তাকে সহ্য করতে দেখেছি, শুধুমাত্র চোখের নেশা বা দেহ-লালসার প্রলেপ দিয়ে সে-ক্ষত নিরাময় হতে পারে, আজ আমার পক্ষে এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। বরং মনে হল, ইভাকে পাবার জন্য তার এই অক্লান্ত চেষ্টার মধ্যে আর যা কিছুই থাক প্রবঞ্চনা নেই।

ওপরে এসে রোগীর পাশে দাঁড়াতেই ইভা ম্লান হেসে বললে, বসুন। কৃষ্ণা এলো না?

বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হল। বললাম, না। ক'দিন থেকেই ওর শরীর ভাল নেই। কেমন আছেন উনি? আপনার বাবা?

—ভাল নেই, ইভা ম্লান কণ্ঠে বললে। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, মিল আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল শুনেছেন বোধহয়?

এ সংবাদ আমার জানা ছিল না। বিস্মিত হয়ে বললাম, না!

ওর গলা যেন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল; বলল, দেনা শোধ হল না বলে ব্যাঙ্ক মাত্র তিন দিন আগে মিলের পজেসান্ নিয়েছে। এদিকে দুঃসময় দেখে পাওনা টাকার একটি পয়সাও কেউ দিলে না।···

ভিতরে ভিতরে যে অবস্থা এমন যায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, উদয় একবারও আমাকে একথা বলে নি। বলবার মত কোন কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলাম।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ইভাই পুনরায় বলতে শুরু করল, আগে থেকেই বাবার শরীর দুর্ব্বল ছিল। তার ওপর এই আকস্মিক আঘাত! সংবাদ শুনে সেই যে শয্যায় লুটিয়ে পড়লেন, আর জ্ঞান হল প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে।

সহসা শ্যামসুন্দর বাবু ক্ষীণকণ্ঠে কি বললেন বোঝা গেল না। দেখলাম ইভা উঠে দাঁড়াল; তার পর আমার দিকে চেয়ে, একটু বসুন···বলেই কক্ষান্তরে চলে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল অরুণ। পরিচ্ছদে কোথাও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন নেই; শুধু রাত্রি জাগরণের একটা অস্পষ্ট ছাপ পড়েছে চোখের নীচে। বললে, গুড্ ইভিনিং! কখন এলেন মিষ্টার ব্যানার্জ্জী? তারপর ঘরের চতুর্দ্দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, ভ্যেরি ষ্ট্রেইঞ্জ্! নার্স এখনো আসে নি?

বললাম, না ! ইভাই তো বসেছিলেন এতক্ষণ। এই মাত্র উঠে গেলেন।

অরুণ সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। পরে একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বললে, আই নো ! কিন্তু মিস্ চাটার্জ্জী আমাকে ভুল বুঝলেন। কি জানেন মিষ্টার ব্যানার্জী ? হাত দিয়ে শ্যামসুন্দর বাবুকে দেখিয়ে বললে, শুধু এঁকে এক দিন কথা দিয়েছিলাম বলেই আজ বিপদের দিনে ছেড়ে যেতে পারছি নে। উনি ভাল হয়ে উঠুন, আমি সেই মুহূর্ত্তেই এ বাড়ীর সকল সংস্পর্শ ছেড়ে যাব। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হেসে বললে,—শুধু আপনারা নন, আমি নিজেও জানি আমি ভাল নই। তবু বিশ্বাস করুন, জবরদস্ত প্রেমের মোহ আমার কেটে গেছে।

আজ এতদিন পরে সত্য সত্যই এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকটির জন্য অন্তরে বেদনা অনুভব করলাম। শুধু তাই নয়, বারবার এই কথাই মনে হল, যে-পুরুষ জীবনে নারীর একনিষ্ঠ ভালবাসা পায়নি, ভালবাসতে গিয়ে অভিমানে যার চোখ থেকে কোনদিন ঝরে পড়েনি এক ফোঁটা অশ্রুজল, সংসারের গহন অরণ্যে চলতে গিয়ে পদে পদে কঠোর সংগ্রামের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াবে সে কিসের জোরে ?

কিন্তু মনের কথা যা'ই হোক, নিতান্ত ব্যক্তিগত এই ব্যর্থ প্রেমের আলোচনা করবার সংকোচ কাটিয়ে উঠতে

পারলাম না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তার কি বলেন? সেরে উঠবেন তো?

—হ্যাঁ, আশা হচ্ছে আজ থেকে ভালোর দিকেই আসবেন। কথাটা শেষ করেই সে রোগীর একেবারে কাছে গিয়ে বসল; তারপর অতি সন্তর্পণে শ্যামসুন্দর বাবুর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে ডাকল, মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী!

শ্যামসুন্দর তন্দ্রা-জড়িত স্বরে উত্তর দিলেন, কে?

—আমি অরুণ। এখন একটু ভাল আছেন ত?

—আর ভাল! তোমার সংবাদ বল বাবা!—অতি ক্ষীণকণ্ঠের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

অরুণ তার ছোট ব্যাগের মধ্য থেকে একখানি কাগজ বের করে নিয়ে বললে, সংবাদ ভাল;...এই নিন আপনার বাড়ীর দলিল।

হঠাৎ শ্যামসুন্দর বাবু চোখ খুললেন, কৈ, দেখি?—হাত বাড়িয়ে তিনি দলিলখানি তুলে নিলেন। তারপর প্রায় একমিনিটকাল তার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে রইলেন। ধীরে ধীরে চক্ষু দু'টি তাঁর সজল হয়ে উঠল। নিঃশব্দে হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বললেন, এ টাকার ঋণ একদিন হয়ত পরিশোধ হবে, কিন্তু আজ যে তুমি আমাকে কত বড় দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি দিলে সে শুধু আমিই জানি। কি আর বলব বাবা! ভগবান

তোমাকে সুখী করবেন। অশ্রুসিক্ত চোখ 'তাঁর ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে এল।

ঢং ঢং করে প্রকাণ্ড দেয়াল ঘড়িতে সাতটা বেজে গেল। বললাম, আজ উঠি অরুণ বাবু। কাল বা পরশু পারিত একবার আসব। ·নমস্কার!

সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নেমে আসছি। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এত দূরে ছুটে আসা তার কিছুই জানা হল না। উদয়ভানুর সম্বন্ধে এদের মনোভাব আমার অজ্ঞাত রয়ে গেল। হঠাৎ শুনতে পেলাম ইভার চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠের দু'একটা কথা··· এ মহত্ত্ব দেখাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এ শুধু ইচ্ছে করে আমাকে জব্দ করা!—

—বিশ্বাস করুন, আমার তেমন কোন অভিসন্ধি ছিল না। আমি শুধু প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি। আপনার বাবাকে একদিন কথা দিয়েছিলাম, প্রয়োজন হলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াব। নইলে এতদিন এখানে আমাকে দেখতে পেতেন না। অরুণের কণ্ঠ-স্বরে উত্তাপ নেই।

—আপনার অশেষ দয়া! কিন্তু এ ঋণ শোধ হবে কি করে ভেবে দেখেছেন?—

—আপনার বাবাই শোধ করবেন।

—কিন্তু তা যদি সম্ভব না হয়?

—মিস্ চাটার্জ্জী! আপনি কি জানতে চাইছেন আমি বুঝতে পারছি নে। কিন্তু সে যা'ই হোক্, যদি ভাগ্যদোষে

ঋণ তিনি পরিশোধ করতে না পারেন, এ টাকার ওপর আমার কোন দাবী থাকবে না।—

—অসম্ভব! ইভা স্থান কাল ভুলে সহসা অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, আপনার নিঃস্বার্থ দান নিয়ে সারা-জীবন বেঁচে থাকা চলবে না। প্রতিদান আপনাকে নিতেই হবে।

—বেশ, বলুন আমি কি করতে পারি? আপনাদের অসম্মান আমি চাইনে। অরুণ অনুত্তেজিত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল।

ইভার শেষ কথাটা শোনা হল না। শুধু একটা অস্ফুট কান্নার শব্দ দূর থেকে কানে ভেসে এল।

*   *   *   *

বাড়ী এসে দেখি কৃষ্ণা আর ইন্দ্রাণী আমার ঘরে বসে গল্প করছে; উদয় চলে গেছে তার ছবি আঁকবার ঘরে। ইন্দ্রাণীকে আজ এখানে আশা করি নি, তাই এক দিকে যেমন মন খুশীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, অন্য দিকে তেমনি তার সকাল বেলার চলে যাওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়ে অভিমানও বড় কম হল না। ঘরে ঢুকেই কোনদিকে না চেয়ে গা থেকে জামাটা খুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে সজোরে নিক্ষেপ করলাম। ইন্দ্রাণী নিম্ন কণ্ঠে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ আমি এসে পড়ায় চুপ করে গেল।

সকালবেলা সেই রাগ করে চলে যাওয়ার পর থেকে কয়েক মুহূর্ত্ত আগে পর্য্যন্তও ইন্দ্রাণীকে সর্ব্বক্ষণ মনে মনে কামনা করেছি। অথচ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সে যখন আমার সম্মুখে এসে পড়ল, তখন তাকে অনায়াসে এড়িয়ে যেতেও আমার কোথাও কিছুমাত্র আটকাল না। নিজের মনের এই আকস্মিক গতি-পরিবর্ত্তনে বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল; কিন্তু সেই সঙ্গে ইন্দ্রাণীর ভাবান্তরটুকুও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করল না।

অন্য সময় হলে ও নিজেই এতক্ষণে হেসে কথা বলত। একের পর এক ওর অবিশ্রান্ত জিজ্ঞাসায় আমি উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। কিন্তু আজ ও একটা কথাও বলল না। যাক, এ ভালই হল যে এত সহজে ইন্দ্রাণী আপন ইচ্ছায় বহু দূরে সরে গেল। মনে মনে ভাবলাম,(দু'য়ের প্রয়োজনে না হলে, ভাল বাসা কিম্বা ভাল লাগা দূরে থেকেই ভাল। তাকে জোর করে ধরে রাখতে গেলেই আসে গ্লানি······ আসে পায়ে পায়ে বাধা।) কেবল একটা কথার উত্তর খুঁজে পেলাম না, কোথায় আমার অপরাধ! কেন হাসি মুখে বিদায় নিলে না ইন্দ্রাণী? বললে না, তোমার বন্ধুত্বের প্রয়োজন আমার শেষ হয়েছে?

এমনি আরও কত কি যে মনে এল তার ঠিক নেই। কিন্তু না—এমন করে নিজেকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ইন্দ্রাণীর দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে বললাম, তুই বুঝি এসব আর দেখিস নে, কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা চমকে উঠল ; বলল, কোন সব, অরূপদা ?

সোজাসুজি তার কথার উত্তর না দিয়ে বিরক্ত হয়ে বললাম, এ বাড়ীর চাকরগুলোও হয়েছে একেবারে বাদশাহ্‌জাদা ! সুযোগ পেলে সবাই দেখছি মাথায় উঠে বসে ! বলেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একেবারে উদয়ের কাছে উপস্থিত হলাম।

উদয় আমাকে দেখতে পেয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললে, এস অরূপ। কোন নূতন খবর পেলে ?

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সমস্ত কথা উদয়কে খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাঙ্ক মিলের পজেশান্‌ নিয়েছে, এ কথা তো আমাকে আগে বল নি ?

—বলবার মত কথা ত নয় ভাই ! আমাদের দায়িত্ব এতে বিন্দুমাত্র কমে নি। বরং এখন যিনি মালিক হবেন তিনি আমাদের পরিচিত নন ; আর অজ্ঞাত শত্রুকে অন্ধকার পথে গোখরো সাপের মতই ভয়ঙ্কর মনে করতে হবে। কে জানে, কতখানি তার শক্তি ! কোথায় সে প্রতিপক্ষের মাথা লক্ষ্য করে অতর্কিতে ছোবল মারবে ! কিন্তু এ আলোচনা থাক অরূপ। এ নিয়ে এখনো আমি চিন্তা করি নি। তুমি কৃষ্ণাকে তৈরী হয়ে আসতে বল ; ছবির কাজটা এগিয়ে যাক্।

অগত্যা এ প্রসঙ্গ তখনকার মত বন্ধ করে উঠে পড়লাম।

*   *   *

আধঘণ্টা পরে স্নান সেরে যখন নিজের ঘরে ফিরে এলাম,

মন অনেকখানি শান্ত হয়েছে! উদয়ের চিত্রাঙ্কন কক্ষটি এখান থেকেই চোখে পড়ে। চেয়ে দেখলাম, ছবি আঁকা সুরু হয় নি; কৃষ্ণা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকাল বেলার মত, দেহে যেন স্পন্দন নেই ওর। আর দক্ষ শিল্পী বিভিন্ন শক্তির বৈদ্যুতিক আলোক-রশ্মি তার চোখে মুখে, সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করে আপন প্রয়োজনের উপযোগী আলো ও আঁধারের বৈষম্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করছে। দূর হতে থেকে থেকে এই অত্যুজ্জ্বল আলোক-বিক্ষেপন, অনন্য-সাধারণ প্রতিভায় দীপ্তশ্রী তরুণ চিত্রশিল্পী উদয়ভানুর সন্তর্পিত সংযত পদক্ষেপ, আর তারই অনতিদূরে শ্বেত-মর্ম্মরে তৈরী দেবীমূর্ত্তির ন্যায় সালঙ্কারা কৃষ্ণা আমার মনে এক আশ্চর্য্য, অপার্থিব ভাবাবেগ সঞ্চার করল! মনে হল কে যেন অত্যন্ত অকস্মাৎ আমাকে সংসারের ক্লান্তিকর কোলাহলের বাইরে বিপুল বলে ঠেলে দিয়েছে। কোথাও ক্ষীণতম স্বার্থের একটি গ্রন্থিও নেই যেন, এমনি নিস্পৃহ, নিরাসক্ত অনুভূতি। সহসা ইন্দ্রাণীর কথা মনে পড়ল। মনে মনে বললাম, ইন্দ্রাণী, তোমাকে ভালবেসে দুঃখ পেয়েছি তাই আমার যথেষ্ট; কিন্তু তোমার যেন কোনদিন চোখের জল না পড়ে, তুমি সুখী হও!

ঘরে আলো জ্বালা হয় নি। সন্ধ্যার তরল অন্ধকারটুকু কেন যেন ভাল লাগছে। কতক্ষণ এমন ভাবে কাটত জানি না। সহসা দ্বার প্রান্তে এসে কে থেমে গেল। চমকে উঠে বললাম, কে?—

—কৃষ্ণাদি, দাদা,…এরা অনেক্ষণ থেকে বসে আছে। তাই জানতে এলাম চায়ের দরকার আছে কিনা। —ইন্দ্রাণীর স্বচ্ছ কণ্ঠস্বরে এতটুকু অস্পষ্টতা নেই।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ক্ষণপূর্ব্বের নির্ব্বিকার সংসার-বিরাগী মানুষটি এক নিমিষেই আমার মন থেকে মিলিয়ে গেল! হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরুল না, এমনি ওলটপালট হয়ে গেল সমস্ত মনের মধ্যটা। কিন্তু ঐ মুহূর্ত্ত মাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, যাচ্ছি, তুমি যাও।

ইন্দ্রাণী একভাবে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলল, আচ্ছা, শুধু শুধু এই যে ব্যাপারটা করছেন, এর অর্থ কি?

বললাম, কৈ, কিছুই ত করি নি!

—আর কি করবেন শুনি? কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ বাড়ীশুদ্ধ লোকের ওপর রেগে আগুন! জামাটা ছুঁড়ে ফেললেন, কৃষ্ণাদিকে অমন করে বকলেন…আর আমার সাথে ত মুখ দেখাদেখিই বন্ধ করলেন। এতে যে আমার কতবড় অপমান হয় আপনি বোঝেন না? তা ছাড়া দাদা কৃষ্ণাদি…এরাই বা কি ভাবছে বলুন ত? ছিঃ! ছিঃ! লজ্জায় অপমানে আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে!

বললাম, মিথ্যে অপবাদ দিও না; কাউকে অপমান করিনি আমি।

—করেন নি?

—না।

ইন্দ্রাণী মৃদু হেসে বলল, বেশ, কথা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু এখন আর একটি কথাও নয়, উঠুন। আপনার জন্য কারও চা খাওয়া হয় নি।

গম্ভীর হয়ে উত্তর করলাম, অন্যায় করেছ, এখনি যাও।

ইন্দ্রাণী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, যাই। আপনি আসুন তা হলে?

—এক মিনিট দেরী হবে। কিন্তু তার আগে একটা কাজ করে দাওত।

—কি! খানিকটা বিস্ময় ওর কণ্ঠে।

—আমার মাথার কাছেই সুইচ্ রয়েছে। আলোটা জ্বেলে দিয়ে যাও।

হঠাৎ হেসে ফেললে ইন্দ্রাণী। পরক্ষণেই দু'এক পা এগিয়ে এসে গম্ভীর হয়ে অত্যন্ত নিচু গলায় বললে, পারব না আমি। তা ছাড়া, এসব দুষ্টবুদ্ধি না ছাড়লে আর কোন দিন কাছে আসব না! বলেই মুহূর্ত্তমধ্যে আলো জ্বেলে দু'চোখে বিদ্যুৎ ছিটিয়ে দিয়ে দ্রুত বেগে ঘর থেকে চলে গেল।

একটু আগেই মনে হয়েছিল, ইন্দ্রাণীকে ভালবেসে শুধু দুঃখই পেলাম; কিন্তু এখন, ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় এক সঙ্গে বলে উঠল, ভুল...ভুল বুঝেছ অরূপ! ঐ দুঃখের মাঝেই রয়েছে তোমার অমৃতের সন্ধান। অথচ কতটুকুইবা সময়! ওর দ্রুতচলমান দেহের পানে

তাকিয়ে সহসা মনে পড়ে গেল মহাকবির কথা···সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব···সার্থক লেখনী! সার্থক তার রূপের কল্পনা!

*　　　*　　　*

রাত প্রায় দশটা। চোখের সামনে একখানা বই তুলে ধরে ইন্দ্রাণী চুপ করে বসে ছিল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম ঘরের বাইরে নিঃশব্দে ছবির দিকে চেয়ে। কখনো পায়চারি করছিলাম লম্বা খোলা বারান্দায় অতি সন্তর্পণে, পাছে শিল্পীর ধ্যান ভেঙ্গে যায়।

মাঝে মাঝে উদয়ের গম্ভীর কণ্ঠের আদেশ কানে আসছিল আর সেই সঙ্গে কৃষ্ণার কুণ্ঠিত মৃদু হাসির শব্দ। একটা কথা কিন্তু বারে বারেই মনে হচ্ছিল, সে কৃষ্ণার আগামী দিন-গুলোর কথা। পরিচয়ের প্রথম মুহূর্ত্ত থেকে সে এই আশ্চর্য্য পুরুষটিকে করেছে ভয়; দূর থেকে দিয়েছে শ্রদ্ধা, দিয়েছে নারী-হৃদয়ের প্রথম ভীরু ভালবাসা। আজ বহু বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই বলিষ্ঠ পুরুষ সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তার তুর্ব্বার আকর্ষণ নিয়ে। তুজনের মাঝখান হতে দূরত্বের অন্তরাল ঘুচে গেছে। ভয়ে, সঙ্কোচে ও আনন্দে কৃষ্ণার মনে আজ যে ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে সে আমার চোখ এড়ায় নি। কিন্তু তারপর? এ প্রশ্ন নিজেকে বহুবার করেছি। জবাব

কিন্তু খুঁজে পাই নি কিছু। কেবল সমগ্র ইচ্ছাশক্তি একান্ত করে বার বার আশীর্ব্বাদ করেছি ও যেন সুখে থাকে, ভালবেসে ওকে যেন দুঃখ পেতে না হয়।

বাইরের দিকে চক্ষু ফিরিয়ে নিলাম। জন-বিরল দীর্ঘ রাজপথ তন্দ্রালু হয়ে এসেছে; চলার বিরাম নেই তবু। বহুদূরে বাঁক ঘুরে ঘুরে দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি শ্রান্ত হয়ে ফিরে এল।

ঊর্দ্ধে উন্মুক্ত আকাশের পানে চেয়ে দেখলাম, সে আর এক বিস্ময়! মনে হল কোটী কোটী আলোক-বৎসরের ব্যবধান তুচ্ছ করে অগণিত নক্ষত্রের উজ্জ্বল নীলাভ রশ্মি, মানুষের কানে কি এক রসসম্ভ্রময় বার্ত্তা বহন করে আনছে। সীমাহীন মহাশূন্যে দীর্ঘ, ধূসর ছায়াপথ ঈষৎ বক্ররেখায় পরিদৃশ্যমান। ভাবলাম, জীবনের সঞ্চার-পথও বুঝি অমনি ধূসর, উহাপেক্ষাও সর্পিল। ধীরে ধীরে ডাকলাম, ইন্দ্রাণী!

ইন্দ্রাণী বই বন্ধ করে কৃষ্ণার ছবির দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল। হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠল, কি?—

—বড় ভয় হচ্ছে আমার।

—কেন? গভীর মমতায় সিক্ত ওর কণ্ঠস্বর।

—কেন জানি না। শুধু মনে হয় জীবনে একটি দিনের তরেও মানুষের ভাগ্যে বুঝি পরিপূর্ণ শান্তি আসে না। নইলে দেখ না, সংসারে আপন বলতে যারা ছিল, একের পর এক তাদের হারিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে যেদিন পথে নেমে

এলাম, সেদিন পিছু ডাকবার কেউত ছিল না। একমাত্র নিজের ভাগ্য ছাড়া সেদিন আর কারো ওপর অভিমান করবার জোর পাই নি। কিন্তু তবু কি নিষ্কৃতি পেলাম? কোথা হতে এলো কৃষ্ণা, তার দীর্ঘ ভবিষ্যতের কঠোর দায়িত্ব মাথায় নিতে হল। এলো উদয়, তার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ নিয়ে; বন্ধুত্ব তার ফিরিয়ে দিতে পারি নি। তারপর···সর্ব্বশেষ এলে তুমি, আমার ছন্নছাড়া জীবনের কল্পনা-লক্ষ্মী, সুধার পাত্র হাতে নিয়ে। না না,···তুমি অমন করে থেকো না ইন্দ্রাণী! মুখ তোলো, আমার দিকে চাও।

ইন্দ্রাণী কিন্তু মুখ তুলতে পারল না। শুধু লুটিয়ে পড়া আঁচলখানি তুলে নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল। অনেক দূর থেকে কোন নিশাচর পাখী কর্কশকণ্ঠে প্রহর ঘোষণা করে চলে গেল। চেয়ে দেখলাম, শিল্পীর তুলির গতি মন্থর হয়ে এসেছে। আর কৃষ্ণা? এতক্ষণে সে আপনাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিয়েছে অজস্র বিচিত্র রেখায়।

এক মুহূর্ত্ত ইন্দ্রাণীকে দেখে নিয়ে বললাম, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। তোমাকে দুঃখ দিতে চাই নি আমি। শুধু মনে হয় এ-স্বপ্ন বুঝি ভেঙ্গে যাবে।

কখন যে আমার চোখের কোণ বেয়ে অশ্রু নেমে এসেছিল, আমি জানতে পারি নি।

অতি ধীরে ধীরে উঠে এলো ইন্দ্রাণী। আমার একান্ত কাছে এসে দাঁড়াল।

তারপর তার আয়ত চোখের উদ্বেল অশ্রু প্রাণপণে সংযত করে আঁচল দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, ইন্দ্রাণীর চোখের জল না দেখলে কি তৃপ্তি হয় না ?

ওর সুরভিত নিশ্বাস আমার চোখে মুখে এসে লাগছে পরিপূর্ণ স্নেহে। ওর নরম আঙ্গুলগুলো আমার চুলের মধ্যে অপূর্ব্ব মমতায় ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছিল। রেশমের মত কোমল ওর আলুলায়িত দীর্ঘ চুলের কয়েকটি গুচ্ছ আমার চোখের ওপরে এসে পড়েছে। আমি নিঃশব্দে চোখ বুজে রইলাম।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী বললে, আজ আমরা চলে যাচ্ছি। ওর কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ গোপন রইল না।

সচকিত হয়ে চাইলাম, বললাম, কোথায় ?

ম্লান মুখে ইন্দ্রাণী বললে, দাদার গতিবিধি বিনা প্রয়োজনে কারো জানবার অধিকার নেই। শুধু চলে যাব এইটুকুই জানি।

—কবে ফিরে আসবে ?

ইন্দ্রাণীর মুখে বেদনার হাসি ফুটে উঠল, বললে, ঠিক জানিনেত ! হয়ত দু'চার দিন, হয়ত তারও বেশী ; কিম্বা আর হয়ত ফেরাই হবে না ! সেও কিছু আশ্চর্য্য নয় !

এক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললাম, না, আশ্চর্য্য নয়, তবে অসম্ভব।

—কেন ?—হাসি মুখে জিজ্ঞাসা করল ইন্দ্রাণী। বললাম, আমার হয়ে নিজেই নিজের কাছে এ প্রশ্নের উত্তর দিও। আর কোনো কথা না বলে ও চুপ করে রইল।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্ত থেকে উদয় ডাকল, অরূপ! ঘুমোলে নাকি হে? বলতে বলতে সে আমাদের সামনে এসে একখানা চেয়ারে বসে পড়েই আমাকে দেখিয়ে বললে, কি হল? অসুখ করেছে নাকি?

কখন যে ছবি আঁকা শেষ হয়েছে, লক্ষ্য করিনি। আমি কিছু বলবার আগেই ইন্দ্রাণী হেসে বলল, নাঃ, একটু নিশ্চিন্ত বিশ্রাম নিচ্ছিলেন।

বললাম, মিথ্যে কথা বল না ইন্দ্রাণী। এতক্ষণ তোমার সঙ্গে তর্ক করিনি?

তিন জনেই হেসে উঠলাম। উদয় সহসা গম্ভীর হয়ে বললে, কৃষ্ণাকে বলেছি অরূপ, কিছুদিনের জন্য আমরা বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু প্রয়োজন হলে ইন্দ্রাণী তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে।

ভাবছিলাম কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে কিনা। দেখি, কৃষ্ণা ঘরে এসে দাঁড়াল। তারপর অন্য কোন দিকে না চেয়ে ইন্দ্রাণীকে বলল, আয় তো ইন্দ্রাণী, ওঘর থেকে খাবারটা নিয়ে আসি। তোমরা এখানে বসেই খেয়ে নাও অরূপদা। এত রাত্রে আর ছুটোছুটি করে কাজ নেই।

* * * *

খেতে খেতে উদয় হঠাৎ হেসে ফেলল, কৃষ্ণাকে বলল,

ছবি দেখে নিশ্চয়ই খুশী হয়েছেন? আমার দামটা দিয়ে দিন তবে?

কৃষ্ণার মুখ লাল হয়ে উঠল। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। মুহূর্ত্তকয়েক পরেই নিজেকে সহজ করে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, ছবি আপনার ভাল হয় নি। দাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

আমি আর ইন্দ্রাণী হাসি মুখে চুপ করে রইলাম।

উদয় বলল, বেশ! খারাপ ছবি আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনাকে কিছুই দিতে হবে না।

—বাঃ! তা কেন? ওতো আমার ছবি! কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

কিন্তু এই ত বললেন, ছবি আপনার পছন্দ হয়নি? চাপা হাসির বেগে উদয়ের চোখের দৃষ্টি কাঁপছে।

—তাতে প্রমাণ হয় না ও ছবি আমার নয়।

—তা হয় না বটে, তবে একথা অনায়াসে প্রমাণ হয় যে কূটতর্কে আপনার রীতিমত দখল আছে। হঠাৎ একেবারে উচ্চশব্দে হেসে উঠল উদয়। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, দেখুন, টাকা আমার সত্যিই বড় দরকার। তা বলে আপনার ছবিরও দাম নিতে পারব না। তার চেয়ে এক কাজ করুন না? আজই দুপুর বেলায় মানুষের প্রয়োজনে যথাসর্ব্বস্ব বিলিয়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত দিচ্ছিলেন।

আমি বলি, আপনার ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বস্ব যথাস্থানেই থাক্; শুধু আপনি নেমে আসুন আমার কাজে। ভয় কি? জোর করে আপনাকে ধরে রাখব না। ভালো না লাগলে আবার ফিরে আসবেন! পথ আপনার খোলাই রইল।

ঠিক বোঝা গেল না এ রহস্য কিম্বা আর কিছু। কৃষ্ণা চুপ করে রইল। ইন্দ্রাণী কিন্তু কথা না বলে পারল না; বলল, তোমার মনের কথা তুমিই জান দাদা। কিন্তু কৃষ্ণাদি যে তোমার কাজে নেমে আসতে পারে, আর কেউ না করলেও আমি একথা বিশ্বাস করি। কৃষ্ণাকে বলল, পার না কৃষ্ণাদি?

কৃষ্ণা কিন্তু এবারেও জবাব দিল না। নিঃশব্দে এটা ওটা পরিবেশন করে চলল।

উদয় বলল, বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয় ইন্দ্রাণী। তবে সব কাজ যে সকলের নয়, তুই না জানলেও কৃষ্ণা একথা নিশ্চয়ই জানেন।

—জানি বৈ কি! কৃষ্ণার বলার ভঙ্গী কঠিন; কিন্তু মুখের মৃদু হাসি তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হল না।

হঠাৎ আলোচনার মোড় ঘুরে গেল গজাননের আবির্ভাবে। এক টুকরো কাগজ আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, একজন সাহেব এসেছে, ছোটবাবু।

সাহেব! বিস্মিত হয়ে তাড়াতাড়ি কাগজ টুকুর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দেখি শুধু একটা নাম স্বাক্ষর করা রয়েছে

……শ্রীবাস্তব রাও। নিঃশব্দে উদয়ের হাতে কাগজখানি দিয়ে উৎসুক হয়ে চেয়ে রইলাম।

নাম দেখে উদয় চমকে উঠল। ভ্রূ-কুঞ্চিত করে ক্ষণকাল কি চিন্তা করল তারপর ইন্দ্রাণীকে জিজ্ঞাসা করল, তোর মনে আছে ইন্দ্রাণী, ভরতপুর ষ্টেটের গোলযোগের পরেই একটি লোক ডান হাতে বুলেট্-উণ্ড্ নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ?

—এখন কি তবে ওখানেই,—

—তুই খেয়ে নে ত? আমরা ততক্ষণ নিচে যাচ্ছি।

হঠাৎ অসাবধান মুহূর্ত্তে প্রশ্ন করতে গিয়ে ইন্দ্রাণী নিজেই অপ্রস্তুত হয়েছিল। ধীরে ধীরে বলল, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি যাচ্ছি দাদা।

* * * *

নিচের ঘরে এসে শ্রীবাস্তবের সঙ্গে যে সব কথা হল তার একবর্ণও পরিষ্কার বোঝা গেল না। কিন্তু সব মিলিয়ে মোটামুটি ধারণা হল, ভয়ানক কিছু ঘটতে পারে এই আশঙ্কাতেই উদয়ের পরামর্শ নিতে তার ছুটে আসা। আমি সারাক্ষণ নিঃশব্দে বসেছিলাম। পরামর্শ শেষ হয়ে গেলে শ্রীবাস্তব উঠে দাঁড়াল, গুড্ নাইট্ স্যার!

—গুড্ নাইট্ রাও! উদয় সঙ্গে সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে গেল। তারপর ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বললে, প্যুশ্ হার্ড্! আই এ্যাম কামিং!

সামান্ত ক'টি কথা। তবু উদয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হল না। এমনি তার চোখের দৃষ্টি, তার সর্ব্বাঙ্গের কঠিন ভঙ্গী।

ইন্দ্রাণী ইতিমধ্যে এসে উপস্থিত হল ; বলল, চল দাদা।

—হ্যাঁ, চল্। আমাকে বলল, বিপিনের ওপর লক্ষ্য রেখো অরূপ। আবশ্যক হলেই আমাকে লিখবে। গিয়েই তোমাকে চিঠি দেবো।—উদয় চলতে সুরু করল।

ইন্দ্রাণীর দিকে চাইতেই সে নিঃশব্দে হেসে ফেলল। তারপর চলতে চলতে আমার অত্যন্ত কাছে এগিয়ে এসে খুব ছোট করে বলল, যাই, কেমন?

অনেক কথাই বলবার ছিল। অথচ কিছুই বলা হল না। উদগত দীর্ঘশ্বাস গোপন করে কোনমতে বললাম, এসো—

* * * *

উদয় ও ইন্দ্রাণী চলে যাবার পর প্রায় দশ বারো দিন অতিবাহিত হয়েছে। আজও উদয়ের চিঠি আসে নি।

তার চলার পথের সঙ্গে নিজে যে একেবারেই জড়িয়ে পড়িনি একথাও সত্য নয়। তবু সম্বন্ধ যতটুকু, দায়িত্ব তার তুলনায় অনেক বেশী। বিপিনের সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি,

তারাও আর বেশীদিন চুপ করে থাকতে রাজী নয়। কিন্তু উদয় যে কতোদূরে কোথায় আছে, কবে ফিরে আসবে কিছুই জানা নেই।

নানা চিন্তার মধ্যে এও এক দুর্ভাবনা। অথচ স্বয়ং স্বাধীন হয়ে এতবড় বোঝা বহন করব সে শক্তিও নেই।

এদিকে রাজেশ্বরের শেষ সংবাদ আমাকে যথেষ্ট বিচলিত করেছে। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কারা নাকি ষ্টোন্ ফিল্ড-য়ের ওপর অতর্কিতে দলবদ্ধ আক্রমণ চালিয়ে দু'জন সিপাইকে নিহত করেছে। অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। রাজেশ্বর লিখেছে, শত্রু ধরা পড়ে নি বটে ; কিন্তু কার তা অনুমান করা শক্ত নয়। আপনার আদেশের অপেক্ষায় রইলাম।

সংবাদ শুনে কৃষ্ণার উদ্বেগের আর অন্ত রইল না। কিন্তু আশ্চর্য্য! সংকল্প তার শিথিল হওয়া দূরে থাক, আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। আমাকে সাশ্রুনয়নে মিনতি করে বলেছে, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি অরূপদা, রাজেশ্বর তলাপাত্রকে তুমি বাধা দিয়ো না। এ প্রজা-বিদ্রোহের উপযুক্ত প্রতিকার না হলে বাবা আমাকে স্বর্গে বসেও ক্ষমা করবেন না।

রাজেশ্বরকে তাই লিখে দিয়েছি, সে তার সুবিধামত যে-কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। ফলাফলের দায়িত্ব আমার।

কৃষ্ণার সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। বললাম, মনে একটুও স্বস্তি পাচ্ছিনে বোন। রাজেশ্বর বড় একগুঁয়ে লোক।

—হোক্ না সে যা খুসী। তুমি তো তাকে কণ্ট্রাক্ট্ দিয়েছ, কৃষ্ণা সহজ কণ্ঠে বললে।

কথা শুনে হাসি পেল। বললাম, তা হলেও আমার দায়িত্ব তাতে এতটুকুও কম হবে না। কিন্তু সে যা'ই হোক্, আমি ভাবছি উদয়ের কথা।

—কেন? তাঁর সাথে এর তো কোনো সম্বন্ধ নেই?

হেসে বললাম, এখন নেই, কিন্তু থাকতে কতক্ষণ?

কৃষ্ণা ব্যাকুল কণ্ঠে বলল, শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখিয়ো না অরূপদা! এ কখনও হতে পারে না।

নিঃশ্বাস ছেড়ে বললাম, না হলেই ভালো। কিন্তু হলে যে কি হবে আমি কল্পনা করতেও পারছি না।

চেয়ে দেখলাম সত্যসত্যই ভয়ে কৃষ্ণার মুখ একেবারে সাদা হয়ে গেছে। ছ'জনেই চুপ করে বসে রইলাম। এ সম্বন্ধে ভাববার বা বলবার যেন আর কিছু নেই। কিছুক্ষণ এমনি কেটে গেল। হঠাৎ বেলার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়লাম। কলেজে অধ্যাপকদের মিটিং হবে। এ সপ্তাহে রবিবার নেই।

* * * *

মিটিং শেষ হল সন্ধ্যার অল্প কিছু আগে। গরমটা

এবারে বেশী পড়েছে। ট্রাম-বাসের অবস্থা দেখে মনটা রীতিমত দমে গেল।

এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঠিক যেন গ্রাম্য জমিদার-গৃহে দোল-দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বারোয়ারী যাত্রার আসর; কে আগে বসবে তারই জন্য মরণ-পণ করে ঠেলাঠেলি ভিড়!

স্থির করলাম হেঁটেই বাড়ী যাব। আর কিছু না হোক্ খোলা হাওয়ায় খানিকটা বেড়ান হবে।

সোজা সঙ্কীর্ণ পথে না গিয়ে ইচ্ছে করেই বড় রাস্তা বেছে নিলাম। দীর্ঘ রাজপথে লোক-সমাগমের অন্ত নেই। তাদের দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিনের কত কথা মনে পড়ছে।

সবচেয়ে বেশী করে মনে হচ্ছে ইন্দ্রাণীর কথা,...... যাবার বেলায় তার ক্ষণিকের ব্যথিত হাসি, সেই কুণ্ঠিত বিদায় নেওয়া।

সহসা একখানা ঝক্‌ঝকে প্রকাণ্ড মটর কার আমার সম্মুখে এসে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল পরিচিত কণ্ঠের ডাক, মিষ্টার ব্যানার্জী!

চেয়ে দেখলাম ইঞ্জিনিয়ার অরুণ গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে আহ্বান করছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, অরুণ বাবু যে! তারপর? ও বাড়ীর খবর সব ভাল ত?

অরুণ কতকটা সংকোচের সংগে উত্তর করল, হ্যাঁ। মিষ্টার চাটার্জ্জি অনেকটা সেরে উঠেছেন। আর......,

বলেই সে সহসা থেমে গেল। তার কথার ধরণে বিস্মিত হয়ে বললাম, থেমে গেলেন যে ?

অরুণ আমার মুখের দিকে একমুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে ঈষৎ হেসে বলল, আপনি শোনেন নি কিছু ?

এবার কৌতূহল উদ্দাম হয়ে উঠল ; বললাম, না !

উত্তর শুনে অরুণ ক্ষণকাল চুপ করে রইল। পরে ধীরে ধীরে বলল, ইভা এমনভাবে আক্রমণ করলেন, যাতে বাধ্য হয়ে আমাকে রাজী হতে হল। নইলে বিয়ের ব্যাপারে দয়াদাক্ষিণ্যই বলুন, আর ব্যবসায়-বুদ্ধিই বলুন, এদের কোনটাকেই আমি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখিনে।

এতক্ষণে বিষয়টা পরিষ্কার হল। হেসে বললাম, বহুদিন পরে আজ একটা শুভসংবাদ পেলাম। সত্যিই আমি অত্যন্ত খুসী হয়েছি। আচ্ছা, আবার দেখা হবে। ধীরে ধীরে চলতে সুরু করলাম।

আসুন না, অরুণ পিছন থেকে বলল, আপনাকে পৌঁছে দিই ?

—ধন্যবাদ ! এটুকু হেঁটেই যাব।

* * * *

আধঘণ্টা পরে বাড়ী পৌঁছে দেখি নিচের ঘরে আলো জ্বলছে। বাইরের লোক যারা, বিশেষ করে তাদের জন্যই

এঘর ব্যবহার করা হয়। এমন সময় হঠাৎ কার আবির্ভাব হল দেখতে গিয়ে চমকে উঠলাম। রাজেশ্বর তলাপাত্র!

একেবারে তার সামনে গিয়ে প্রশ্ন করলাম, আপনি? রাজেশ্বর আমাকে দেখে যেন অকুলে কুল পেয়েছে। কোনমতে নমস্কারটা সেরে নিয়ে মুখ কালো করে যা বলল, তাতে আমিও অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলাম।

সিপাই তু'জন নিহত হওয়ার পরদিনই পুলিশের লোক প্রায় পঞ্চাশ জন বাছা বাছা জোয়ান সাঁওতাল ধরে নিয়ে যায়। ফলে তাদের সমস্ত সম্প্রদায় ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। যে কোন মুহূর্ত্তে তারা প্রতিশোধ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এদিকে সরকার পক্ষও ঘুমিয়ে নেই। প্রয়োজন হলে বিদ্রোহ দমন করতে তারা পাইকিরী হারে প্রাণ নিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

উৎকণ্ঠা যথাসম্ভব গোপন করে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর?

—তারপরে এখনো তেমন কিছু ঘটেনি। শুধু ঐ বিদ্রোহী সাঁওতালদের কোন এক পাণ্ডা আজ দিন তু'য়েক হল ধরা পড়েছে। লোকটা বাঙ্গালী। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বাবু! মানুষ যে অমন দৈত্যের মত হয়, এর আগে জানতাম না।

দৈত্যের মত! কথাটা কানে আসতেই আমার বুক কেঁপে উঠল।

বললাম, তাঁর নাম জানতে পেরেছেন ?

—আজ্ঞে না। জানা আর হল কৈ ? তাকে ধরবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল বিষম গোলমাল। আর তার ঠিক পরমুহূর্ত্তেই উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করল! তারপর কে যে কোথায় চক্ষের নিমিযে ছুট্ দিল, চেয়ে দেখি একেবারে নির্জ্জন মাঠ। জনমানবের চিহ্নও নাই। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে বাবু, ওরা নিঃশব্দে পিছু হটে যাবার লোক নয়। তাই, কি করা উচিত জানতে এলাম। কথা শেষ করে রাজেশ্বর আমার দিকে তাকিয়ে রইল।

সহসা কোনো উত্তর খুঁজে পেলাম না। কিছুকাল মৌন হয়ে থেকে বললাম, আচ্ছা, সেই যে দৈত্য না কি বললেন, তার চেহারাটা আপনার মনে আছে ?

—বাপ্! রাজেশ্বরের সর্ব্বশরীর যেন কেঁপে উঠল একবার। —তাকে ভোলা কি সহজ বাবু ? বলে সে একে একে যেভাবে তার চেহারার নিখুঁত বর্ণনা করল তাতে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ রইল না, এ আর কেউ নয়, স্বয়ং উদয়ভানু !

কি এক তীব্র আঘাতে আমার সমস্ত চেতনা এক নিমিষে অভিভূত হয়ে গেল। কেবল মাঝে মাঝে এই একটা কথাই মনে হতে লাগল, তার সঙ্গে সকল সম্বন্ধ এখানেই শেষ। এতদিনের এতকথা, এত বন্ধুত্ব কোনো কাজেই আসবে না।

আদর্শের বড় তার কাছে কিছু নেই। একথা কোনমতেই তাকে বিশ্বাস করান চলবে না যে, নিতান্ত অনিচ্ছায়ও আমাকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু আমার অবস্থা যা'ই হোক্, কৃষ্ণার কথা স্মরণ করে চোখে জল এসে পড়ল। হাতে তার নির্দ্দোষিতার নজীর নেই সত্য, কিন্তু আমার তো অজানা নেই মানুষের ওপর কতোখানি দরদ, কি অপরিসীম ভালবাসা তার ছোট কচি বুকটুকু ভরিয়ে রেখেছে! সেই আমারই চোখের সম্মুখে তিলে তিলে শুকিয়ে মরবে ঐ নিষ্পাপ অতটুকু মেয়ে? অথচ প্রতিকারের সামান্যতম সম্ভাবনাও কোথাও চোখে পড়ল না।

হঠাৎ ইন্দ্রাণীর কথা মনে হতেই রাজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, বলতে পারেন, লোকটার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা?

—আজ্ঞে না। সে একাই ছিল। তাছাড়া শুনেছি সে নাকি অনেকদূর থেকে এসেছিল গোলমাল মেটাতে, মাদ্রাজের কোন্ শহর থেকে।

—আপনি ঠিক জানেন সঙ্গে আর কেউ ছিল না?

রাজেশ্বর হেসে বলল, ঠিকই জানি বাবু। আমার ভুল হয়নি। কিন্তু আমাকে ত কৈ, কিছুই বললেন না?

বললাম, আজকের রাতটা যেতে দিন। কাল আপনাকে যা হয় জানিয়ে দেব। তবে একটা কাজ আজই করে ফেলুন। ওখানে আপনার ম্যানেজারকে 'তার' পাঠিয়ে দিন

যে, আপনার দ্বিতীয় নির্দ্দেশ না পাওয়া অবধি কাজ বন্ধ থাকবে।

রাজেশ্বর আর কোনো প্রশ্ন না করে ম্লান মুখে বিদায় গ্রহণ করল।

ধীরে ধীরে ওপরে এসে ডাকলাম, কৃষ্ণা! —

—যাচ্ছি অরূপদা, দূর থেকে কৃষ্ণার উত্তর কানে এলো। মিনিট খানেক পরে ও যখন আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন ওর মুখের দিকে চেয়েই চমকে উঠলাম। এই একটা বেলার মধ্যে মানুষ যে এমন করে বদলাতে পারে চোখে না দেখলে এ যেন ভাবাই যায় না। সমস্ত মুখখানা একেবারে সাদা হয়ে গেছে। চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল।

ব্যাপার কতকটা আন্দাজ করে নিলেও সে ভাব গোপন রেখে আদর করে জিজ্ঞাসা করলাম, একি! কি হয়েছে দিদি? কৃষ্ণা অত্যন্ত ম্লান হেসে বললে, কিছু হয়নি তো! তারপর অনতিদূরে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, রাজেশ্বর বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই?—

—হয়েছে। কিন্তু তুই কাছে আয়তো দেখি,—বলে নিজেই উঠে গিয়ে তার কপালে হাত দিয়ে বললাম, এইতো, দিব্যি গরম লাগছে গা।

কথাটা সত্য নয়; সুতরাং ওর দিক থেকে কোন প্রতিবাদ এলো না। শুধু ক্ষণকাল আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে থেকে বললে, কি বলবে, বল।

—রাজেশ্বর তোকে কিছু বলেছে নাকি ?—

—হ্যাঁ ; অনেক কথাই শুনলাম। কিন্তু·········হঠাৎ অশ্রু-বিকৃত হয়ে উঠল ওর কণ্ঠস্বর, একি হল অরূপদা ? এ যে স্বপ্নেরও অগোচর ! ইন্দ্রাণী যে এমন করে সব কথা গোপন করে গেছে এ আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।—

কৃষ্ণার অভিযোগের উত্তরে বলবার মত একটা কথাও খুঁজে পেলাম না সত্য, কিন্তু কেন জানি না মনে হল এ ব্যাপারে ইন্দ্রাণীর হয়ত কিছু অপরাধ নেই। হয়ত সে জানতেও পারেনি, তার দাদা এমন আকস্মিক ভাবে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কে জানে কোথায়, কেমন করে তার দিন কাটছে ! কিন্তু এ দিকের কথা যা'ই হোক উদয়ের ভাবনাই আমাকে অস্থির করে তুলল। সম্ভব, অসম্ভব কতো কথাই একে একে মনে এলো, কিন্তু শেষ অবধি তার মুক্তির কোনো উপায়ই দেখতে পেলাম না। অথচ কৃষ্ণার ষ্টোন্ ফিল্ডকে কেন্দ্র করে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তার জীবনের মূল্যবান মুহূর্ত্তগুলি ব্যর্থতায় বিবর্ণ হয়ে যাবে, এ আমার যদিও সয় কৃষ্ণা কিছুতেই সইতে পারবে না। কিন্তু একদিকে যেমন চিন্তার স্রোত এই খাতে বইছিল, অন্যদিকে তেমনি একথাও বারংবার মনে হতে লাগল, উদয় যদি জেনে শুনেই এ ব্যাপারে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, এমন লুকোচুরির তো কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিল না ! কে জানে, কোথায় এর দুর্জ্ঞেয় রহস্য আত্মগোপন করে আছে !

কৃষ্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে নিশ্চল হয়ে আছে। কখন যে তার দু'চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে সে জানতেও পারেনি। তার মাথায় হাত রেখে ধীরে ধীরে বললাম, ওঠ্। চোখ মুছে ফেল।

অদম্য কান্নার বেগে হঠাৎ ভেঙে পড়ল কৃষ্ণা। ওর অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন মর্ম্মান্ত বেদনার উত্তাল তরঙ্গ পার হয়ে আমার কানে ভেসে এল।

—ষ্টোন্ ফিল্ড্-য়ের সাথে আমাদের সম্পর্ক জেনেও যদি তিনি স্বেচ্ছায় এই গোপন পথ বেছে নিয়ে থাকেন ত তাঁর এতে অপরাধ হয়েছে কিনা তোমরাই বলতে পার ; কিন্তু এ কথা ত ভুলতে পারছি নে অরূপদা যে বিদ্রোহ-দমনের প্রথম দণ্ড তাঁকেই আঘাত করল। আর তুমি ত জান অত্যাচারী না হয়েও কেন আমাকে উৎপীড়কের নিষ্ঠুর ভূমিকায় নেমে আসতে হয়েছে! কিন্তু কেউ কি বিশ্বাস করবেন এ কথা ?

তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, তুই অমন একান্ত করে ভাবিস নে। আমি এর উপায় করব। কৃষ্ণা কথা বলল না, অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

* * * *

পরদিন কৃষ্ণার ডাকাডাকিতে যখন ঘুম ভাঙ্গল, বেলা তখন ন'টা। তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললাম, আরেকটু আগে জাগাতে পারলি নে ? দেখতো, কত দেরী হয়ে গেল!—

কিন্তু মুখের দিকে তাকাতেই মনে হল সারা রাত ও ঘুমোয় নি। বলল, আজ আর কলেজে যাওয়া হবে না। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে এস। অনেক কথা আছে।

মিনিট দশেক পরে চা খাওয়া শেষ হতেই কৃষ্ণা বলল ইন্দ্রাণীর চিঠি এসেছে; এই নাও,—বলেই ও ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

বললাম, যাচ্ছিস যে? ব'স না এখানে।

—তুমি পড়। আমি আসচি।

উৎকণ্ঠিত আগ্রহ নিয়ে চিঠি পড়তে শুরু করলাম। ইন্দ্রাণী লিখেছে ঃ—

কৃষ্ণাদি,

তোমাদের ওখান থেকে সোজা চলে আসি ভরতপুরে। এখানে আসব আগে থেকে জানা ছিল না। একমুহূর্ত্তের জন্যও স্বস্তি পাচ্ছি না। মানুষ যে এত দুঃখ সয়েও কোন্ আশায় বেঁচে থাকে, ভাবতে গিয়ে অবাক হতে হয়। তবু এদের মধ্যেই আমি থেকে গেলাম ষ্টক-য়ের চার্জ্জ নিয়ে। কারণ দাদার ইচ্ছাই এক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্দ্দেশ। হ্যাঁ, একটা কথা আগেই তোমাকে বলে রাখছি। আমাদের চলার পথের সবখানি এ্যাক্টিভিটি আমর জানা নেই, বোধহয় একা দাদা ছাড়া আর কেউই তা জানে না। কিন্তু থাক সে কথা। আমি যেটুকু জানি তাই বলি।

এ হল ফিল্ড্ সার্ভিস-য়ের একটা অংশ মাত্র,......ফ্রী মেডিক্যাল ইউনিট্। ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে আত্ম-বিস্মৃত সমাজ যাদের দিকে কোনদিন ফিরে চাইল না, তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আমাদের ইউনিটের কাজ। দাদার কথায়, এর মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্যের প্রশ্ন নেই; সারা পৃথিবীর অগণিত মানুষের চরম সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যই তাঁর যা কিছু পরিকল্পনা। আর্ত্তের নিঃস্বার্থ সেবার মধ্য দিয়েই সবার চেয়ে সহজ পথে আসবে মানুষের ওপরে মানুষের পরম বিশ্বাস; বহুধা-বিভক্ত মানব-গোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে এক দুশ্ছেদ্য ভালবাসার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়বে। তোমার রোগ-শয্যায় যেখানে প্রথম আমাকে দেখেছিলে সেখানেও এই সূত্রেই যাওয়া।

আজ দশ দিন হল আমাকে পৌঁছে দিয়ে পরঞ্জয়কে সঙ্গে নিয়ে দাদা কোথায় চলে গেছে। পরঞ্জয় সেন, ডাক্তার? সেই যে ছেলেটি তোমার অসুখের সময়ে চিকিৎসা করেছিল? তাকে নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? তারপর মাত্র দু'দিন আগে খবর পেলাম, তোমারই সেই জমিদারির এলাকায় কি একটা গোলমাল উপলক্ষ্য করে দাদা ধরা পড়েছে। খবর পেয়ে এখানে চলে এসেছি। পরঞ্জয়ের কাছে শুনতে পেলাম, দাদা এখানে রিলিফের কাজ দেখতে এসেছিল। জান বোধহয়, এখানে আট দশখানা গ্রামের মধ্যে একটিও ভাল ডাক্তার নেই? প্রতি বছর ঠিক এই সময়টাতে

এখানে অসুখের মরশুম পড়ে যায়। নইলে এখানকার সঙ্গে তার কোন পলিটিক্যাল্ রিলেশন্ নেই। তাই, যা'কিছু ঘটেছে, মনে হয় সে কেবল অদৃষ্টের দুর্ব্বিপাকে।

কাল দাদার সঙ্গে দেখা করেছি। তোমার পাথর-কাটা মজুর-প্রজাদের ইতিহাস সব না হলেও অনেকখানিই সে জানতে পেরেছে। শুনে দাদা অপলক চোখে চেয়েছিল।

পরঞ্জয় বেশী কথা বলে না ; তাই দাদার কাছেও তার কথার একটা বিশেষ দাম আছে। তবু কেন জানিনে, সে যখন তোমাদের কথা বলতে গেল তখন হাত দিয়ে দাদা সহসা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, থাক্ পরঞ্জয়! ওদের আমি চিনি। কি জানি, দাদার মনের কথা কি। আমি কিন্তু ভয়ে মরে যাচ্ছি কৃষ্ণাদি।

এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা সকলেই পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে দাদাকে তারা চেনে না, এইটুকুই যা ভরসা। এর পরের কথা আজ আর বলতে পারি নে। এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে ; কোথায় এখনো স্থির হয়নি।

পত্র শেষ হয়ে এসেছে। উদয়কে কেন্দ্র করে যে রহস্য ঘনায়িত হয়ে উঠেছিল, তার গাঢ় কৃষ্ণচ্ছায়া এতক্ষণে অপসারিত হল। কিন্তু কেমন করে জানি না মনে হল উদয়ের এ বিপদের দিনে অযাচিত হলেও তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সর্ব্বাধিক দায়িত্ব আমার। আর অল্প দু'চারটে

কথা। পড়ে যাচ্ছি······“একটা কথা আজ বড় বেশী করে মনে হয় কৃষ্ণাদি। ব’লব ? রাগ কর না কিন্তু। মনে হয়, ঘরছাড়া পরিজনহীন এই দু’টি ভাইবোন তোমাদের সত্যিকার আপন হয়ে উঠতে পারেনি কোনদিন। ঋণ তোমাদের শোধ করতে পারব না জানি। তাই তো ভাবি, তোমাদের ভালোবাসা পাই নি একথা আগে জানলে নিতান্ত করুণার দান সেই অসময়ে আশ্রয়টুকুও হাত পেতে গ্রহণ করতাম না। ছিঃ! ছিঃ! গায়ে পড়ে তোমাদের ওপর কী বিষম অত্যাচারই করেছি! পারতো ইন্দ্রাণীকে ভুলে যেয়ো; আর সে তোমাদের কাছে ফিরে যাবে না। আর ক্ষমা কর তার সংসার-জ্ঞানহীন দাদা উদয়ভানুকে। তোমাদের দু’জনকে সে বড় আপন করে ভালোবেসেছিল। তাই, দাবীই বল আর অত্যাচারই বল কোথাও তা তোমাদের কাছে এতটুকু সংকোচ অনুভব করেনি।

তোমাদের কাছে হয়ত এই আমার শেষ চিঠি। ঐশ্বর্য্য তোমার অক্ষয় হোক কৃষ্ণাদি, কিন্তু তোমার পাহাড়ী মজুরদের দাবী দাওয়ার পিছনে উদয়ভানুর ক্ষীণতম ইঙ্গিতও নেই, ইন্দ্রাণীর মুখের এই শেষ কথাটা তোমরা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস কর।”

—কি উপায় হবে অরূপদা ? মেয়ের অভিমান দেখেছ ? কৃষ্ণার কণ্ঠস্বরে আর্ত্তের ব্যাকুলতা শতধারে উপচে পড়ছে। ও কখন এসে নিঃশব্দে পাশে দাঁড়িয়েছে আমি দেখতে পাই নি।

বললাম, রাজেশ্বরকে কাজ বন্ধ করতে বলেছি। সে তার লোকজন নিয়ে চলে আসুক। আর উদয়কে রিলীজ করিয়ে আনতে হবে, তা সে যেমন করেই হোক্।

—কিন্তু তিনি হয়ত আমাদের সাহায্য নিতে রাজী হবেন না।

—সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি কৃষ্ণা। তাকে কিম্বা ইন্দ্রাণীকে আগে থেকে কোনো কথাই জানান হবে না। এমন কি সেখানে আমাদের উপস্থিতি পর্য্যন্ত নয়।

—সে কি সম্ভব অরূপদা ?

—যাতে সম্ভব হয় করতে হবে। কিন্তু আমার কোনো কথায় তুই বাধা দিবি নে বল ?

—কোনোদিন কি তোমার অবাধ্য হয়েছি যে আজ শপথ করিয়ে নিচ্ছ ?

—তবে চল্, আজই আমাদের রওনা হতে হবে। সব কথা পরে তোকে বুঝিয়ে বলব।

১৩

সাঁওতাল পরগণার সেই ছোট পাথুরে বাড়ী। বাইরের ঘরে বসে থানার ফার্স্ট অফিসারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তার মতে এ সব গোলযোগ নির্ব্বোধ সাঁওতালদের ইচ্ছাকৃত নয়! এর মূলে এমন এক বৈপ্লবিক শক্তি রয়েছে, যাকে কোন

গভর্ণমেণ্টই উপেক্ষা করতে পারে না। আইন ও শৃঙ্খলার বিশ্বস্ত প্রতিনিধি হিসাবে সে তার চরম শক্তি প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

হেসে বললাম, এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার মতের অমিল নেই। তবে কথা হল একের অপরাধের শাস্তি অপরকে পেতে না হয়, সে দিকে হুঁসিয়ার হতে হবে। কি বলেন ?—

—নিশ্চয়! কিন্তু এ কথা কেন বলুন তো ? অফিসার চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, সেই কথা বলব বলেই আপনাকে কষ্ট দিয়েছি। শুনতে পেলাম ষড়যন্ত্রের অপরাধে সন্দেহ করে একজন বাঙ্গালী যুবককে আপনি গ্রেপ্তার করেছেন ?—

—মিথ্যে শোনেন নি। দিন তিনেক আগে উদয়ভানু নামে এক বিদ্রোহী নেতা ধরা পড়েছে। তার কথাবার্ত্তা শুনে সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে সে রাজদ্রোহী। কিন্তু মুস্কিল হল তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

কিন্তু বিনা প্রমাণে,—

অফিসার আমাকে কথাটা শেষ করতে দিল না; বলল, সে আপনাকে ভাবতে হবে না স্যার। প্রমাণ না পাই, পলিটিক্যাল সাস্‌পেক্ট! ব্যাস্‌! এর ওপরে তো কথা নেই ?

একটু খোঁচা দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, না, তা নেই সত্য! শাসকের আইন এদিক থেকে যেমন নিরেট তেমনি উদার। আচ্ছা, হঠাৎ যদি কেউ ভুল করে বে-আইনী কিছু করে বসে, আইনের বিধান তার জন্য শিথিল হবে না নিশ্চয়?

অফিসার বোধকরি এমন অবান্তর প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না; শুধু তার ঈষৎ বিভক্ত ঠোঁটের ফাঁকে একটা নিঃশব্দ উচ্চাঙ্গের হাসি মুহূর্তের জন্য ফুটে উঠে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল।

বললাম, কিন্তু আইন যদি নির্ব্বিচারে নিরপরাধকে দণ্ড দিয়ে ভুল করে বসে, মানুষ নালিশ জানাবে কার কাছে বলতে পারেন?

এতক্ষণে অফিসারের চমক ভাঙ্গল; বলল, বড় কঠিন প্রশ্ন ক'রেছেন! কিন্তু কেন বলুনত? তেমন কিছু এক্ষেত্রে হয়েছে নাকি?

অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে উত্তর করলাম, এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, দেখুন তো, এই লোকটিকে চিনতে পারেন? উদয়ের একখানা ফটো বের করে তার হাতে দিলাম।

অফিসার চমকে উঠল, আশ্চর্য্য! এ ছবি আপনি কোথায় পেলেন? দিস্ নটোরিয়াস্ রেব্‌ল্? এর কথাই তো আপনাকে এইমাত্র বললাম!

আমি তার কথার উত্তরে এমন ভাবে হেসে উঠলাম যে ভদ্রলোক একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেল। চেয়ে দেখি ঠিক পাশের ঘরেই খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণা মৃদু মৃদু হাসছে। হাসি থামিয়ে বললাম, . আপনার ভুলটা এক্ষেত্রে বড় হাস্যকর হয়ে গেল স্যার্।—বলেই উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম কৃষ্ণা, কৃষ্ণা ?—

কৃষ্ণা ঘরে এসে দাঁড়াতেই বললাম, ইনি থানার ফার্ষ্ট অফিসার।

কৃষ্ণা নিঃশব্দে নমস্কার করল তাকে। অফিসারকে লক্ষ্য করে কৃষ্ণাকে দেখিয়ে বললাম, আমার বোন; এই জমিদারীর একমাত্র মালিক। আর যাকে আপনি এর গুপ্ত শত্রু বলে গ্রেপ্তার করেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এই এতবড় জমিদারীই শুধু নয় এর মালিকটি পর্য্যন্ত তার একচ্ছত্র প্রভুত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে। এবার আশাকরি বুঝতে পেরেছেন কোথায় আপনার ভুল ? কথাটা বলেই চকিতে কৃষ্ণার দিকে চেয়ে দেখলাম মুখখানা তার ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে। ওর আনত আর্ত্ত দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য চতুর্দ্দিকে আশ্রয় খুঁজে ভূতলে নিবদ্ধ হল। পরক্ষণেই ও যেন প্রাণপণ বলে নিজেকে সংবরণ করে কম্পিত মৃদু কণ্ঠে বললে, আমি যাই অরূপদা।

কৃষ্ণা চলে যেতেই পুলিশ মহাপ্রভু মুখ কালো করে বললে, আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। এ শুধু সেকেণ্ড

অফিসারের ভুলের জন্যই হয়েছে। এনি ওয়ে! আজই তিনি সসম্মানে মুক্তি পাবেন। তা ছাড়া আমি কথা দিচ্ছি, থানার প্রত্যেকটি লোকের কাছে আমি এর জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তলব করব! কথা শেষ করে অফিসার উঠে দাঁড়াল।

কয়েকখানা নোট্ তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললাম, কিছু মনে করবেন না। আপনার অনেকটা সময় নষ্ট হল।—

হঠাৎ যেন হাতের ওপর গোখ্‌রো সাপের ছোবল খেয়েছে এমনি প্রবল বেগে সে হাতটা টেনে নিল, সর্ব্বনাশ! এ আমি কিছুতেই পারব না স্যার্! আই কন্‌ডেম্ দিস্ ফাউল্ প্রাক্‌টীস্! টাকাশুদ্ধ হাতখানা সে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

হেসে বললাম, এতে আপনাব আপত্তি থাকা উচিত নয় ইন্‌স্পেক্টর। এ আপনার শ্রমের পুরস্কার। তথাপি সে পুনঃ পুনঃ প্রবল আপত্তি জানাল। শেষে যেন নিতান্ত দায়ে পড়েই বললে, আপনার অমর্য্যাদা হবে না জানলে এ আমি কিছুতেই গ্রহণ করতাম না। এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে, কাউকে বরং থানায় পাঠিয়ে দিন স্যার! অমনি উদয় বাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।

—চলুন, আমিই যাচ্ছি। ডেলিকেট্ রিলেশন্! বুঝতেই পারছেন?

সমঝদার অফিসার ঈষৎ হেসে বলল, না, না, সেত সত্যি কথা। বেশ, তাই চলুন।

থানায় উপস্থিত হতেই অফিসার আমাকে সসম্মানে বসিয়ে বললে, দশমিনিটের বেশী দেরী হবে না স্যার্। বলেই কক্ষান্তরে চলে গেল। সহকারীর দল সসম্ভ্রমে আমার দিকে তাকিয়ে পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করল।

চুপচাপ বসে আছি আর ভাবছি উদয়ের সঙ্গে ঠিক এখানে এ অবস্থায় দেখা করা সঙ্গত হবে কিনা। সময় যথেষ্ট নেই। হয়ত সে এখনি এসে পড়বে। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিতে চেষ্টা করলাম। দরিদ্র মজুর-প্রজাদের বিরুদ্ধে মালিকের এই কঠোর মনোভাবকে সে যে কোন্ দিক থেকে বিচার করবে জানি। আর এও জানি সে বিচার বড় নির্ম্মম। সেখানে বন্ধুত্ব বা ভালোবাসার স্থান নেই। স্থির করলাম আজ এখানে কিছুতেই দেখা করা চলবে না।

সহসা উদয়ের গম্ভীর গলা কানে আসতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

—হঠাৎ আপনাদের মত পরিবর্ত্তন হল যে ?

—এক্স্কিউজ্ মি স্যার্। না জেনে ওরা যা করে ফেলেছে আমি তার জন্য সত্যই অনুতপ্ত। তবে আপনি যদি আগে থেকে এর কিছুমাত্র আভাস দিতেন তো এ লজ্জাকর ব্যাপার ঘটত না, একথা

জোর করে বলতে পারি।—অফিসার এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

উদয় বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কথা যদিও ঠিক বুঝতে পারছি না, তবু আমি যে নির্দোষ,......

অফিসার তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এগজাক্টলি ছ্যাট্। তাছাড়া আপনার স্বার্থ যে এতে কতখানি তাও জানতে পেরেছি।

তার অর্থপূর্ণ হাসির শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। উত্তরে উদয় কি বললে বোঝা গেল না। কারণ ঠিক তখনই একদল লোক বিষম গোলমাল করতে করতে অফিস কামরায় এসে উপস্থিত হল। কোন এক জাঁদরেল ডাকাত ধরা পড়েছে, তারই আনন্দ। মিনিট খানেক পরেই অফিসার এসে বললে, আরেকটু অপেক্ষা করতে হবে স্যার্! ততক্ষণ আপনার আপত্তি না থাক্‌লে এককাপ চা—

—না, না, তার দরকার নেই। অমি বরং ঘুরে আসছি। বলেই তাকে আর কোন কথা বলবার অবসর না দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

এতক্ষণে মন অনেকখানি শান্ত হয়েছে। আর কিছু না হোক্ উদয় আইনের চক্ষে সন্দেহের বাইরে। আজ সে মুক্তি পাবে। এখানে এসে প্রথম দু'দিন ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছি; পাছে ইন্দ্রাণী জানতে পারে। দীর্ঘদিনের এত মেলামেশা, এত ভালবাসার মধ্য দিয়েও এই দু'টি ভাই বোন ঘুণাক্ষরেও

টের পায় নি, পাথরকাটা মজুরদের নিয়ে মাসের পর মাস কি অস্বস্তিকর অবস্থায় আমাদের প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্ত্ত কেটে গেছে।

উদয়ের কথা ভাবতে গিয়ে মনে হল, কর্ত্তব্যে কঠিন এই যুবকটির তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি কোথাও এতটুকু বাধা পায় না। তার সাথে আমার পরিচয়ের প্রথম সন্ধ্যার কাহিনী থেকে শুরু করে শ্যামসুন্দরের জুটমিল ধর্ম্মঘটের শেষ পরিণতি পর্য্যন্ত কথায় কিম্বা কাজে আমার দিক থেকে কোনদিন বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি ঘটে নি, এ ত আর মিথ্যে নয়? দুর্ভাবনার মাঝখানে এইটুকুই যা একমাত্র ভরসা!

কিন্তু ইন্দ্রাণী? সে হয়ত কত কথাই ভাবছে! ভালো-বাসার দাবীতে যে সবার আগে জানতে পারত আমার প্রতিদিনের সুখ দুঃখের কথা, যার আয়ত চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে অনুক্ষণ দেখেছি আমার চিন্তার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি, তার দুর্জ্জয়, মর্ম্মান্ত অভিমান ঠেকিয়ে রাখব কোন্ যুক্তিতে? কেমন করে তাকে বলব, তোমার কাছেও একথা বলতে সাহস হয়নি ইন্দ্রাণী?

মাথার ওপরে মধ্যাহ্ন সূর্য্য তরল অগ্নি-স্রোত ঢেলে দিচ্ছে। তপ্ত কঙ্করময় নির্জ্জন মাঠের মধ্যদিয়ে একাকী পথ চলছি; আর ভাবছি এমনি আর কত কথা! বড় ইচ্ছে হল একবার দেখে আসি পাহাড়ের গায়ে সেই ছোট বাড়িটা যেখানে থাকত পরঞ্জয়, থাকত ইন্দ্রাণী।

কিন্তু না, আজ কিছুতেই ইন্দ্রাণীর সম্মুখে যাওয়া চলবে না।

বাড়ী পৌঁছতে বড় বেশী বাকী নেই; আর পাঁচ মিনিটের পথ। গুণধরকে খবর পাঠিয়েছি সকালবেলা। সে হয়ত এতক্ষণ আমার অপেক্ষায় বসে আছে। দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম।

ঘরে এসে দেখি, যা ভেবেছি তাই। গুণধর ঠায় বসে আছে বেলা দশটা থেকে। আমাকে দেখেই সে শশব্যস্তে প্রণাম করে বললে, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন হুজুর?

—হ্যাঁ; অপরিসীম ক্লান্তিতে দেহের স্নায়ুগুলো ঝিমিয়ে আসছিল, চোখ বুজে সোফার ওপরে একমিনিট পড়ে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে বললাম, শোনো গুণধর। তোমরা শুধু মজুর নও, বংশানুক্রমে এখানে জমি যায়গা ভোগ দখল করে আসছ।

গুণধর জড়সড় হয়ে বলল, আজ্ঞে, হুজুর!······

—থাম। যা বলছি শোন। ছ'মাসত দেখলে? নিশ্চয়ই বুঝেছ, জোরজুলুম বা রক্তপাত করে শান্তিতে থাকা যায় না? তবে হ্যাঁ, তোমাদের অভাব অভিযোগ, সেও দেখতে হবে বৈ কি! আমি স্থির করেছি, তোমরা যা'তে সুখে থাকতে পার তেমন একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু তোমাদেরওত এগিয়ে আসা চাই? আর তোমরা যদি তা মেনে নিতে না চাও তা হলে······

—আমার কোন দোষ নেই! গুণধর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল, শুনলাম, হুজুর থানায় গিয়েছিলেন আমাকে ধরিয়ে দিতে! দোহাই হুজুর! আমি ও খুনোখুনির কিছুই জানিনে।—হঠাৎ গুণধর আমার পা জড়িয়ে ধরল। আমি তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে নিয়ে মনের ভাব গোপন করে বললাম, যাক্! তোমার সুমতি হয়েছে দেখে খুশী হলাম। তা শোন, তোমাদের দলের লোককে জানিয়ে দাও, যারা বরাবর কাজ করছিল তারাই কাজ করবে। আর তোমাদের যাতে অসুবিধে না হয় সে ভার আজ থেকে জমিদার স্বয়ং গ্রহণ করলেন।

গুণধর একহাতে চোখ মুছে আরেকবার আমাকে প্রণাম করে বলল, আর কিছু চাইনে হুজুর! আপনার মুখের কথাই সব। ধীরে ধীরে সে বেরিয়ে গেল।

যাক্! এতদিনে পাথরকাটা সমস্যার সমাধান হল. ভাবলাম আর একদিনও দেরী করা নয়, একেবারে কলকাতায় ফিরে গিয়ে উদয়ের সঙ্গে দেখা করব। সহসা কৃষ্ণার মৃদু কণ্ঠস্বর কানে এল, আর কত দেরী করবে অরূপদা?

বললাম, না, আর সময় নেই বোন, চল্। আজই আমাদের ফিরে যেতে হবে।

—আজই কেন? এখানকার কাজ শেষ হল তোমার?

—হ্যাঁ দিদি, একরকম শেষ করেই ফেললাম। গুণধরকে বলে দিয়েছি, ষ্টোন্ ফিল্ডের কাজ এবার

থেকে ওরাই করবে; ওদের সমস্ত সুখ-সুবিধার দায়িত্ব আমার।

কৃষ্ণা নিরুত্তরে স্থির হয়ে রইল। তার মুখের দিকে চেয়ে এতক্ষণে মনে হল এই একটা বেলার মধ্যে তার ওপর দিয়ে যেন এক প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এ ব্যবস্থায় তুই কি খুশী হ'স্‌নি কৃষ্ণা ?

এবারেও সে কোন জবাব দিল না। শুধু একবার শ্রান্ত চোখে আমার দিকে চেয়ে আবার দৃষ্টি আনত করল!

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললাম, কিন্তু এ ছাড়া অন্য কোন উপায় উপায় ছিল না। তুই ভাবিস নে। উদয় এতক্ষণে মুক্তি পেয়েছে; ফিরে গিয়ে তার কাছে বুঝিযে বললে সে কি আর বুঝতে পারবে না ?

যেন হৃদয়ের অন্তস্তল হতে এক অকরুণ নিস্ফল বেদনা উৎসারিত হয়ে তার ম্লান মুখে হাসি হয়ে ফুটে উঠল। বলল, ও আলোচনা থাক্ অরূপদা! নিজে তুমি কারও অপেক্ষা কম বোঝো না। তার চেয়ে চল, আমরা যাবার আয়োজন করি গে।

কৃষ্ণার এ অভিমানটুকু আমার লক্ষ্য এড়াল না, কিন্তু আগের মত করে তাকে সান্ত্বনা দেবার জোরও কোথাও খুঁজে পেলাম না। শুধু মুহূর্ত্ত কয়েক ওর মুখের দিকে নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থেকে বললাম, তাই চল্‌।

আজ উদয় সম্বন্ধে কৃষ্ণার বহুদিন পূর্ব্বের একটা কথা স্মরণ হল, মিথ্যে মায়া বাড়ান বৈত নয়! নইলে ওতে শুধু দুঃখই বাড়ে। স্মরণ হল কৃষ্ণাকে ইভার সেই বারবার সাবধান করে দেওয়া, ইভা আর যা'ই করুক মিথ্যে বলে না। অনেক চোখের জল তোমার সঞ্চিত হয়ে রইল।

মনে মনে বললাম, ভগবান, তোমার বিচারে ত ফাঁকী নেই; কৃষ্ণার এ নিষ্কলুষ অশ্রুজল বিনা দোষে তুমি যেন ব্যর্থ করে দিও না!

১৪

কলকাতার বাড়ীতে ফিরে আসবার পর আজ নিয়ে পূরো সাতদিন কেটে গেল উদয়ের খবর পাই নি। আশা ছিল বন্ধুত্বের আকর্ষণে না হোক, জুটমিলের ধর্ম্মঘটী মজুরদের স্বার্থের খাতিরেও সে একবার অন্ততঃ আমার সন্ধান করবে। কিন্তু দীর্ঘ দিনের এই নিরন্ধ্র মৌনতার চাপে সে আশাও ক্ষীণ হয়ে এসেছে।

মাঝে একদিন এসেছিল বিপিন; বলছিল ওই একশ' মজুরের কথা,······ওরা কাজ চায়। এমন করে কোন মতে দিন কাটান, এ আর কতদিন চলবে বাবু?

কথাটা সত্য। মানুষের কর্ম্ম-শক্তি নিশ্চিন্ত আরামে হলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে চায় না দীর্ঘ দিন। আর

এদের কথাত একেবারেই আলাদা। এদের না আছে শিক্ষা, না আছে আদর্শের জন্য প্রাণপণে লড়বার অমিত শক্তি। বিশেষ করে, মিল হস্তান্তরিত হয়েছে শুনতে পেলে এরা যে কি পরিমাণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে ভাবতে গিয়েও শঙ্কা লাগে। ওদের অবশ্য পরিপূর্ণ আশ্বাস দিয়েছি যে, আর এক মাসের মধ্যেই ওরা সসম্মানে মিলের কাজে যোগদান করতে পারবে। কিন্তু কেবল মাত্র আশ্বাস দিলেই ত সমস্যা মেটে না! তার জন্য চাই আরও অজস্র টাকা, আর তারই সঙ্গে গঠন-মূলক নূতনতর পরিকল্পনা। কলেজ থেকে ফিরে আসার পর থেকে নিজের ঘরে বসে বার বার এই কথাই ভাবছিলাম, দেখি কৃষ্ণা ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলাম, কিরে কৃষ্ণা?

কৃষ্ণা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, সারাদিন এমন চুপচাপ ঘরে বসে থাকা আমার ভাল লাগে না। আমাকে তুমি কলেজে ভর্ত্তি করে দাও।

হঠাৎ ওর কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার প্রস্তাবে খুশীই হলাম। ভাবলাম, পাঁচজনের সঙ্গে মেলা মেশার মধ্য দিয়ে তবু যদি ও মনে শান্তি পায়। বললাম, বেশ ত, তার ত এখনও দেরী আছে! ততদিন না হয় বাড়ীতেই পড়াশুনো আরম্ভ কর?

কৃষ্ণা মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর ধীরে ধীরে বলল, তুমি ওদের বাড়ী আর যাওনি অরূপদা? ইন্দ্রাণীদের বাড়ী?

—কেন বল্‌ত? আমি আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

—ইন্দ্রাণীর বইগুলো এখানেই রেখে গেছে কিনা! তাই, ওর হয়ত খুবই অসুবিধে হচ্ছে।—চেষ্টা করেও কৃষ্ণা নিঃসংকোচ হতে পারল না।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললে, বস অরূপদা, চা নিয়ে আসচি। মুহূর্ত্তমধ্যেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট খানেক চুপচাপ বসে কৃষ্ণার কথাগুলি ভাবছি। উদয়ের কথা যাই হোক আমার দিক থেকেও ত্রুটী কিছু হয়েছে বৈকি? আমিওতো এতদিনে একবারও তাদের সন্ধান নিই নি।

হঠাৎ ডাক শুনে একেবারে চমকে উঠলাম!

—অরূপ, আলোটা জ্বেলে দাও হে। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।—বলতে বলতে উদয় একেবারে ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

—উদয়! দাঁড়াও ভাই···· হাত বাড়িয়ে সুইচ্‌ টিপে দিয়ে তার একখানি হাত চেপে ধরে বললাম, বস। তারপর? তোমরা ভাল আছ ত? আর কোনো কথা আমার মনে এলো না।

একটি স্নিগ্ধ হাসির আলোয় তার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে,—নাঃ, ভাল আর তোমরা থাকতে দিচ্ছ কৈ—?

—কেন ? আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

এবার যেন সত্য সত্যই তাকে বিষণ্ণ মনে হল, বলল, ইন্দ্রাণীটাই সব গোলমাল করে দিয়েছে। ভাল করে কথা বলে না, ঠিকমত খাওয়া, শোওয়া, সে তো ভুলেই গেছে। অথচ এক মিনিট বিশ্রাম করবে না। আবার কদিন থেকে দেখছি এমনি ভয়ঙ্কর পড়াশুনো আরম্ভ করেছে যে, সংসারে তার অন্য কোনো কাজ আছে বলে মনেই হয় না।

বললাম, এতে আর তোমার অসুবিধে কি ? পড়াশুনো করছে, এ ত খুবই ভালো কথা।

—কিন্তু মুস্কিল হল, সাত আট দিন জ্বরে ভুগে এমন রোগা হয়ে গেছে যে এভাবে···। হঠাৎ উদয় থেমে গিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, দাঁড়াও, একটা কথাতো তোমাকে বলাই হয়নি। সে এক ভারি মজার ব্যাপার। বলেই সে এক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করেই হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠল।

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় তার এই আকস্মিক উচ্চ হাসির গম্ভীর শব্দ এমনই অদ্ভুত শোনাল যে, আমি বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকালাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ঠিক সমুখেই ঝন্ ঝন্ করে কাপ্-ডিস্ ভেঙে পড়ার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখি, কৃষ্ণা লজ্জিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ভাঙা কাপের অসংখ্য টুকরো আর খাবারগুলো সারা ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে পড়েছে। আমার দিকে চোখ পড়তেই বলল,

একশ'বার বললাম, বারান্দার আলোটা জ্বেলে দে: তা দেখলে ত ?

উদয় সমস্ত দেখেশুনে হেসে ফেলল, দোষটা ঝিয়ের নয়, অন্ধকারেরও নয় ; মিথ্যে ওদের ওপর রাগ করছেন।

কৃষ্ণা একথার উত্তর না দিয়ে উদয়কে নমস্কার করে বলল, ইন্দ্রাণী এলো না যে ? ভাল আছে ও ?—

—না, তার শরীরটা বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আর তা ছাড়া ও আজকাল কোথাও যেতে চায় না। কিন্তু আপনিও ত এ ক'দিনে খুব রোগা হয়ে গেছেন !

—কৈ ! আমিত ভালই আছি।—কৃষ্ণার মুখখানা ঈষৎ লাল হয়ে উঠল, তারপর গায়ের আঁচলটা অকারণেই আরেকটু আঁটসাট করে জড়িয়ে নিয়ে ক্ষণকাল স্থির হয়ে রইল। পরে ধীরে ধীরে বলল, যাই, আপনাদের চা নিয়ে আসি।

—তার চেয়ে বসুন, আপনাকে একটা মজার গল্প শোনাব।

কেন জানি না, কৃষ্ণা এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করে পরক্ষণেই সসংকোচে আমার পাশে উপবেশন করল।

উদয় বলল, মাসখানেক হল বোধহয় ; তাই না ? সেই যে আপনাদের বাড়ী থেকে চলে গেলাম ?—

—হ্যাঁ, প্রায় ঐ রকমই হবে, কৃষ্ণা ভয়ে ভয়ে বলল।

হ্যাঁ, চলে গেলাম এখান থেকে অনেক দূরে। তারপর ঘুরে ঘুরে শেষে এমন এক যায়গায় এসে পড়লাম, যেখানে

ঐ আমার প্রথম যাওয়া। কিন্তু মজা দেখুন, কিছু না জেনে শুনেও হঠাৎ একেবারে পাঁচ দিন হাজত বাস হয়ে গেল। একেই বলে পুরুষের ভাগ্য। কি বলেন ?

দুজনেই চুপ করে রইলাম। কিন্তু কৃষ্ণার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল।

উদয় বলে চলল, কিন্তু আমি অবাক্ হয়ে গেলাম, যখন বিনা কারণেই ঠিক তেমনি হঠাৎ আমাকে সসম্মানে ছেড়ে দিলে। তাছাড়া অত আদর, অমন মিষ্টি কথা বোধকরি শ্বশুর বাড়ীতেও মেলে না!—বলেই আবার সেই হা' হা করে হাসি।

ধীরে ধীরে বললাম, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল তুমি দোষী নও।

উদয় হাসি থামিয়ে বলল, হয়ত তাই। তবু সেও ত বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নয় ? কিন্তু···, কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে বলল বিস্ময় আমার সীমা ছাড়িয়ে গেল যখন জানতে পেলাম, ওটা আপনারই জমিদারী-সংক্রান্ত প্রজা-বিদ্রোহের ব্যাপার। আচ্ছা, বলুন ত, আমাকে সব কথা গোপন করেছিলেন কেন ? বোধহয় ভেবেছিলেন আমি বাধা দেব ?

কৃষ্ণা ম্লান হেসে বললে, কিন্তু ঐ কথা ভাবাই কি আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয় ? আপনিইত বলেছেন, আমাদের অহিনকুল সম্বন্ধ।

—সত্যিই তাই। আমি শুধু রহস্য করছিলাম ; নইলে আপনার স্বার্থ আর আমার স্বার্থ যে এক নয়, একথা ইন্দ্রাণী ভুললেও আমি কোনদিন ভুলে যাই নি। রহস্যের আভাস নেই উদয়ের কণ্ঠস্বরে।

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বললাম, উদয়, তুমি এমন অনেক কথাই জান না, যা' তোমার জানা দরকার।

উদয় ঈষৎ হেসে বললে, থাক্ অরূপ। ও না জানলেও আমার ক্ষতি নেই। বরং এ ভালই হল যে ওঁকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে জানবার সুযোগ পেলাম।

চেয়ে দেখি, কৃষ্ণার মুখখানা টক্‌টকে লাল হয়ে উঠেছে। বলতে যাচ্ছিলাম, আজ তুমি এ আলোচনা বন্ধ কর উদয়, কিন্তু বলা হল না। গজানন ভগ্নদূতের মত সম্মুখে এসে দাঁড়াল। তারপর মাথা চুলকিয়ে একবার একটু ইতস্ততঃ করে বলল, রাজেশ্বর তলাপাত্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন ছোটবাবু!

বললাম, বসতে বল। উদয়কে বললাম, তোমরা বস ভাই, আমি একবার দেখে আসি।

* * * *

মিনিট দশেক পরে রাজেশ্বরকে বিদায় দিয়ে যখন ওপরে উঠে আসছি তখন উদয়ের একটা কথা কানে যেতেই আমি ঘরের বাইরে থেমে গেলাম।

—অরূপ আর ইন্দ্রাণীর মুখে শুনে শুনে আপনার সম্বন্ধে আর একটু হলেই ভুল করে বসতাম, জানেন ?

দূর থেকে দেখলাম, উদয়ের মুখে এমন একপ্রকার হাসি যাকে উপমা দিয়ে বোঝাতে গেলে বলতে হয় স্যুগার্-কোটেড্ কুইনাইন্।

কৃষ্ণাও এবার কঠিন হয়ে উত্তর দিল, যাক্! ভগবান আপনাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমার সম্পর্কে এতদিনে নিশ্চিন্ত হলেন আপনি!

—আপনি ঠাট্টা করছেন হয়ত, আমি কিন্তু সত্য কথাই বলেছি। আপনি জমিদার। নিজের স্বার্থ দেখবেন বৈকি ? আর মূর্খ মজুর-প্রজা...ওদের নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে কেন ? ওরা ত মরবেই। মরেও আসছে চিরকাল। নইলে ঐশ্বর্য্যের এত বড় ইমারত তৈরী হল কাদের সমাধির ওপর ?—সহসা বিকট অট্টহাসির আবেগে ভেঙ্গে পড়ল উদয়। উঃ! কী ভয়ঙ্কর সে হাসি!

বিদ্যুদ্গতিতে উঠে দাঁড়াল কৃষ্ণা। সমস্ত মুখ তার এক নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল। বলল, শুধু আপনার নয়, ভুল হয়ত আরও অনেকের ভাঙল।—ওর সমস্ত শরীর এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় থর্ থর্ করে কাঁপছে। কথা ওর শেষ হয়নি তখনো ; কি এক প্রবল ঝোঁকে ও বলে চলল, কিসের জোরে আপনি মানুষকে নির্ব্বিচারে অবিশ্বাস করেন জানি নে ; কিন্তু একটা কথা বাধ্য হয়েই আপনাকে

মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে পৃথিবীর অসংখ্য দুঃখী মানুষের ভাল করবার দায়িত্ব কোন লোকের একলার নাও হ'তে পারে।

কৃষ্ণা এমন ভাবে কাঁপছিল যে মনে হল আর একটু হলেই ও পড়ে যাবে। আর উদয়? তার দুই চক্ষু দিয়ে বিস্ময় যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে—দেখুন, আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু সত্যি বলছি, আপনাকে উপলক্ষ্য করে হলেও কথাগুলো আমি সাধারণ ভাবেই বলেছি। আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে শ্রেণীগত স্বার্থের ঘাত প্রতিঘাতই হচ্ছে আসল সমস্যা। এ থেকেই সংসারে যত অশান্তি, যত রক্তপাত। নইলে ভেবে দেখুন না, আপনারই ষ্টোনফিল্ডে পাঁচ দিন হাজত বাস করার পরেও আপনার কাছে আসতে আমার বাধে নি? আপনাকে দিয়ে আমার অন্ততঃ কোনদিন ক্ষতি হবে না, এ আমি এখনও বিশ্বাস করি।—

—সেই বিশ্বাসের জোরেই বুঝি এমন করে আজ আমাকে অপমান করলেন?—

—আমাকে আপনি ভুল বুঝেছেন। নইলে একথা বোঝা আপনার পক্ষে কঠিন হত না যে, আপনি যা কিছুই করুন বংশের ট্র্যাডিশান্‌ ডিঙিয়ে দীন দরিদ্রের মুক্তিসংগ্রামে আপনি নেমে আসতে পারবেন না; আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই।

কৃষ্ণা উত্তেজিত হয়ে উঠল, বলতে আপনি অনেক কিছুই চাইতে পারেন। কিন্তু আপনার বলা কিম্বা বোঝার বাইরে হলেই যে সব কিছু মিথ্যে হয়ে যাবে, এমন কথাত কেউ কোথাও বলে নি? আর আপনার কথাই যদি সত্যি হয় তবু বলব, এ সত্য কথাটা ঘটা করে আমাকে শুনিয়ে না গেলেও দিন আপনার অচল হয়ে থাকত না।—উত্তেজনায় কৃষ্ণা হাঁপাতে লাগল।

উদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না। জবাব দিল অতি ধীরে ধীরে সহজ কণ্ঠে, আমি ছাড়া যে আর কেউ সত্য কথা বলতে পারে না এ কথা ত একবারও বলি নি? আর ঘটা করে শোনাবার কথা বললেন, সে ত আরও মিথ্যে। আপনি রেগে না গেলে সহজেই বুঝতেন, এছাড়া অন্যরকম কিছু করলেই আপনার ওপর চরম অবিচার করা হত।

শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে দিশেহারা হয়ে নিরীহ মানুষের তাজা রক্তে যারা ভোগের তৃষ্ণা মিটাতে চায়, তারা ডেস্‌পট্‌, তারা টাইর‍্যান্ট্‌। আগামী দিনের মানুষ তাদের ক্ষমা করবে না।

চেয়ে দেখলাম, কৃষ্ণা তেমনি একভাবে বসে আছে। শুধু চোখ দু'টো তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কিসের আবেগে।

উদয় বলে চলল, কাউকে নিরর্থক আঘাত করা আমার স্বভাব নয়; আপনাকেও আমি আঘাত করতে চাই নি।

আমি জানি, মানুষের জন্য আপনার মনে সহজ সহানুভূতি থাকলেও আজন্মপরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। আর, যা অসম্ভব তা নিয়ে অনর্থক চিন্তা করে নষ্ট করার মত সময় আমার হাতে নেই।

—তবু যে আপনার সময়ের অভাব হল না এইটেই আশ্চর্য্য ?

উত্তর দিতে গিয়ে উদয় হেসে ফেলল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, না, তা হল না সত্যি। কিন্তু কেন জানেন ? বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেও মনকে সব সময় আয়ত্তে রাখা যায় না। আমাদের চলার পথ পুষ্পাস্তীর্ণ নয় : তাতে বহু কাঁটা, বহু বাধা। সে দুর্গমতা কল্পনা করা আপনার পক্ষে সম্ভবও নয়, সে দাবীও করি নে।—সহসা উদয় উত্তেজিত হয়ে উঠল ; বলল, এক মুঠো অন্নের আশায় মা হয়ে নিজের হাতে সন্তানকে বিকিয়ে দিতে দেখেছেন কোনদিন ? দেখেছেন, কেমন করে মুমূর্ষু মায়ের বুক থেকে এক ফোঁটা কোলের শিশুর প্রচণ্ড ক্ষুধার টানে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে ? শুনেছেন কোনদিন, পেটের আগুন নিভাতে না পেরে দিগভ্রান্ত মানুষ নিজের হাতে নিজেরই সন্তানকে টুঁটি টিপে হত্যা করে ?······আমি দেখেছি। এমন দু'একজন নয়, শত সহস্র······অসংখ্য !···অগণিত !

চেয়ে দেখি কৃষ্ণা দু'হাতে মুখ ঢেকে আছে, আর থেকে থেকে সারা দেহ তার কেঁপে উঠছে। উদয়ের দিকে চেয়ে

মনে হল তার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে যেন সর্ব্বগ্রাসী প্রচণ্ড অগ্নিশিখা লেলিহান হয়ে উঠেছে।

যে সীমাহীন অত্যাচারকে কেন্দ্র করে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে, এতদিনে তার পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর রূপ চোখের সম্মুখে দেখতে পেলাম।

কথা তার তখনো শেষ হয় নি : কিন্তু আশ্চর্য্য! কণ্ঠস্বর তার এক মুহূর্ত্তেই যেন অপূর্ব্ব মমতায় কোমল হয়ে এল। শুনলাম, তাইত আমি আপনাদের পথে চলতে পারিনে; সুখী মানুষের চলার পথে চলতে গিয়ে দুঃসহ ব্যথার চাপে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। মনে হয় এতবড় কঠিন বুকখানাও বুঝি সেই বিষম চাপে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে! আমার পথ, সেতো মানুষের পথ নয়! কিন্তু সত্যি বলছি, আপনার ওপর আমার এতটুকু বিদ্বেষ নেই। ঐশ্বর্য্য আপনার অক্ষয় হয়ে থাক্।

সর্ব্বস্ব-বঞ্চিত নির্ব্বোধ মানুষ! ওদের রক্তে মুক্তিস্নান করেইত নূতন দিনের নূতন সূর্য্য দেখা দেবে। তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলবার জন্য রইল উদয়ভানু, রইল ইন্দ্রাণী·· আর রইল তাদেরই মত ঘরছাড়া সংসারজ্ঞানহীন মুষ্টিমেয় কয়েকটি মানুষ।

বাইরে থেকে সব কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম। ভয় হল, এর পরে কৃষ্ণা হয়ত এমন কোন কথা বলে ফেলবে, যা'তে পরস্পরকে আরো বেশী করে ভুল বুঝবারই সম্ভাবনা।

হঠাৎ কৃষ্ণার অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, আমি স্বীকার করছি, আমি অহঙ্কারী, আমি অত্যাচারী, আমি অমানুষ! আপনার দু'টি পায়ে পড়ি। আপনি যান! এখান থেকে চলে যান আপনি!—বলেই অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এক মুহূর্তের জন্য উদয়ের মুখখানা একেবারে কাল হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে স্থির হয়ে বসে রইল।

ওদের দু'জনকে একা থাকবার সুযোগ দিতে গিয়ে ফল যে এমন দাঁড়াবে একথা একবারও ভাবিনি। বিশেষ করে কৃষ্ণার কাছে এ ব্যবহার শুধু বিস্ময়কর নয়, আমার স্বপ্নেরও অগোচর।

মুহূর্তমধ্যেই আমি কর্তব্য স্থির করে উদয়ের কাছে এসে বললাম, কৃষ্ণাকে ভুল বুঝো না তুমি: ওর হয়ে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি ভাই।—

উদয় মুহূর্তকাল আমার দিকে চেয়ে থেকে অত্যন্ত ধীরে ধীরে বলল, ওকথা কেন অরূপ? ওঁর দোষ গুণের বিচার ত আমি করি নি। আমি ভাবছি তোমার কথা —

—কেন?

উদয় ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বলল, আমি জানি, তোমাকে বিশ্বাস করে আমাকে ঠকতে হবে না। কিন্তু দু'টো দিক ত রাখতে পারবে না ভাই?—

ইঙ্গিতটা এতই , স্পষ্ট যে বুঝে নিতে বেগ পেতে হল না। বললাম, উদয়, আজ তোমাকে সব কথাই খুলে বলব। শুধু মনে রেখ যার কাছ থেকে কথাগুলো তুমি শুনচো, সে কৃষ্ণার দাদা নয়, তোমার চলার পথের অভিযাত্রীও নয়, সে এক নিরপেক্ষ দর্শক।

বিস্ময় ফুটে ওঠল উদয়ের চোখে মুখে।

আমি সমস্ত বিষয়টা দ্রুত গতিতে একবার ভেবে নিয়ে পাথরকাটা মজুর প্রজাদের সবটুকু ইতিহাস ধীরে ধীরে বলে গেলাম। কোথাও আর কিছুমাত্র আড়াল রইল না। কেবল একটা কথা বলতে গিয়েও বলা হল না ; সে তার পুলিশের হাত থেকে আকস্মিক মুক্তির গোপন ইতিহাস।

সমস্ত কথা শুনে উদয় স্তব্ধ হয়ে রইল ক্ষণকাল। তার মনের ভাব বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না ? আমি কিন্তু একতিলও বাড়িয়ে বলি নি। একদিকে তুমি, আরেকদিকে কৃষ্ণার এই বিশাল সম্পদ রক্ষার কঠিন দায়িত্ব······আমি যেন দিশেহারা হয়ে গেলাম। কৃষ্ণা কিন্তু প্রথম থেকেই আমাকে এক কথা বলেছে, যদি অন্যায় বলেই বুঝে না থাক ওদের দাবী, ত শেষ পাই অবধি তা মিটিয়ে দিও। টাকার ওপর অন্ধ মমতা আমার নেই।

অথচ আমি এর কোন মীমাংসাই যখন খুঁজে পেলাম না, তখন কোথা থেকে এল রাজেশ্বর। ভাবলাম, দায়িত্বটা

উপস্থিত ক্ষেত্রে এই ভাবেই এড়িয়ে যাব। পরে ভেবে চিন্তে যা হোক একটা উপায় করা যাবে।

বহুক্ষণ পরে উদয় হেসে বলল, এ ভালই হল অরূপ যে, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে তোমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হল। কিন্তু তারপর?—

বললাম, তোমাকে ত বলেছি, তার পরের ভাবনা তোমাকেই ভাবতে হবে! অন্ততঃ কৃষ্ণার ইচ্ছা তাই।

উদয় অনেক্ষণ অবধি কথা বলল না; শুধু মাথা নিচু করে নিঃশব্দে বসে রইল। আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম, কৈ, কিছু বললে না?

উদয় মুখ তুলে তাকাল, তারপর ধীরে ধীরে বলল, সময় লাগবে অরূপ। ঠিক এই মুহূর্ত্তেই এর জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

—কেন বল ত? আমাদের তুমি বিশ্বাস কর না?

—এ শুধু বিশ্বাসের কথা ত নয়? তার কথাগুলো অত্যন্ত গম্ভীর শোনাল;—তুমি ত জান, আকস্মিক ভাবাবেগ আর স্থির কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, এ দু'টো বস্তু এতই আলাদা যে, শুধুমাত্র বাইরের মিল দেখে তাদের এক বলে ভুল করলে আর রক্ষা থাকে না। কিন্তু আমাকেও তোমরা ভুল বুঝো না। যদি সম্ভব হয়, আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করব। —তার কথায় বিন্দুমাত্র উত্তাপ নেই।

উত্তরে একটা কথাও আমার মনে এল না।

ক্ষণকাল মৌন হয়ে থেকে সে আবার সুরু করল, শোন অরূপ, আমার মতামত তোমার অজানা নয়। নিঃস্ব মানুষের একমাত্র সম্বল ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু নিষ্ঠুর উল্লাসে নিংড়ে নিয়ে যারা সেই প্রাণান্ত শ্রমের মূল্য দিতে চায় না, অপমানে উপেক্ষায় তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও সংকুচিত করে দেয় তাদের জবাবদিহির দিন সামনে এগিয়ে আসছে ভয়ঙ্কর বেগে। উদ্ধত স্বৈরাচার সেদিন কোথাও আশ্রয় পাবে না। আমরা সেই দিনটিকেই এগিয়ে আনতে চাই। তাই......যদি আমার ব্যবস্থাই মেনে নিতে হয়, শ্রমের দাবীকে সবার আগে মানতে হবে। ধন যারা উৎপাদন করে, ধনের মালিকত তারাও। যন্ত্র ত তাদের হাতেই প্রাণ পেয়েছে। নইলে লোহালক্কড়, গাছ-পাথর আর আকাশের বিদ্যুৎ, যে যার আপন যায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেইত বড় বড় ইমারৎ, বিশাল শিল্প-কারখানা গড়ে তুলতে পারত। অরূপ, সকলের শ্রমে, সকলের সহযোগিতায় যে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে শুধুমাত্র টাকার জোরে মানুষ সেখানে সার্ব্বভৌম অধিকার পাবে না কোনদিন।

এতক্ষণ আমি উদয়ের কথাই শুনে যাচ্ছিলাম। সহসা মনে পড়ল বিপিনের কথা, বললাম, শ্যামসুন্দর বাবুর জুট্‌মিলের শ্রমিকদের আর ত ঠেকিয়ে রাখা যাবে না উদয়!

—আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম। বিপিন তোমাকে যা বলে গেছে তা তার নিজের কথাই নয়। শ্রমিকরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে, এ আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ক্ষণকাল মৌন হয়ে রইল উদয়। চোখের দৃষ্টিতে তার উদ্বেগ ঘনিয়ে এল। কিন্তু কেন? কিসের এই দ্বিধা? সে ত অনায়াসেই এ সমস্যার সমাধান পেতে পারে। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি, দাম পেলে মিল তারা এই মুহূর্ত্তেই ছেড়ে দিতে চায়। আর কৃষ্ণা? ভোগ বিলাসে নিরাসক্ত, অগ্নিগর্ভ এই পুরুষটিকে সংসারে তার যে কিছুই অদেয় নেই, আর কেউ না জানলেও আমার কাছে ত একথা গোপন নেই? আর শুধু কি তাই? যে অপরিমেয় ঐশ্বর্য্য কল্পনাকেও বহুগুণে অতিক্রম করে যায়, কর্ত্তব্যে নিষ্ঠুর এই পরম খেয়ালী মানুষটিকে বাদ দিয়ে তার কণামাত্রও যে সে স্পর্শ করবে না, একথাও ত আমার অপেক্ষা বেশী করে আর কেউ জানে না।

নিষ্ফল ভালবাসার আগুনে সারা বুকখানা হয়ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে, তবুও অভিমানিনী কৃষ্ণা মুখ ফুটে একটা কথাও বলবে না......কারও বিরুদ্ধে নালিশ জানাবে না একটিবার। অথচ অদৃষ্টের পরিহাসে তারই হাত দিয়ে জীবনে তার আঘাত এল, যে তার সমস্ত চিন্তা, সমস্ত ইচ্ছাকে নিবিড় সুখ-দুঃখে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধীরে ধীরে বললাম, উদয়, তোমার মত করে

ভাবতে পারে এমন লোক বড় বেশী নেই। তবু আজ তোমাকে একটা কথা বলতে চাই।

উদয় ঈষৎ চমকে উঠল, কি!...

পাছে সে আর কিছু মনে করে, তাই কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, মিলের সমস্যা মেটাতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন একথা ত তুমিই বলেছ? আমি বলি সে-অর্থ সংগ্রহ করবার দায়িত্ব তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। কোথা থেকে কেমন করে তা সম্ভব হবে সে ইতিহাস আজ তুমি জানতে চেয়ো না। না, না, হেসো না তুমি! তোমার হাসিকেই আমার সবচেয়ে বেশী ভয় হয়।

উদয় তখনও মৃদু মৃদু হাসছিল। কি জানি, যা গোপন করতে চেয়েছি তার কতটুকু তার কাছে গোপন রইল! কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, তার সমস্ত মুখের চেহারাই যেন চোখের নিমিষে বদলে গেল। মৃদু গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তোমার কথা আমি ভেবে দেখব অরূপ; কিন্তু ভয় হচ্ছে রামগড়ের সংবাদ পেয়ে। চলার পথ-য়ের এ্যাকটিভিটি ওখানে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। অথচ কালই খবর পেলাম ওখানে ব্যাপকভাবে ধরপাকড় শুরু হয়েছে! এমন কি, যে কথা আমি আর অন্য দু'টি লোক ছাড়া আর কারও জানবার কথা নয় পুলিশের দপ্তরে সে-কথাও পৌঁছে গেছে। আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি অরূপ!

—কিন্তু তুমি ত রাজদ্রোহী নও! আমার উৎকণ্ঠা গোপন রইল না।

উদয় হেসে ফেলল, এবার কিন্তু ছেলেমানুষের মত প্রশ্ন করলে ভাই।—তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বললে, না, তা নই সত্য ; কিন্তু দুর্ব্বল অসহায় যারা, যারা লোভী সমাজের ষড়যন্ত্রে সর্ব্বস্বান্ত, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে বাদশাহী মস্‌নদের ভিত্তিও নড়ে ওঠে বৈ কি! একে ইচ্ছে হয় বলতে পার রাজদ্রোহিতা, কিম্বা অন্য যা' খুশী! কিন্তু প্রজাঅন্তঃপ্রাণ শাসকের বিচারে অপরাধের গুরুত্ব তাতে কিছুমাত্র কম হবে না। কিন্তু আজ আর দেরী করব না ভাই। ইন্দ্রাণীটা এখনও সেরে উঠতে পারলে না ; ওকে নিয়ে এ আর এক দুর্ভাবনা হয়েছে। কথা বলতে বলতে উদয় নীচে নেমে এল।

বাড়ীর প্রাঙ্গণ পার হয়ে বড় রাস্তায় এসে উদয় বলল, দু'এক দিনের মধ্যে একবার এসো অরূপ। কথা আমার আরো কিছু বাকী রইল। —আর কোনদিকে না চেয়ে সে এগিয়ে চলল। সেই অতি পরিচিত দীর্ঘ পদক্ষেপ ......উন্নত ঋজুদেহের দ্রুতগতিতে অনমনীয় শক্তির অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

* * *

পরদিন। বেলা পড়ে এসেছে। নিজের ঘরে নিঃশব্দে বসে আছি। কাল রাত্রিতে উদয় চলে যাবার পর থেকে আজ এ

পর্য্যন্ত কৃষ্ণা ভাল করে কথা বলে নি। মন অস্বস্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। হাতে জরুরী কাজ না থাকায় অনেকদিন পরে বইগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম। এদের আমি অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি। আমার চিরদিনের সুখদুঃখের সাথী এরা। শত অনাদর, সহস্র উপেক্ষায়ও অভিমানে দূরে সরে দাঁড়ায় না; ধূলিমলিন দেহে আমারই স্পর্শের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। হঠাৎ এদেরই মধ্য থেকে ইন্দ্রাণীর লেখা শেষের পত্রখানা বেরিয়ে পড়ল। আরেকবার প্রথম থেকে শেষ অবধি পড়ে গেলাম। এত বড় চিঠি খানায় আমার সম্বন্ধে সে কিন্তু একটা কথাও লেখে নি। অথচ দুর্জয় অভিমান তার প্রতি কথায়, প্রতিটি শব্দের অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

কিন্তু থাক, ইন্দ্রাণীর ভাবনা আর নয়। যে গ্রন্থি নিজের প্রয়োজনে টিকে থাকতে পারল না, শুধু অকরুণ আঘাতের চিহ্নই পশ্চাতে রেখে গেল, তাকে নিয়ে মিথ্যে হা হুতাশ করতে আজ যেন সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয় অপরিসীম লজ্জায় সংকুচিত হয়ে এল। সহসা উদয়ের শেষ কথাটা মনে হল; তার সঙ্গে দেখা করা দরকার। এক মিনিটের মধ্যেই নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে নীচে চলে আসছিলাম, হঠাৎ কৃষ্ণা পিছন থেকে বলল, আসতে তোমার রাত হবে অরূপদা?—

ঘুরে দাঁড়ালাম। বললাম, কেন রে! কিছু বলবি? চেয়ে দেখলাম মুখখানা ওর এখনো বিবর্ণ হয়ে আছে।

কৃষ্ণা মৃদুস্বরে বলল, অনেক দিন ত যাই নি! চল না, আজ একবার দক্ষিণেশ্বর থেকে ঘুরে আসি।

—কিন্তু একটা যে বড় জরুরী কাজ রয়েছে বোন? আজ নয়, কাল তোকে বেড়িয়ে নিয়ে আসব। ধীরে ধীরে তার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, মিথ্যে মন খারাপ করিস্‌নে দিদি; ঘরে যা। বরং পড়াশুনো করগে; আমি ততক্ষণ ঘুরে আসি।

কৃষ্ণার চোখে জল এসে পড়ল; বলল, আমি ত কোন-দিন কারও মনে দুঃখ দিই নি! তবু বিনা দোষে আমার এ শাস্তি কেন অরূপদা?

এ প্রশ্নের উত্তর নেই। তথাপি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, দুঃখের আগুনে পুড়েই ত তারা খাঁটি হয়েছে কৃষ্ণা, যারা যুগে যুগে মানুষকে দিয়েছে ভালবাসা, দিয়েছে বিপুল শক্তির সন্ধান। ইতিহাসের দিকে চেয়ে দেখ, কখনও তারা পেয়েছে প্রতিবেশীর এতটুকু করুণা, কখনও বা তাও পায় নি। কিন্তু তাই বলে দুঃখটাই ত তাদের জীবনে বড় কথা নয়? আমরা সাধারণ মানুষ। দুঃখতো জীবনে আসবেই! শুধু তার পরের আশা নিয়েই না বেঁচে থাকা?

কৃষ্ণা নীরবে চোখ মুছে মৃদু কণ্ঠে বললে, ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তোমার দেখা হবে অরূপদা? হলে বল, আমাকে

তারা ভুল বুঝলেও তাদের ওপর আমার আর রাগ নেই ; বলেই চোখের পলকে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * *

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে শহরের সীমান্ত রেখার বাইরে বলে পথঘাট অত্যন্ত নির্জ্জন। আর বেশী নয় ; সম্মুখে ঐ মাঠের পরেই ছোট বড় অসংখ্য বৃক্ষের ঘনপত্রচ্ছায়ায় ঢাকা সেই কাঁচা মাটির ঘর। তাড়াতাড়ি মাঠ পার হয়ে ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম।

কোথাও জন-মানবের সাড়াশব্দ নেই। বোধ করি আমার পায়ের শব্দে বিরক্ত হয়ে কয়েকটা আধঘুমন্ত পাখী ডানা ঝাপটে শান্তিভঙ্গের প্রতিবাদ জানাল। ঘরের দাওয়ায় উঠে রুদ্ধ দ্বারে মৃদু আঘাত করে ডাকলাম, উদয়! কিন্তু ভিতর থেকে সাড়া এল না। আশ্চর্য্য! কেউ কি ঘরে নেই? অথচ এমন সময়ে ইন্দ্রাণীর অন্ততঃ বাইরে থাকবার কথা নয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করে উদয়ের নাম ধরে বার বার ডাকলাম। উত্তরে এবারেও শুধু পাখীর ডানা ঝাড়ার ঝটাপট্ শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না। আরও মিনিট দুয়েক নিঃশব্দে অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে গৃহ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণের মাঝখানে এসে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, ফিরেই যাব।

হঠাৎ কাছেই একটা মৃদুশব্দে সচকিত হয়ে চেয়ে দেখি, ঘরের দুয়ার খুলে গেছে। দ্রুতপদে খোলা দরজার একেবারে

কাছে এসে দাঁড়াতেই একটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক মাথার ওপরে আঁচল টেনে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। তারপর আড়চোখে আমাকে দেখে নিয়ে বলল, আপনার কি আসবার কথা ছিল ?—

বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু এঁরা কোথায় গেলেন ? তোমার বাবু, দিদিমণি ?—এতক্ষণে মনে পড়ল, এ সেই দীপুর মা, এ বাড়ীর পরিচারিকা।

দীপুর মা ধীরে ধীরে বললে, ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু বাবু বলে গেছেন, আপনি এলে যেন তাঁর জন্য অপেক্ষা করেন। বসুন বাবু। আমি চা এনে দিচ্ছি।

—না দীপুর মা, আমি এখনি খেয়ে এলাম। তুমি যাও। আমি বরং একটু বিশ্রাম করি।

আর কোন কথা না বলে সে চলে গেল। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, এ ঘরের কোথাও কিছু মাত্র বদলায় নি। তেমনি ঝক্‌ঝকে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ঘরের এক কোণে কাঁচের আধারে মোমের বাতি জ্বলছে ; অপর এক দিকে রাশীকৃত কাগজ আর বই। তারই মধ্য থেকে দু'একখানা টেনে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে পাতা উল্টিয়ে যাচ্ছিলাম, আর ভাবছিলাম নানা কথা। এলো মেলো ভাবনা।

আজ আর সকল কথা স্মরণ হয় না। তথাপি যতদূর মনে পড়ে, সেদিন সেই নিস্তব্ধ নির্জ্জন পুরীতে নিরালায় একা বসে অন্য সকল ভাবনাকে সবলে অতিক্রম করে যে

কথা বার বার আমার সমগ্র চেতনাকে নাড়া দিয়েছিল, সে আমারই ভাগ্য বিপর্যায়ের বিচিত্র ইতিহাস। সংশয় জেগেছিল সেদিন। বারংবার নিজেকেই প্রশ্ন করেছিলাম, সংসারের এই অতি দীর্ঘ সর্পিল চলার পথ, এর কি কোথাও সমাপ্তি নেই ?...কিন্তু থাক্। যা বলছিলাম সেই নির্জ্জন কক্ষে একলা বসে থাকা।

কতক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম জানি না : হঠাৎ ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম !....তুমি এরই মধ্যে ফিরে এলে দাদা ? উঃ ! কী যে ভয়ানক......আর বলা হল না। ঘরে ঢুকে আমাকে দেখতে পেয়েই চোখের নিমিষে ও যেন পাথরে পরিণত হয়ে গেল।

চুপ করে থাকলে এক্ষেত্রে যে লজ্জার অবধি থাকবে না একথা মনে হতেই সমস্ত দ্বিধা সরিয়ে দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেকে সহজ করে নিলাম। তারপর অত্যন্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে বললাম, উদয়ের সঙ্গে জরুরী কথা ছিল ; কিন্তু আজ আর দেখছি দেখা হল না।

চেয়ে দেখলাম ইন্দ্রাণীর সারা মুখখানা প্রথমে অত্যন্ত লাল হয়ে পরমুহূর্ত্তেই একেবারে ছাইয়ের মত শাদা হয়ে গেল। দাঁতে ঠোঁট চেপে মাথা নিচু করে সেই এক ভাবে ও দাঁড়িয়ে রইল।

সহসা মনে পড়ে গেল, কোন আকস্মিক ভাবাবেগ সংযত করতে হলে ইন্দ্রাণী ঠিক এমনি করেই স্থির হয়ে থাকে।

লক্ষ্য করে দেখলাম সত্যই বড় রোগা হয়ে গেছে ও। পরক্ষণেই কি এক নিবিড় বেদনার অনুভূতি আমার সারা বুক ছেয়ে ফেলল, বললাম, ভাল আছ ত ইন্দ্রাণী ?

ইন্দ্রাণী অতি অস্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, হ্যাঁ। আপনি কখন এলেন ?

—প্রায় ঘণ্টা খানেক। বলবার মত আর কোন কথা সহসা খুঁজে পেলাম না। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করলাম।

ইন্দ্রাণী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। আমিও চুপ করে রইলাম। বোধহয় এক মিনিট কি তার কিছু বেশী হবে, হঠাৎ মুখ ফিরাতেই দেখি ইন্দ্রাণী আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিয়ে বললাম, উদয় এলে তাকে আমার কথা বল, সম্ভব হলে তু'একদিন পরে আবার আসব। আচ্ছা,—কথা শেষ করেই আমি উঠে পড়লাম।

সহসা যেন সমস্ত শক্তি সংহত করে ইন্দ্রাণী বলে উঠল —বসুন ! এখন আপনার যাওয়া হবে না !—বলেই চোখের পলকে ও অন্য কক্ষে চলে গেল।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। ইন্দ্রাণী আজও আমাকে এমন অসংকোচে হুকুম করতে পারে একথা একমুহূর্ত্ত আগেও ভাবতে পারি নি। বিস্ময়ের সঙ্গে আরেকবার স্বীকার করতে হল, স্ত্রী চরিত্রে আমার কিছুমাত্র অধিকার নেই। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাববার অবসর পেলাম না।

ইন্দ্রাণী ফিরে এসে আমারই অনতিদূরে সসঙ্কোচে উপবেশন করে বলল, রাগ কমা দূরে থাক্, দেখছি আরো কিছু বেড়েছে !

হঠাৎ ওর কথার ধরণে বিস্মিত হলেও সে ভাব গোপন রেখে চুপ করে রইলাম।

ইন্দ্রাণী ক্ষণকাল আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করে বলল, যাক ! ও কথার উত্তর পাব না বুঝলাম। কিন্তু যেতে চেয়েছিলেন কেন ? কৃষ্ণাদিকে বলে আসেন নি ?

—না, তা নয় ; তবে উদয় ঠিক কখন আসবে না জানলে এখানে বসে থেকে লাভ ত কিছু নেই ? বরং……

—মোটামুটি লোকসানেরই সম্ভাবনা !—হাসির চিহ্নমাত্র নেই এমনি গম্ভীর মুখে ইন্দ্রাণী কথাটা বলল, কিন্তু তা হোক্ পরের জন্য অনেক কিছুই তো গেছে, না হয় একটা সন্ধ্যা নির্ব্বোধ ইন্দ্রাণীকেই দিলেন ! ইন্দ্রাণীর কণ্ঠস্বরে অস্পষ্টতা নেই ; কিন্তু তার আনত চক্ষুর দৃষ্টি অনুসরণ করা গেল না !

সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন এক মুহূর্ত্তে তীব্র তড়িতাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে গেল। কি এ ! পরিহাস ? যদি তাই হয় এ নিষ্ঠুর পরিহাসের কোথাও বুঝি আর সীমা নেই ! মনের ভাব গোপন করে ধীরে ধীরে বললাম, তোমার যা খুশী বল, আমি কিন্তু আর এক মিনিটও দেরী করব না।

ইন্দ্রাণীর মুখের চেহারা চোখের পলকে বদলে গেল। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে চাপা মৃদুকণ্ঠে

বলল, জানি। কিন্তু ভয় নেই, জোর করে আপনাকে ধরে রাখব না। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থেকে আমার দিকে একবার মাত্র চকিত দৃষ্টিপাত করে বললে, চলে যাবেন না যেন ; আমি এক্ষুনি আসছি।……

মিনিট পাঁচেক পর কয়েকটি সন্তর্পিত পদশব্দ কানে আসতেই চেয়ে দেখি, ইন্দ্রাণী একহাতে কিছু খাবার ও অন্য হাতে চায়ের বাটি নিয়ে আমার অতি কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মনের বর্ত্তমান অবস্থায় এই পরিচিত অভ্যর্থনা আমাকে রীতিমত বিপন্ন করে তুলল।

ইন্দ্রাণী আমার সম্মুখে বসে পড়ে আঁচল দিয়ে যায়গাটা মুছে নিয়ে বলল, হাত ধুয়ে ফেলুন।

আর চুপ করে থাকবার যো নেই : ধীরে ধীরে বললাম, দীপুর মাকে ত বলেছি এসবের দরকার নেই।—

—জানি, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে বলেন নি। নিন, অনর্থক সময় নষ্ট করবেন না।

অপ্রীতিকর হবে জেনেও এবার বাধ্য হয়ে বলতে হল, মিথ্যে অনুরোধ কর না ইন্দ্রাণী ; আজ আমি কিছুতেই খেতে পারব না।

—কেন শুনি ? ইন্দ্রাণীর চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

বললাম, কিছু মনে কর না : আমার একেবারেই ক্ষিধে নেই।

—এটুকু খেতে ক্ষিধের দরকার হয় না। অবশ্য এ রাজভোগ নয়। না হলেও বাজার থেকেও এসব আনানো হয় নি; খেলে অসুখ করবে না। অকস্মাৎ বিদ্রূপ শানিত হয়ে উঠল ওর কথার সুরে।

বললাম, তুমি কি ঠাট্টা করছ আমাকে?

ইন্দ্রাণীর কি হল সে-ই জানে। দুই আয়ত চক্ষুর গভীর নিষ্কম্প দৃষ্টি ক্ষণকাল আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ রেখে মৃদু কঠিন কণ্ঠে বললে, না; বরং আপনিই ঠাট্টা করছেন! পারেন আপনি না খেয়ে এখান থেকে চলে যেতে?

চমকে উঠলাম! একমুহূর্ত আগেই রাজ-ভোগের ইঙ্গিতে মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিলাম: কিন্তু এখন বিস্ময় একেবারে সীমা ছাড়িয়ে গেল। এ যেন সে ইন্দ্রাণী নয়; যেন নিজের জোরে পরিপূর্ণ অধিকারের দাবী প্রতিষ্টিত করতে এগিয়ে এসেছে শাশ্বত কালের দুর্জ্জয় অভিমানিনী পরম ইচ্ছাময়ী নারী, তার সকল বাধা, সমস্ত দ্বিধা প্রাণপণ বলে পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে। বললাম, বেশ! তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না: কিন্তু এ তোমার অন্যায় জেদ্ ইন্দ্রাণী!—বলেই খাবারের থালা কাছে টেনে নিলাম।

ইন্দ্রাণী আর চোখ তুলে চাইল না; সেই একভাবে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল।

খেতে খেতে বললাম, ইন্দ্রাণী, আজ তোমাকে দু'একটা কথা বলব। তুমি কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না। এ ঠিক

হাহুতাশ নয়। কারণ, আর কিছু না হোক্, এ-কথা আমি ভাল করেই জানি, সংসারে কারও ওপরেই রাগ বা অভিমান করবার অধিকার আমার নেই।

একটু আগেই তুমি বললে না, পরের জন্য আমার অনেক কিছুই ছাড়তে হয়েছে? পরিহাস হলেও কথাটায় কিছু সত্যের আভাস রয়েছে। তবে অনেক কিছু নয়; যা কোন দিনই ছিল না বা আজও নেই, পরের কল্যাণে তা হারাবার সৌভাগ্যও কোন দিন হয় নি। তবে হারিয়ে গেছে আমার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা! তাই ত ভাবি, আমার এ দুর্ভাগ্যের সবটুকু দায়িত্বই কি আমার? যে আশার অতীত সৌভাগ্য একদিন কামনার অপেক্ষা না রেখেই জীবনের রুদ্ধদ্বারে এসে কঠিন আঘাতে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল, কে বলবে, কোন্ ক্ষমাহীন দুষ্কৃতির অভিশাপে আমারই চোখের সম্মুখে তা ইন্দ্রজালের মত শূন্যে মিলিয়ে গেল। হয়ত এক দিন এর উত্তর খুঁজে পাব; কিন্তু সেদিন আমার জীবনে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। হয়ত থেকে যাবে কিছু স্মৃতি: নিঃসঙ্গ জীবনের নিরালা মুহূর্ত্তগুলি রাঙিয়ে দেবে তারা ক্ষণিকের ছোঁয়ায়! আকাশে সেদিনও উঠবে চাঁদ। তারায় তারায় ইঙ্গিতে জেগে উঠবে মহামিলনের মধুগীতিকা। স্বচ্ছ মেঘের অবগুণ্ঠন টেনে দিগ্‌বধূরাও এগিয়ে আসবে মহাশঙ্খনাদের মাঙ্গলিক নিয়ে। কেউ বা হয়ত দয়িতের গলায় পরিয়ে দেবে রজনীগন্ধার মালা! নিরালায় সেদিন

যদি অশ্রু ঝরে পড়ে, আমি নালিশ জানাব না। শুধু এই কথাই বলব, যা চেয়েছিলাম, যাকে পাইনি, আমার চিন্তায় তার স্মৃতির যেন অসম্মান না হয় কোনদিন। কে বলতে পারে, কেমনতর হবে সেদিনের রূপ! তবু আজ এইটুকু বিশ্বাস কর ইন্দ্রাণী, যতদূরে, যেখানেই থাকি, আমার নিঃস্বার্থ কল্যাণ কামনা তোমাকে অহর্নিশি ঘিরে থাকবে।

সহসা কি যে হল স্পষ্ট করে বুঝবার আগেই ইন্দ্রাণী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল আমার কোলের ওপর। উঃ! সে কান্না কী করুণ! কী মর্ম্মস্পর্শী! অমন করে যে কেউ কাঁদতে পারে, চোখে না দেখলে শুধুমাত্র কল্পনার জোরে তা বিশ্বাস করার উপায় নেই। এমন অবস্থায় কি করা উচিত, কেমন করেই বা তাকে সান্ত্বনা দেব কিছুই ভেবে পেলাম না। নিজের চোখ দু'টো তাড়াতাড়ি মুছে নিয়ে বললাম, চুপ কর, শান্ত হও ইন্দ্রাণী, উঠে বস।

ইন্দ্রাণী কিন্তু উঠে বসল না। আরও জোর করে মুখখানা আমার কোলের ওপরে চেপে রেখে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললে, আমাকে ক্ষমা করবে বল? আর কোনদিন তোমাকে দুঃখ দেব না।—বলেই আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

অল্প কটি কথা। কিন্তু মনে হল কী এক অত্যুগ্র বিদ্যুৎ প্রবাহ আমার প্রতি ধমনীতে, প্রতি শিরা উপশিরায় তীব্র বেগে ছড়িয়ে পড়েছে! আমার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র! পরক্ষণেই সমস্ত

শক্তি একত্র করে সংযত কণ্ঠে বললাম, ছিঃ! অমন করে কাঁদে না। ওঠ, আমার দিকে চাও!—

তখনও ওর সারা দেহ কান্নার আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আরও কিছুকাল চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী সহসা উঠে দাঁড়াল। তারপর অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি মুহূর্ত্তের জন্য পরম স্নেহে একান্ত নির্ভরে আমার মুখের পরে রেখে বললে, বস তুমি।—বলেই ক্ষিপ্র পদে ঘর থেকে চলে গেল।

কোথা দিয়ে কেমন করে যে মানুষের জীবনের গতি এমন একটি নিমেষে আমূল পরিবর্ত্তিত হতে পারে, আজ প্রথম তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলাম।

সম্মুখে উন্মুক্ত দ্বারপথে ঊর্দ্ধে চেয়ে দেখলাম, অনন্ত আকাশ জুড়ে কোটি কোটি নক্ষত্রের আলোক-সজ্জা। সমগ্র চরাচর অঘোরে ঘুমিয়ে আছে পরিপূর্ণ স্তব্ধতার পটভূমিতে। নিথর নিঝুম চারিদিক।

ইন্দ্রাণী ফিরে এল। মুখখানি ঈষৎ রক্তাভ, ক্ষণ-পূর্ব্বের অশ্রুর চিহ্ন চোখের কোণে এখনও শুকিয়ে আছে, অধরে স্নিগ্ধ হাসির ক্ষীণ আভাস; সবটুকু মিলে এক পরিপূর্ণ শান্তি তার সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে।

হেসে বললাম, এবারে একটা কথার উত্তর দাও ইন্দ্রাণী।—

—কি? হাসিমুখে সে অদূরে দাঁড়িয়ে রইল।

—অমন করে চিঠি লিখেছিলে কেন?

—না, সেকথা তুমি জিগ্যেস করতে পারবে না বলে দিচ্ছি। তারপর ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, দাদার কাছে কাল সব কথা শুনেছি। আচ্ছা সত্যি বলত, কৃষ্ণাদি আমার ওপর ভয়ানক রাগ করে রয়েছে, না?

হেসে বললাম, এর জবাব তোমার কৃষ্ণাদি ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না।

ইন্দ্রাণীও তৎক্ষণাৎ মৃদু হেসে বলল, আমার কাছে লুকোচ্ছ তুমি। ভাবছ, কাজ কি মিছে ইন্দ্রাণীকে কাঁদিয়ে। না হয় একটা মিথ্যেই বললাম।—

এবার আর মৃদু নয় একেবারে সশব্দে হেসে উঠলাম, তোমার ওপর কেউ রাগ করে থাকতে পারে?

—কি জানি, তুমিত পারলে। ক্ষণকাল মৌন হয়ে থেকে বললে, কৃষ্ণাদিকে বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

—বেশ ত, চল না!

—থাক্, তোমাকে আর ঠাট্টা করতে হবে না। কৃত্রিম ক্রুদ্ধকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বলল, ঐ চিঠির পরেও আমাকে তুমি যেতে বলছ?

একমুহূর্ত্ত নিঃশব্দে তার দিকে চেয়ে থেকে হেসে বললাম, কিন্তু একদিন যদি সত্যিই কেউ জোর করে নিয়ে যায়, তখন?—

—তখন আর কি করব, বল? গায়ের জোরে ত পারব না। যেতেই হবে। যেন কত শান্ত মেয়ে, এমনি নিরীহ কণ্ঠে ও কথাটা বলল।

বললাম, জোরে পারলে বোধহয় যেতে না ?

উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিল ইন্দ্রাণী। সহসা উৎকর্ণ হয়ে যেন কিছু শুনে নিয়ে বলল, দাদা এল বোধহয় !

—ভালোই হল। কিন্তু আমার কথার তো জবাব দিলে না ?

পায়ের শব্দ ততক্ষণে আরও এগিয়ে এসেছে। উদয় বোধকরি এসে পড়ল। ইন্দ্রাণী আমার দিকে একমুহূর্ত্ত হাসিমুখে চেয়ে রইল। ওর চোখ দুটো খুশীর আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ আমাকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ও একেবারে কাছে এগিয়ে এলো। তারপর ঈষৎ অবনত হয়ে কাণে কাণে বললে, জোর যদি সত্যিই কর, উত্তরও তখনই পাবে,—বলেই আর কোন দিকে না চেয়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম, তুই এখনও জেগে রয়েছিস ইন্দ্রাণী !

—কি করব বল ? তোমার বন্ধু বসে আছেন সেই সন্ধ্যা থেকে ; আমাকে ঘুমোতে দিলেন না।

চমকে উঠলাম ! একী দুরন্ত বন্যার জল ! ওর কি কোথাও কিছু আটকায় না ? কে জানে, আরও কি বলে বসবে !

—তুমি ? উদয় একেবারে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। দেখত, কত কষ্ট হল তোমার। দাঁড়াও, আগে এগুলো বদলে

আসি,— বলেই নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিয়ে পাশের কক্ষে চলে গেল।

ইন্দ্রাণী দাদার অনুসরণ করতে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আমার অত্যন্ত কাছে এসে ছোট করে বললে, সত্যি, কি যে কষ্ট দিলাম তোমাকে! —বলেই হঠাৎ হেসে ফেলে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওর চোখের তারায় ঝলকে ঝলকে বিদ্যুৎ উছলে পড়ছে। আমিও হেসে ফেললাম।

মিনিট দুই পরে উদয় ফিরে এসে বললে, এত রাত হবে আগে জানতাম না। হতভাগারা তাড়ি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে আছে! আর পাশেই মরে যাচ্ছে ওদের ছেলে-মেয়েরা। উঃ! দুর্দ্দশার এমন চেহারা আর কোথাও বুঝি নেই অরূপ!

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম, কারা? কাদের ছেলে মেয়ে?—

রেল লাইনের ওপারে, ঐ যে মজুরদের বস্তীগুলো! দেখলে তুমি ভয়ে শিউরে উঠবে!

—মরে যাচ্ছে কেন?—উৎকণ্ঠা আমার আরও বেড়ে গেল।

—মরবে না! ডাক্তারী শাস্ত্রে যতগুলো ভয়াবহ রোগের নাম দেখা যায় ওদের কুঁড়ে ঘরে তারা যে নিত্যকার অতিথি! ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, অথচ এদের বাদ দিলে সভ্য সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে এক মুহূর্ত্তে।

ওর চোখ যেন বহুদূরের কোন্ লক্ষ্য বস্তুকে বৃথাই খুঁজে মরছে। ইন্দ্রাণী কখন এসে একপাশে চুপ করে বসে

ছিল ; ধীরে ধীরে বলল, বিষ্টুর বউটা আজ বিকেল পাঁচটায় মারা গেল দাদা। শেষে তোমার কথামত ঐ ব্যবস্থাই করে এলাম।

—বাঁচা গেছে দিদি! কালই শুনতে পাবি ও আরেকটা বিয়ে করে ফেলেছে।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। রাত প্রায় বারোটা।

বললাম, আজ আর কিছু শোনা হল না ভাই! চেয়ে দেখ।— ঘাড়ির কাঁটার দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

—না! আজ আর দেরী নয়। চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিই।

ছোট মাঠখানি পার হয়ে এসে উদয় বললে, তোমার কথা ভুলিনি অরূপ। দু'এক দিনের মধ্যেই আমি মন স্থির করব; কেমন?—

—আচ্ছা। কিন্তু আর তোমাকে আসতে হবে না। তুমি ফিরে যাও। আমি দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম।

১৫

আজ সকাল থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি সুরু হয়েছে। অপরাহ্নের দিকে সারা আকাশ জুড়ে একখানা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ধীরে ধীরে জমাট বেঁধে উঠল। খোলা জানালায় বসে সেই দিকেই চেয়ে আছি।

অদূরে বসে আছে কৃষ্ণা, স্তব্ধ নত মুখে। ওর চোখে মুখেও যেন কিসের ভয়াল ইঙ্গিত। একমুহূর্ত্ত ওর দিকে চেয়ে থেকে বললাম, কৃষ্ণা, এদিকে আয়। দেখে যা।

কৃষ্ণা উঠে এল, কি!—

—দেখ্, কি ভয়ঙ্কর মেঘ! কৃষ্ণা বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল।

আগে হলে ওর এই আকস্মিক স্তব্ধতায় বিস্মিত হতাম, কিন্তু আজ ওর মৌনতা অকারণ বলে মনে হয় না। যে সংশয়ের আঘাতে মন ওর বেদনায় আর্ত্ত হয়ে উঠেছে তার প্রতীকার আমার হাতে নেই।

একে একে কত কথাই যে মনে পড়ল তার আর অবধি নেই। মাত্র গত কয়েক মাসের মধ্যে এতদিনের জীবন-দর্শন খানা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে নূতন করে গড়ে উঠেছে। কোথা থেকে এ কোথায় এসে পড়েছি ভাবতে গিয়ে বিস্ময় লাগল।

—অরূপদা, ইন্দ্রাণীকে বলেছিলে আমার কথা?

—হ্যাঁ, সব কথাই ও শুনেছে।

—কিন্তু ও ত এল না! ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, আমিই অন্যায় করেছি অরূপদা। ওর চিঠিটারও জবাব দিই নি। রাগ এতে হয় বৈ কি! আমি বড় বোন; বড়র মত ত চলি নি!

হেসে বললাম, ইন্দ্রাণী তোর ওপর রাগ করে নি। আসছে না শুধু লজ্জায়।

—লজ্জা কেন! খানিকটা বিস্ময় ওর কণ্ঠস্বরে।

—তোর কাছে অমন করে চিঠি লিখেছিল বলে।

—তুমি ওকে ঐ নিয়ে কিছু বলেছ নাকি? কৃষ্ণা শঙ্কিত হয়ে বলে উঠল।

বললাম, নাঃ, আমি আবার কি বলব? ও নিজেই বলছিল, কৃষ্ণাদির কাছে আর আমি যেতে পারব না।

কৃষ্ণা ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে, বুঝলে অরূপদা, এ ওর অভিমানের কথা। দাঁড়াও, আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসব ওকে। কাল আমাকে নিয়ে যেয়ো ত তুমি!

কৃষ্ণার কথার প্রতিবাদ না করে আমি নিঃশব্দে হেসে ফেললাল।

ইতিমধ্যে কখন যে সমস্ত আকাশের চেহারাটা বদলে গেছে লক্ষ্য করি নি। চেয়ে দেখি, ঘনকৃষ্ণ মেঘের দিগন্ত-প্রসারী আস্তরণখানি কিসের প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে চূরে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে একেবারে অসীম মহাশূন্যে তীর বেগে ছড়িয়ে পড়েছে!

সেই দিকে কৃষ্ণার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, দেখ্, চেয়ে দেখ্ কৃষ্ণা; আকাশটা কেমন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

কৃষ্ণা এগিয়ে এল জানলার ধারে। কিন্তু পরক্ষণেই কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, জলের ছাট আসছে অরূপদা। সরে এসো; জানালা বন্ধ করে দিই?

এতক্ষণে প্রবল বারিবর্ষণ শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে বজ্র পতনের কড় কড় শব্দে কেঁপে উঠছে বুক, আকাশ চিরে বক্র রেখায় ফুঠে উঠছে প্রদীপ্ত বিদ্যুৎশিখা। এই ভয়ঙ্কর অপরূপ সৌন্দর্য্যের কোথাও যেন তুলনা নেই।

আরও কিছুকাল সেইদিকে চেয়ে থেকে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম।

*　　*　　*

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম মনে নেই। সহসা কৃষ্ণার উদ্বিগ্ন কণ্ঠের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল,—অরূপদা, অরূপদা, শীগ্‌গির ওঠো! দেখ, বাইরে কে ডাকছে।

ব্যস্ত হয়ে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, কৈ, কে ডাকছে?—

—বাঃ! নিচে যাও! আমি কি করে বলব?······ ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি নিচে এসে দোর খুলে দিতেই যা চোখে পড়ল, তাতে নিজের চোখ দু'টোকে যেন বিশ্বাস হল না। দেখি উদয় একটা প্রকাণ্ড স্যুট্‌কেস্ হাতে নিচে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আছে: পিছনে ইন্দ্রাণী।

এতই বিস্মিত হলাম যে, কি করব, কি বলা উচিত কিছুই স্থির করতে না পেরে হাত বাড়িয়ে উদয়ের স্যুট্‌কেস্‌টা ধরে ফেলে বললাম,—ওটা আমার কাছে দাও।

উদয় হেসে ফেলল, পারবে না, পূরো দু’মণ! তার চেয়ে চল, ওপরে যাওয়া যাক্। ইন্দ্রাণীকে দেখিয়ে বললে, এ মেয়েটার আবার শরীর ভাল নেই। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাতে খানিকটা ভিজেও গেছে।—

ইন্দ্রাণীর দিকে চাইতেই ও হাসিমুখে চোখ নামিয়ে নিল। কিন্তু উদয়ের ঐ বহুবচন প্রয়োগটা আমার লক্ষ্য এড়ায় নি! চেয়ে দেখি, কৃষ্ণা কখন নেমে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছে। আমি মাঝখান থেকে সরে যেতেই সে উদয়কে সসংকোচে নমস্কার করল। তারপর ঈষৎ হাসি মুখে এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্রাণীর গায়ে হাত দিয়ে বলল,— ইস্! একেবারেই ভিজে গেছে। আয়, আমরা ওপরে যাই।—

গজাননের এতক্ষণে ঘুম ভাঙল। ব্যাপার দেখে সে প্রথমে কয়েক মূহূর্ত্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে, পরেই একেবারে বিষম ছুটোছুটি শুরু করে দিল।

হঠাৎ তার এই আকস্মিক ব্যস্ততায় মনে মনে অত্যন্ত হাসি পেলেও ইঙ্গিতে স্যুটকেস্, বেডিং প্রভৃতি দেখিয়ে দিয়ে মুখে গম্ভীর হয়ে বললাম, এগুলো দিদিমণির ঘরে নিয়ে যাও।

ওপরে আসতে আসতে উদয় বললে, চারিদিক থেকেই গোলযোগের সংবাদ আসছে। বিশেষ করে মধ্য এবং উত্তর ভারতে যাদের ওপর কাজের ভার ছিল,

তারা দুজনেই ধরা পড়েছে। অথচ বসুধা ছাড়া অন্য কেউ একথা জানত না। কিন্তু সব চেয়ে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে রামগড়।

ওপরে আমার শয়ন-কক্ষে এসে দুজনে মুখোমুখি বসে পড়লাম।

উদয় উঠে গিয়ে জানালাগুলো বন্ধ করে দিয়ে বলল শুনেছ, ইভা অরুণকে বিয়ে করে সোহাগপুরে চলে গেছে?

—না, তবে এমনি কিছু একটা আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু সোহাগপুরে কেন? প্রশ্ন করে তার দিকে চেয়ে দেখি, চোখে তার অন্যমনস্ক দৃষ্টি! বুঝলাম আমার কথা সে শুনতে পায় নি।

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে হেসে বললাম, মধুচন্দ্রিকা যাপন করবার জন্য কবির দল কিন্তু সোহাগপুর যেতে উপদেশ দেয় নি কোথাও।

এবার সে হেসে ফেলল, না, তা দেয় নি। তবে তুমিও কিন্তু ব্যাপারটা না জেনেই বিদ্রূপ করলে। কারণ, এটা ঠিক মধুচন্দ্রিকার ব্যাপার নয়। কিছুকাল নীরব থেকে বললে, তোমার মনে পড়ে, অনেকদিন আগে ইভা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল?

—পড়ে। আমি সে দিন তোমার কাছে গিয়েছিলাম।

—মধ্য ভারতের সমস্ত গোলমাল তারই এণ্টি-ক্যাম্পেইন! তুমি হয়ত ভাবছ ইভা কেমন করে এতসব গুপ্ত কথা জানতে

পারল। কিন্তু তারও জবাব আমার কাছে রয়েছে। উদয় পকেট থেকে একখানি বড় খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, দেখ, সব বুঝতে পারবে।

অত্যন্ত কৌতূহল হল। তাড়াতাড়ি খামের মধ্যে হাত পূরে দিয়ে যা টেনে আনলাম তা চিঠি নয়, একখানা গ্রুপ্ ছবি। ইভা, অরুণ কুমার ও আরেকটি যুবক ; আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ছবিটা দেখে নিলাম ; কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ছবির বাইরে আর কিছু চোখে পড়ল না।

উদয় বোধকরি এতক্ষণ আমার দিকেই চেয়েছিল। ছবি দেখা শেষ করে মুখ তুলতেই জিজ্ঞাসা করল, এখন বুঝতে পেরেছ ?

একটু বিব্রত কণ্ঠে বললাল, না ভাই ! ছবি ছাড়া এ থেকে আর কি বোঝা উচিত বুঝতে পারছি না।

—কেন, ঐ বসুধা রায় ? ছবিটা গোপনে তুলে নিয়েছে আমারই একটি বন্ধু যাতে আমার চিনতে ভুল না হয়, শত্রু কে।

সহসা একখানা কালো পর্দা চোখের ওপর থেকে অপসারিত হল। বললাম, বসুধাই তা হলে জিতে গেল ?

প্রশ্ন শুনে উদয়ের চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক কঠিন হয়ে উঠল। অতি গম্ভীর শোনালো তার কথা, এ কি প্রশ্ন অরূপ ! ইভা ও বসুধার এ যুদ্ধঘোষণা কার বিরুদ্ধে ?

চেয়ে দেখি কৃষ্ণা আর ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে এসে কিছু দূরে একটা সোফার ওপর বসল। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর।

উদয় তার কথার সূত্র ধরে বলল, যে আদর্শবাদ কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেয়, গায়ের জোরে তাকে টুঁটি টিপে হত্যা করা যায়, এ তুমি বিশ্বাস কর? আমি চুপ করে রইলাম।

উদয় অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। প্রবল ঝড়ের মাতন অনেকক্ষণ শান্ত হয়েছে; কিন্তু বৃষ্টির যেন বিরাম নেই। মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গুরু ডাক ও কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার দ্রুত ছুটে চলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

যন্ত্র-জগৎ এখনো ঘুমিয়ে পড়ে নি। আমাদেরই পাশের বাড়ীতে একটানা বেজে চলেছে বিজ্ঞানের আর এক বিস্ময়······বেতার যন্ত্র।

—শোনো অরূপ, উদয়ের কথাগুলো মৃদু অথচ গম্ভীর শোনাল, সেদিন যে ভার তুমি দিতে চাইলেও আমি নিতে পারি নি, আজ যাবার আগে তা গ্রহণ করলাম। ষ্টোন্ ফিল্ডের কাজ উপস্থিত ঐ ভাবেই চলুক; আর মিলের তুমি পজেশান্ নিয়ে নাও। ষ্টাফ তোমার হাতেই রয়েছে। দু'এক দিনের মধ্যে কাজ শুরু করে দাও, দেরী কর না।

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম, তুমি কি কোথাও চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, আজ রাত্রে। কণ্ঠস্বর মৃদু হলেও বলার ভঙ্গিতে আমি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম।

—কিন্তু আজ যে ভয়ানক দুর্য্যোগ! আমার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ গোপন রইল না। কিন্তু যার জন্য আমার এ ভয়, এ গভীর উৎকণ্ঠা, সে কেবল ঈষৎ হেসেই তার জবাব শেষ করল। তারপর তেমনি হাসিমুখেই কৃষ্ণাকে লক্ষ্য করে বলল, সে দিন আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাই আজ আপনাকে শাস্তি দিতে এলাম। আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত ইন্দ্রাণীর সমস্ত দায়িত্ব আপনার।

কৃষ্ণা চমকে উঠল, চকিতে চোখ তুলে চাইল তার মুখের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার দৃষ্টি আনত হয়ে এলো ব্যথার গুরুভারে। ওর সারা মুখ চোখের পলকে বিবর্ণ হয়ে গেল। তথাপি এই অসাধারণ সংযমী মেয়েটি মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ গলায় বলল, যে কথা আমি মুখে আনতেও পারিনে, আপনি যদি আমাকে সেই অপবাদ দিয়েই খুশী হন আমি প্রতিবাদ করব না। কিন্তু এতবড় দায়িত্ব আপনি এমন একজনকে দিয়ে গেলেন যাকে আপনি বিশ্বাস করেন না। শেষে আপনাকে অনুতাপ করতে না হয়।

কথা শুনে উদয় হেসে ফেলল, যদি তেমন কিছু ঘটে, আপনার শাস্তির মেয়াদ হয়ত আরো কিছু বেড়ে যাবে।

ইন্দ্রাণী কি বলতে যাচ্ছিল ; হঠাৎ উদয় তাকে থামিয়ে দিয়ে গভীর আগ্রহে কান পেতে বললে, ঐ শোন্!

সহসা শুনতে পেলাম, কোন্ অজ্ঞাত শিল্পীর গম্ভীর কণ্ঠ বেতার যন্ত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে :

চন্দনের সৌগন্ধ হারায়
উগ্রবীর্য্য নাগিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে ;
বেহেস্ত মিনতি করে ক্লান্ত আর্ত্তনাদে,
নন্দনের পারিজাত দানবেরা করিছে লুণ্ঠন।
চন্দ্রিকা কাঁদিয়া মরে ভগ্ন বাতায়নে
পশ্চাতে আসিছে রাহুগ্রাস :
শিথিল কবরীবন্ধে হাসনুহানার গন্ধ
ফেলে অশ্রু জল।

হঠাৎ সারা আকাশ কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর শব্দে বজ্রধ্বনি হল। স্বন্ স্বন্ করে ছুটে এল প্রচণ্ড দমকা বাতাস, কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেল বেতার যন্ত্র। কেমন বিশ্রী লাগল, কবিতার সবটুকু শোনা হল না।

কিন্তু বেশীক্ষণ এ অবস্থা স্থায়ী হল না বেতারে আবার ভেসে এল :

নিখিলের মর্ম্মস্থলে বিদ্ধ শক্তিশেল,
স্ফীতগর্ব্ব দশানন ব্রহ্মাস্ত্র হানিছে ;
মহাশক্তি আজিও ঘুমায় ?···

উদয়ের দিকে চেয়েছিলাম ; মনে হল তার চোখ দুটো ধীরে ধীরে জ্বলে উঠছে !

আবৃত্তি কিন্তু সমানে চলেছে। শিল্পীর কণ্ঠস্বর গম্ভীরতর শোনাল ; যেন এক অগ্নিগর্ভ পর্ব্বত আপন দুরন্ত আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠছে। কানে ভেসে এল সেই কম্পন-ধ্বনি ঃ

বজ্র হান হে বাসব,
অত্যাচার হোক্ খান্ খান্,
গর্জ্জমান বিদ্যুতের প্রদীপ্ত শিখায়
ব্যভিচার পুড়ে হোক্ ছাই !
নিভে যাক্ শ্মশানের ধূমায়িত শিখা,
মৌন হোক্ শৃগালের বীভৎস চীৎকার,
পাঞ্চজন্য রবে
মুহূর্ত্তে জাগ্রত হোক্ শত সব্যসাচী,
কুরুত্রাস পাণ্ডুর তনয় !
ব্যর্থ কর, স্তব্ধ কর, হে স্বয়ম্ভু,
হানিয়া স্তম্ভন,
বিশ্বত্রাস বাসুকীর উৎকণ্ঠ গরল !
শৃঙ্খলিতা ধরণীর সিক্ত আঁখিপাতে
নামুক শান্তির ঘুম ;
মানবতা শান্তিতে ঘুমাক।

শিল্পীর কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হল ; কিন্তু আশ্চর্য্য ! ধ্বনি যেন তার ভরিয়ে দিয়ে গেল ক্ষুদ্র কক্ষের প্রতিটি বায়ুকণা !

উদয় চেয়ে আছে অন্ধকার আকাশের পানে অপলক নেত্রে। দেখলাম, তার অতিদীর্ঘ উন্নত দেহের প্রতি অঙ্গে কঠোর সংগ্রামের অঙ্গীকার!

কারও মুখে কথা নেই। সম্পূর্ণ নিথর চারিদিক! শুধু থেকে থেকে ঝোড়ো হাওয়ার গোঙানি ভেসে আসছে। গভীর রহস্যময়ী রাত্রি।

উদয় আমাদের দিকে সহসা ফিরে চাইল। তারপর অতি অস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজের কাছেই বলল, তুমি যেই হও, যেখানেই থাক, উদয়ভানু তোমাকে প্রণাম জানাল। শত-কোটি আর্ত্ত মানবের সীমাহীন বেদনার আগুন তোমার বুকে দাবানলের মত জ্বলে উঠেছে। শৃঙ্খলিতা ধরিত্রীর উপেক্ষিত অশ্রুজল তোমার চক্ষুকেও অশ্রুসিক্ত করেছে। তোমারই কণ্ঠে উৎপীড়িতের সকল দুঃখ, সকল দৈন্য, প্রকাশের ভাষা পেল আজ! তুমি শুধু কবি নও, তুমি বিপ্লবের কবি! তোমার উদাত্ত আহ্বানে ঘুমন্ত মহাশক্তি সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়াক, আমি বুকের রক্ত দিয়ে তার পূজার অর্ঘ্য রচনা করব!

ক্ষণকাল চোখ বুজে থেকে অকস্মাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে চেয়ে অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলল; অরূপ, মানুষের জন্ম আর মৃত্যু দুটোইত আকস্মিক! তাই, একদিন হয়ত আমার কাজ অসম্পূর্ণ রেখেও আমি চলে যেতে পারি; সেদিন কিন্তু তোমাকেই—

—দাদা!—ইন্দ্রাণী আর্ত্তনাদ করে উঠল, অমন কথা আর কখনো তুমি মুখে এনো না দাদা! চোখে তার জল এসে পড়ল।

উদয় তৎক্ষণাৎ তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় বার বার হাত বুলিয়ে দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, ভয় কি দিদি? কিন্তু একথা আমি জোর করেই বলতে পারি অরূপ, শত সহস্র উদয়ভানু অত্যাচারের দুর্ব্বিসহ চাপে একদিন এগিয়ে আসবেই। পরিপূর্ণ বিপ্লবের সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাবে যুগযুগান্তের যত অবিচার, যত বিষাক্ত জঞ্জাল। লাঞ্ছিতা ধরিত্রীর প্রতি দীর্ঘশ্বাসে আমি তাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি! মেঘের গুরুগর্জ্জন যেন সহসা স্তব্ধ হয়ে গেল। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল আমার; কি এক বিষম ভারি বস্তু থেকে থেকে আমার বুকের ওপর চাপ দিচ্ছে যেন।

কৃষ্ণার দিকে চাইলাম। মনে হল সে এক প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা। বললাম, আজ তুমি যেয়ো না উদয়!

—অর্থাৎ কাল একেবারে সসম্মানে রাজদরবারে? না ভাই, হাতে আমার অনেক কাজ। শোন। শুধু মধ্যভারতের কর্ম্ম-কেন্দ্রকে আঘাত করেই ইভার ষড়যন্ত্র শেষ হয় নি; টাকার জোরে আইনের চোখে আমি শান্তি ও শৃঙ্খলার শত্রু। খবর পেলাম কাল ভোরেই কারা আমাকে অভিনন্দন জানাতে আসছে। হ্যাঁ, ভালো কথা;

আমার সেই আকস্মিক কারামুক্তির ইতিহাস আজই জানতে পেলাম। মুহূর্ত্তকাল চুপ করে থেকে হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বলল, তুমি যে এত ছেলেমানুষ আমি জানতাম না। আচ্ছা, চললাম। তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো ভাই। ইন্দ্রাণীর কাছে আমার ঠিকানা রইল। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদয় চলতে সুরু করল।

চেয়ে দেখি অপরিসীম লজ্জা গোপন করতে গিয়ে কৃষ্ণার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

ইন্দ্রাণী গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, একটু দাঁড়াও দাদা!—বলেই তার পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করল।

কৃষ্ণা কিন্তু একটা কথাও বলল না। নিঃশব্দে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে থেকে অস্বাভাবিক দ্রুত বেগে নিজের ঘরে চলে গেল।

* * * *

নিচে নেমে এসে দেখি সামনে বড় রাস্তার ওপর কিছু দূরে একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে, পাশেই এক যুবক।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই গাড়ীতেই যাচ্ছ?

—হ্যাঁ। উদয় এগিয়ে গেলো।

গাড়ীর একেবারে কাছে গিয়ে উদয় ডাকল, অরূপ! তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, সেদিন রাত্রে তুমি চলে আসার পর, ইন্দ্রাণী আমাকে দু'একটা কথা বলেছিল। শুনে আমি সত্যিই খুশী হয়েছি!

তোমাদের তুজনকে যদি এমন আপন করে আমারতু' পাশে পাই, সে যে আমার কত বড় সুখ শুধু আমি জানি। না, না, তুমি লজ্জা পেও না ভাই; আমি শুধু ওর দিক থেকেই কথাটা চিন্তা করেছি; তোমার কথা তো জানি নে? তুমিও ভেবে দেখো।

জীবনে আজই প্রথম আমি ভাষার দৈন্য অনুভব করলাম। ইন্দ্রাণী দাদার কাছে কি বলেছে, কতটুকু বলেছে জানা না থাকায় চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় আমার চোখে পড়ল না।

—চল পরঞ্জয়। উদয় গাড়ীতে উঠে বসল।

পরঞ্জয়! যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় আমার মনে নিবিড় হয়ে এল। বললাম, ভালো আছ পরঞ্জয়?

পরঞ্জয় হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বলল, হ্যাঁ। আপনারা সব ভালো? সঙ্গে সঙ্গেই তার গাড়ীর ইঞ্জিন্ গর্জ্জন করে উঠল। আমার জবাব বোধকরি সে শুনতে পেল না।

দীর্ঘ দিন পড়ে আজ পরঞ্জয়ের দিকে চেয়ে কতো কথাই যে মনে পড়ল তার আর অন্ত নেই। স্বপ্নের মত মনে হল সেই সব অতীত দিনের স্মৃতিগুলি।

জন-বিরল পাহাড় অঞ্চলে ক্ষুদ্র গৃহের সেই সঙ্কীর্ণ-পরিধি কক্ষ; স্নেহময়ী জননীর আশীর্ব্বাদের মত সেই অজানিতা তরুণীর আকস্মিক আবির্ভাব!……সেই তার মৃদুস্বরে বলা, আমি ইন্দ্রাণী।

তারপর কতোদিন, কতো অগণিত মুহূর্ত্ত বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে পশ্চাতে ফেলে এলাম। কল্পনায় এতটুকু অস্তিত্ব ছিল না যার, সে আজ নেমে এসেছে অন্তরলোকে সর্ব্বস্ব অধিকারের দাবী নিয়ে ; আমার সকল চিন্তায়, সকল কাজের মর্ম্ম-কেন্দ্রে বেঁধে দিয়েছে অচ্ছেদ্য গ্রন্থি!

কিন্তু ঐ যে অভ্যগ্র বিপদের নিবিড় কালো ছায়া নিষ্পেষিত মানবের মুক্তি-কামনায় সবলে তুচ্ছ করে সম্মুখে এগিয়ে গেল এক নিঃশঙ্ক পুরুষ ঘনতমসাচ্ছন্ন দুর্য্যোগের রাত্রিতে, কে বলবে, কবে, কতোদূরে তার এ নির্ভীক অভিযান সার্থকতার সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে!

যতদূর দৃষ্টি যায় দুই চোখ বিস্ফারিত করে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম।

* * * *

ফিরে এসে দেখি, ইন্দ্রাণী তখনও নিচে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বললে, দাদা তোমাকে কি ব'লে গেল ? বড় স্নেহের সুর।

বললাম, কি আর বলবে! বলল তোমারই গুণের কথা! তুমি বুঝি ওকে সব কথা বলেছ ?

—হ্যাঁ। সেই দিনই, তুমি চলে আসার পর।

—আশ্চর্য্য মেয়ে তুমি! একটু লজ্জা হল না ?

—বেশতো ! তোমাকে ভালোবেসে কি অপরাধ করেছি যে লজ্জা হবে ? শুধু শুধু ব'কোনো আমাকে ! বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই ওর কথায় ।

আমি চুপ করে রইলাম ।

ইন্দ্রাণী কয়েকমুহূর্ত্ত কথা বলল না । বোধ হয় মিনিট দু'য়েক কেটে গেল এমনি চুপ চাপ ; দু'জনেই চেয়ে আছি বাইরের দিকে ।

সহসা ইন্দ্রাণী জিজ্ঞাসা করল, দাদা কি বলল, বলবে না ?

বললাম, ভয়ানক রেগে গেছে দেখলাম ।

—ইস্ ! আমি বিশ্বাস করিনে । বলেই হঠাৎ একেবারে আমার পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করল ।

—এ কি ইন্দ্রাণী !

ইন্দ্রাণী ধীরে ধীরে উঠে আমার অত্যন্ত কাছে সরে এল ! তারপর আমার বুকের ওপর মুখ রেখে বলল, কি আবার ! একমুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে বলল, শোন !

—বল ।

একটা কথা বড় জান্‌তে ইচ্ছে করে । বলব ?—একান্ত নির্ভরতা ওর কণ্ঠস্বরে ।

বললাম, বল না !

ক্ষণকাল চুপ করে থেকে ইন্দ্রাণী মৃদুকণ্ঠে বললে, তুমি ত আমাকে আশীর্ব্বাদ করলে না ?

বাইরে তখনও ঝড়ে পড়ছে ঝির ঝিরে বৃষ্টি। হাওয়ায় উড়ে পড়ছে ওর সুবাসিত এলো চুলের দু'একটি গুচ্ছ ওরই চোখে মুখে : হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সরিয়ে দিয়ে মুখখানি তুলে ধরলাম। তারপর আপন ওষ্ঠাধরে ওর ললাট আর সীমন্ত রেখা পরম স্নেহে স্পর্শ করে বললাম, মুখে বললে আশীর্ব্বাদ মিথ্যে হয়ে যায়। শুনবে ?

ইন্দ্রাণী চোখ বুজে ছিল, বুঝি দুঃসহ আনন্দ সর্ব্ব অঙ্গে ফুলে ফুলে উঠছে এমনি শিউরে উঠল ওর তনুদেহখানি : উত্তর দিল অতি মৃদু কণ্ঠে, থাক, শুনতে চাইনে আমি ! পরক্ষণেই সচকিত হয়ে ও সোজা হয়ে দাঁড়াল, বলল, আমি কৃষ্ণাদির কাছে যাই। আমার একখানা হাত ওর হাতের মুঠোয় ছিল। একবার ঈষৎ চাপ দিয়ে বলল, আর দাঁড়িয়ে থেক না, এস। ধীরে ধীরে সে ওপরে গেল।

* * *

সেদিন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কে যে আমার সারা মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আজ সে কথা নিশ্চয় করে বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। তবু এ আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, ব্যক্তিগত পাওয়ার আনন্দকে অতিক্রম করে যে দু'টি মানুষের সুখ দুঃখ সেদিন বার বার আমার মনে নাড়া দিয়েছিল, সে ঐ কৃষ্ণা আর উদয়ভানু।

কৃষ্ণার কথা ভাবতে গিয়ে এই প্রশ্নই মনে জেগেছিল, সংসারে একাগ্র কামনা, একনিষ্ঠ ভালবাসার কি প্রতিদান নেই? পরম রহস্যময় এক পুরুষের সাধনার পথ সহজ করতে গিয়ে যে নারী নীরবে তার সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য, তার ইহ-কালের সমস্ত পাথেয় নির্ব্বিচারে বিলিয়ে দিতে পারে, তার চোখের জলে কি সেই পাষাণ বুক সিক্ত হবে না কোনদিন? শুধু প্রশ্নই জেগেছিল, জবাব পাই নি। কিন্তু সকল ছাড়িয়ে সবকিছু ডিঙিয়ে যারা বার বার আমার মনে ভিড় করে এসেছিল, তারা ঐ আগামী দিনের দরদী বিপ্লবীর দল! সে দিন কী ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে কান পেতে ছিলাম তাদেরই পদধ্বনির প্রতীক্ষায় যারা প্রচণ্ড আঘাত হেনে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে যা কিছু অন্যায়, যা কিছু উদ্ধত স্বৈরাচার। কল্পনায় দেখতে পেয়েছিলাম সেদিন নূতন পৃথিবীতে নবোদিত ভানুর অতি বিস্ময়কর মহাকল্যাণের রূপ!

সমাপ্ত